রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য

সাধনা পত্রিকা পর্ব : ১২৯৮-১৩০২

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৭

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : শ্রীনিশিকান্ত হাটই, তুষার প্রিণ্টিং
ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সরণি কলিকাতা ৭০০০০৬

রবীন্দ্রজীবনীকার

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়

পরম পূজনীয়েষু

লেখকের অন্যান্য বই

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১৩৭৩

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

১৩৭৮

অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

১৩৭৮

ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস চর্চা

১৩৭৯

বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাহিত্য-সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ

১৩৮১

রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাঠভেদ : প্রথম খণ্ড

১৩৮২

বঙ্কিমচন্দ্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (সম্পাদিত)

১৩৮৪

বঙ্কিমসাহিত্য

১৩৮৫

নানা রবীন্দ্রনাথ

১৩৮৭

প্র কা শি ত ব্য

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম

রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন

নিবেদন

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তে সুবিখ্যাত সাহিত্য-মাসিক সাধনা পত্রিকার এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও স্থান রয়েছে। সাধনার যুগে ববীন্দ্রনাথেব লেখনী যেমন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর মহান্ সৃষ্টি বৈভব ও বৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভার নিয়ে যেভাবে সেদিন বঙ্গের সাহিত্যসমাজে উপস্থিত হয়েছিল তা একাধারে অভূতপূর্ব এবং অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে তাঁব লেখনী আব কখনোই এতবেশি বেগবতী হয়ে ওঠে নি। চাব বৎসরের সাধনা (১২৯৮ অগ্রহায়ণ — ১৩০২ কার্তিক) রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যজীবনেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ। এই চার বৎসরেব সৃষ্টি পবে তাঁর কুড়িটিরও বেশি গ্রন্থে সংকলন করতে হয়েছিল। এর থেকেই অনুমান করা যাবে সাধনার যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিব বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের পবিমাণ কিরূপ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে অনেকগুলি পত্রপত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন। সেগুলি হল সাধনা ভারতী নবপর্যায়-বঙ্গদর্শন ভাণ্ডাব ও তত্ত্ববোধিনী। এ ছাড়াও কোনো কোনো পত্রিকায় নাম না থাকলেও সম্পাদন-কর্মে কবির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। সম্পাদকরূপে যে-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম নিজের নাম প্রকাশ করেন তাব নাম সাধনা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম চার বৎসর সম্পাদক হিসাবে নিজের নাম মুদ্রিত করেন, পরে কয়েক বৎসর উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকরূপে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হয়। যদিও একথা আমরা সকলেই জানি যে সঞ্জীবচন্দ্র সে-সময় নামে সম্পাদক হলেও, পত্রিকা সম্পাদনার সকল কাজ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কবতেন।

সাধনা পত্রিকার প্রথম তিন বৎসরে সম্পাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপা হয়েছে, চতুর্থ বৎসরের সাধনায় মুদ্রিত হয় 'সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি এবং অন্যান্য নানা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি — সাধনার প্রথম তিন বৎসরে সম্পাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের নাম ছাপা হলেও পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রথমাবধি সাধনা পত্রিকা সম্পাদনায় সুধীন্দ্রনাথের

বিশেষ কোনো ভূমিকাই ছিল না। প্রথম বৎসর থেকে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সাধনা পত্রিকার মুখ্য লেখক এবং মুখ্য সম্পাদক।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধনা পর্বে রবীন্দ্রজীবনের রেখাচিত্র অঙ্কনের এবং সাধনা সম্পাদনকর্মে কবির মানসিকতা কিরূপ ছিল উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। সাধনা পত্রিকা পর্বেব ছিন্নপত্রাবলীতে উক্ত পত্রিকাটি সম্পর্কে কবির অজস্র মন্তব্য যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবির ওই সকল মন্তব্য কালানুক্রমিক ভাবে একত্রে সংগৃহীত। সাধনা সম্পর্কে এখানে কবির মোট ত্রিশটি মন্তব্য সংকলিত, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছে।

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িকপত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য প্রায় সকল রচনা প্রথমে সাময়িকপত্রেব পৃষ্ঠায় ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ সাময়িকপত্র কবিকে সাহিত্যসৃষ্টির কাজে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে সেদিক থেকে ভারতী, বালক, সাধনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রপত্রিকাব বিশেষ ভূমিকা ও স্থান রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা প্রথমে বাংলা সাময়িকপত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ও পরে বাংলা সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশ বিষয়ে আলোচনা করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, আদি থেকে সাধনা পত্রিকা—এই সময় পর্বে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার কালানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। উক্ত সূচীতে প্রথমে রচনার নাম, তারপব রচনাটি যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার নাম, পরে প্রকাশ কাল, এবং শেষে রচনাটি কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত তা নির্দেশিত হয়েছে। এই সূচী থেকে দেখতে পাই, ১২৮০ থেকে ১৩০২—এই সময় পর্বের মধ্যে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ সাধনার প্রথম-দ্বিতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্বাধিক প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার যতদূর সম্ভব তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক নানান্ তথ্য এবং বিভিন্ন রচনা ও চিঠিপত্রের মধ্য থেকে কবির মন্তব্য বা ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে কবিতাগুলির অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছি। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার পরিত্যক্ত পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। সাধনায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কবিতার সঙ্গে

প্রচলিত সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে দেখেছি এবং পাঠভেদ নির্দেশ করেছি। প্রচলিত সংস্করণের পাঠ হিসাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রসঙ্গ—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। এখানেও ছোটগল্পগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের প্রযত্ন করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, সাধনায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি ছোটগল্পের পাঠের সঙ্গে তাঁর গল্পগুচ্ছের পাঠ মিলিয়ে দেখেছি, যে কয়েকটি স্থলে পাঠভেদ আছে তা নির্দেশিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে চারটি পৃথক পরিচ্ছেদে সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চার বৎসরের সাধনাকে এই অধ্যায়ে বর্ষ-অনুসারে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রায় নব্বই বৎসর-কাল পূর্বে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান্ বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনা এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। এই বিপুল রচনাসম্ভার অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। দুষ্প্রাপ্য জীর্ণ পুরাতন সাধনা পত্রিকার ধূসর ফাইলের মধ্যে দুর্লভ রবীন্দ্ররচনাগুলি এখনও বন্দী হয়ে আছে।

অষ্টম অধ্যায়ে এই রচনাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। ক. সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ; খ. সাময়িক সারসংগ্রহ , গ. বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই রচনাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের তার প্রমাণ কি ? এ ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছি, কোনো ক্ষেত্রেই অনুমানের উপর নির্ভর করিনি।

সাধনা পত্রিকায় প্রতি ছয় মাসের অন্তে একটি ষাণ্মাসিক সূচীপত্র প্রকাশিত হত। সেই সূচীতে রচনার নামের সঙ্গে লেখকের নামও মুদ্রিত হয়। 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগটির একমাত্র লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাময়িক সারসংগ্রহ' ও 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অপর কোনো কোনো লেখক লিখেছেন। পত্রিকায় যে রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত বলে নির্দেশ করা আছে আমরা কেবল সেই রচনাগুলিকেই এখানে রবীন্দ্ররচনা বলে গ্রহণ করেছি।

'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগের রচনাগুলির মধ্য দিয়ে সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথের একটি অনুদ্ঘাটিত দিক প্রকাশিত হয়। এই বিভাগে

রবীন্দ্রনাথ সাধনা-সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার রচনার মনোজ্ঞ সমালোচনা নিয়মিত লিখতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, কবি যখন ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকা সম্পাদন করেন তখনও তিনি উক্ত কাগজের 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে সাময়িকপত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সমালোচনা নিয়মিত লিখেছিলেন। আমরা বর্তমান গ্রন্থে সাধনা পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ-কৃত মূল্যবান্ সাময়িক সাহিত্য সমালোচনাগুলি উদ্ধার করেছি। এই রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের কোনো পুস্তকে, রবীন্দ্ররচনাবলীতে বা অন্যত্র কোথাও অদ্যাবধি সংগৃহীত হয়নি।

'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগের অন্তর্গত রবীন্দ্ররচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি নিবন্ধ রবীন্দ্রগ্রন্থভুক্ত। যে নিবন্ধগুলি অদ্যাবধি কোনো পুস্তকের অন্তর্গত হয়নি, বিস্মৃতপ্রায় সেই রচনাগুলি সাধনার ফাইল থেকে আমরা এখানে সংগ্রহ করেছি।

সাধনায় 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগে রবীন্দ্রনাথের যে লেখাগুলি মুদ্রিত হয় তার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি কবির বিচিত্র কৌতূহল ও আগ্রহের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে সম্পাদক এবং লেখক ; লেখক অর্থে – কবি, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, শব্দতাত্ত্বিক, বিজ্ঞান-লেখক, ফিচার-লেখক এবং কি নন। 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত যে নিবন্ধগুলি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলিও অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের এই বিলুপ্তপ্রায় দুর্লভ রচনাগুলি বিশ্বভারতীর অনুমোদনক্রমে বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হল।

নবম অধ্যায়ে সমগ্র সাধনা পত্রিকার প্রতিমাসের বিস্তারিত সূচী সন্নিবেশিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থ রচনা কালে আমরা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সাধনা পত্রিকার ফাইল ব্যবহার করেছি। জাতীয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত সাধনা পত্রিকার ফাইলও আমরা দেখেছি। সর্বত্রই পত্রিকা অতি জীর্ণ, পাতা ভেঙে গেছে, কিছু কিছু পাতা সেলাই থেকে খুলে যাওয়ার ফলে হারিয়ে গেছে। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয়ে মাইক্রোফিল্মের সাহায্যে সাধনা পত্রিকার চার বছরের প্রতিটি পৃষ্ঠার ছবি তুলে নেওয়া হয়েছে।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানি যখন বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন পত্রিকা পুনর্মুদ্রণের কাজে হাত দেন রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁদের সাধুবাদ জানিয়ে

লিখেছিলেন, 'বঙ্কিম কর্তৃক সম্পাদিত যে বঙ্গদর্শন একদা সাহিত্যের দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে বাঙালীর অনবধানে কালক্রমে তার স্মৃতি অনুজ্জ্বল হয়ে আসবার আশঙ্কা ঘটেছিল। সেই অকৃতজ্ঞতার অপরাধ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য যাঁরা বঙ্কিমের এই কীর্তিকে পুনরায় স্বদেশের গোচর করতে প্রবৃত্ত হলেন অন্তরের সঙ্গে তাঁদের উদ্দেশে সাধুবাদ জানাই।' রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধন, তাঁর 'হাতের কুঠার', বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ, দুর্লভতম এই সাধনাকে কি বিস্মৃতির হাত থেকে পুনরায় স্বদেশের গোচর করতে প্রবৃত্ত হতে পারি না?

এই গ্রন্থ রচনায় সর্বদা উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিয়ত প্রেরণা দিয়েছেন আচার্যানী শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-চর্চায় আমাকে সতত উৎসাহ দিয়ে নিয়োজিত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-শিষ্য সম্পাদকাগ্রগণ্য শ্রীসাগরময় ঘোষ। তাঁর অনুকূলতায় আমি সুদীর্ঘ কাল রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠ ও পাঠভেদ নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ পেয়েছি। এ বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ের অংশ-বিশেষ ১৩৮৩ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য রচনা: রবীন্দ্রনাথ-কৃত একগুচ্ছ গ্রন্থসমালোচনা' শিরোনামে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের অংশবিশেষ ১৩৮৪ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় 'বিলুপ্তির পথে রবীন্দ্রনাথের শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। বইটির একটি সংক্ষিপ্ত খসড়ারূপ 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র' শিরোনামে বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৭৫ কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মধ্যে শুধু সাধনা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হল।

গ্রন্থ রচনা কালে মাঝে মাঝেই শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছি। আমার প্রতি তাঁর নিত্য উচ্ছলিত স্নেহ আমাকে ধন্য করেছে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীনীহাররঞ্জন রায় অনুগ্রহপূর্বক এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। আচার্যদ্বয়ের মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। দু-একটি বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহে সহায়তা করেছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্খ ঘোষ। নির্দেশিকা সংকলনে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অপর্ণা ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী সূর্যাণী ভট্টাচার্য। এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য

"যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্বকেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব—নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না—এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপক্রমণিকা

"আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'।"

—

('আমার কামনা কভু না নিষ্ফল হবে': চিত্রাঙ্গদা, প্রথম সংস্করণ)

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার উপহার দিয়ে গিয়েছেন তার প্রায় নব্বই শতাংশ রচনাই প্রথমে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়, পরে সে-লেখা তাঁর পুস্তকের অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়। সাময়িকপত্রকে বঞ্চিত করে সরাসরি গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের এমন রচনার পরিমাণ অতিশয় সামান্য।

বাংলা সাময়িকপত্র যে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশ করেই তার দায়িত্ব পালন করেছে তা নয়, কোনো কোনো পত্র-পত্রিকা কবির নিকট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা হয়েও দেখা দিয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে।

সুবিখ্যাত পত্রিকা বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব না ঘটলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যসম্রাট-রূপে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যেত কি না সে-কথা আজ বলা কঠিন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী লিখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি, প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার, সৃষ্টি হল বঙ্গদর্শন, একাধারে সম্পাদক ও লেখকরূপে আবির্ভূত হলেন সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র ; যিনি ছিলেন শুধু ঔপন্যাসিক—তিনি কবি ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক দার্শনিক সমালোচক ও সম্পাদক রূপে আবির্ভূত হলেন বঙ্গদর্শনের পাতায়। আপন সৃষ্ট সাহিত্যের যোগ্য প্রকাশভূমি নিজেই প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকেও রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনে সৃষ্টি করতে হয়েছিল একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা, যে-পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে নিজের আদর্শে ও পরিকল্পনায় পরিচালিত হবে এবং যে পত্রিকায় নিজের রচনা অপর্যাপ্ত প্রকাশ করায় থাকবে না কোনো বাধা এবং কুণ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন হয়েছিল বঙ্গদর্শনের, রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হল মাসিক সাধনা পত্রিকার। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে অনেকগুলি পত্রপত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন—সাধনা তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। ভারতী যদিও ঘরের পত্রিকা, তবুও তো ঠিক একান্ত নিজের পত্রিকা নয়।

সম্পাদিকার হাতে নিজের লেখা বেশি মাত্রায় ঘন ঘন তুলে দেওয়া হয়তো কবির পক্ষে একান্ত সংকোচের কারণ হয়েছিল, হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মিল হল না, এ অবস্থায় প্রয়োজন হল একেবারেই নিজের মনের মতন একটি পত্রিকা—যে-পত্রিকার প্রধানতম লেখক হবেন অকুণ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ - যিনি 'প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে' অপারগ।

সাধনা পত্রিকা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখনীধাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাসে মাসে একটি লেখনী মুখ থেকে একই সঙ্গে নির্ঝরিত হল কাব্য-কবিতা, ছোটগল্প, সাহিত্য-প্রবন্ধ, শব্দতত্ত্ব, সমালোচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, সংলাপধর্মী অভিনব রচনা, ব্যঙ্গকৌতুক, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা, রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক আলোচনা এবং পত্রিকার নিয়মিত বিভাগগুলির চিত্তাকর্ষক মূল্যবান নিবন্ধাদি।

সমগ্র জীবনে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি ছোটগল্প লিখেছিলেন তাব প্রায় অর্ধাংশই রচিত হয়েছিল চার বৎসবের সাধনা পত্রিকার পাতায়।

সাধনা পত্রিকার যুগে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 'আবিষ্কারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়-পর্বে কখনো তাঁর মনে হয়েছে কাব্য রচনাতেই তাঁর সবটুকু সুখ, কখনো বোধ হয়েছে ছোট ছোট গল্প লেখাতেই তাঁব সৃষ্টির সার্থকতা, আবার কখনো বা অনুভব করেছেন সাবনায় উচ্চ বিষয়ের প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়াই হল মহৎ কাজ।

একজন লেখককে সাময়িকপত্রের লেখাগুলির মধ্য থেকে যেভাবে আবিষ্কাব করা যায়, পরবর্তী কালে মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর মধ্য থেকে তাঁকে সেভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। একটি লেখা সাময়িকপত্রে লেখক যখন লেখেন এবং সেই রচনাটি যখন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়—এই দুইয়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়ের অনেক ব্যবধান ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই সাময়িকপত্রে প্রকাশের এক বা দুই দশক পরে গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে। আবার এমন বিপুল সংখ্যক রচনা আছে যা সাময়িকপত্রে প্রকাশের পর আজও তাঁর গ্রন্থভুক্ত হয় নি, এবং সংকলিত হয় নি অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাবলীতেও। পুরাতন সাধনা পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান বিবিধ বিষয়ক নানান্ রচনা—যার অস্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ওই বিলুপ্ত-প্রায় রচনাবলীর মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে নূতন করে আবিষ্কার করার অবকাশ ঘটে।

সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনা পরবর্তী কালে গল্পগুচ্ছ, সোনার তরী, চিত্রা, কথা ও কাহিনী, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, শব্দতত্ত্ব, সমাজ, রাজাপ্রজা, শিক্ষা, পঞ্চভূত, ব্যঙ্গকৌতুক, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ-ছাড়া যে রচনাগুলি অদ্যাবধি গ্রন্থভুক্ত হয় নি, সেগুলিও নানা দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ সাধনার জন্য যে-কোনো সাধারণ একটি লেখাও অতিশয় যত্ন-সহকারে রচনা করতেন। সাধনার বেদীমূলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সরস্বতীকে কবি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারেন নি। অথচ 'যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্নে' রচিত তাঁর সব কয়টি রচনা সাধনা পত্রিকা থেকে এতাবৎকাল আমরা সংগ্রহ পর্যন্ত করতে উদ্যোগী হই নি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।"

কবিকে যদি সত্যই গভীরভাবে বুঝতে চাই তবে পুরাতন সাময়িকপত্র-পত্রিকার ফাইলের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতেই হবে। তাঁর রচিত সাহিত্য বা আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে হয়তো সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলি একত্রে পাওয়া গেল, সমাজ গ্রন্থে সমাজবিষয়ক লেখাগুলি একসঙ্গে পাঠ করার সুযোগ হল, গল্পগুচ্ছে সাধনার গল্পগুলি পড়লাম, সোনার তরীতে পেলাম সাধনার যুগে প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ। আমরা বইগুলি পাঠ করে বলতে পারি গল্পগুচ্ছে সাধনার যুগের ৩৬টি গল্প আছে, কিংবা বলতে পারি তাঁর সোনার তরী কাব্য-গ্রন্থ সাধনা পত্রিকার যুগে রচিত। কিন্তু মন যদি প্রশ্ন করে, যে-মাসে কবি সোনার তরীর রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে লিখেছিলেন সেই মাসে তিনি অন্যান্য রচনা আর কি কি লিখেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পুরাতন পত্র-পত্রিকার ফাইলের শরণাপন্ন হতেই হবে।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে সাধনা পত্রিকায় ১২৯৯ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে-মাসে পত্রিকায় ছাপা হয় গল্পগুচ্ছের একটা আষাঢ়ে গল্প, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবির লেখা চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির লণ্ডনে, সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত সাহিত্যের প্রাণ, সমাজ গ্রন্থের অন্তর্গত আদিম সম্বল এবং শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের অন্তর্গত স্বরবর্ণ শীর্ষক রচনা। অর্থাৎ একজন লেখক একটি সময়ে কি কি রচনা লিখেছিলেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রবাহটি তৎকালে কি-প্রকার ছিল—এ-বিষয়ে স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যাবে, যদি

আমরা মূল পত্রিকা অবলম্বনে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের অবকাশ পাই। সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী সাময়িকপত্রে প্রকাশের কাল অনুসারে যদি কোনো দিন সংকলন ও প্রকাশ করা যায় তবে রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত হয়ে উঠবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সত্যই কোনোদিন প্রকাশ করা সম্ভব হবে কিনা জানি না; কিন্তু এই প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথকে নূতন করে অনুসন্ধানের যে প্রয়োজন আছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। এই কাজে আমাদের প্রথম কবণীয় হল সাময়িকপত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার কালানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করা। এই সূচীই হবে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুসন্ধানের প্রধানতম সবণী। বর্তমান গ্রন্থে আমবা সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের সূচনা থেকে সাধনার শেষ সংখ্যা অর্থাৎ ১৩০২ কার্তিক পর্যন্ত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার কালানুক্রমিক সূচী যথাসাধ্য প্রস্তুত করেছি।

পূর্বেই বলেছি, সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ শুধু লেখকমাত্রই ছিলেন না, এই পত্রিকা সম্পাদনার সকল দায়িত্ব তাঁর উপরেই ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িকপত্রের সম্পাদকরূপেও তাঁর ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মে তাঁর চোখের সামনে যিনি আদর্শরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়েও লেখাবেন স্থির করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে সম্মতিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর ঘটে ওঠে নি। এই পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর শোক-প্রস্তাব রচনা করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেই।

বাল্যকাল থেকেই বাংলা সাময়িকপত্র-পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটে। বঙ্গদর্শন ও তার পূর্ববর্তী কয়েকটি পত্র-পত্রিকার কথা কবি নিজেই লিখে গিয়েছেন জীবনস্মৃতির ঘরের পড়া অধ্যায়ে।

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক-পত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন। একদিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব অন্যদিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্‌ ম্যাগাজিন, স্ট্রাণ্ড্‌ ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিক সংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি।...

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহাব পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৮৫১ অক্টোবর মাসে। বিবিধার্থ সংগ্রহ ও সাধনা পত্রিকার মধ্যবর্তী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকা হল: মাসিক পত্রিকা ১৮৫৪ (প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার), সোমপ্রকাশ ১৮৫৮ (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ), ঢাকাপ্রকাশ ১৮৬১ (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার), রহস্য-সন্দর্ভ ১৮৬৩ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র), গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা ১৮৬৩ (হরিনাথ মজুমদার), অবোধবন্ধু ১৮৬৩ (যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ), অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ (শিশিরকুমার ঘোষ), বঙ্গদর্শন ১৮৭২ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), জ্ঞানাঙ্কুর ১৮৭২ (কৃষ্ণদাস), সাধারণী ১৮৭৩ (অক্ষয়চন্দ্র সরকার), ভ্রমর ১৮৭৪ (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), আর্যদর্শন ১৮৭৪ (যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ), বান্ধব

১৮৭৪ (কালীপ্রসন্ন ঘোষ), প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ১৮৭৪ (সারদাচরণ মিত্র), প্রতিবিম্ব ১৮৭৫ (রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ), ভারতী ১৮৭৭ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), বঙ্গবাণী ১৮৮১ (জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়), সখা ১৮৮৩ (প্রমদাচরণ সেন), সঞ্জীবনী ১৮৮৩ (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়), নব্যভারত ১৮৮৩ (দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী), নবজীবন ১৮৮৪ (অক্ষয়চন্দ্র সরকার), প্রচার ১৮৮৪ (রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), বালক ১৮৮৫ (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী), সাহিত্য ১৮৯০ (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি), হিতবাদী ১৮৯১ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য)।

সাধনা-পূর্ববর্তী হিতবাদী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যেমন কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি তিনি চোখের সামনে ছোটোখাটো নিম্নমানের পত্রিকাও নিশ্চয় অনেক দেখেছিলেন। তাদেব কথা স্বতন্ত্রভাবে তিনি কোথাও না বলে গেলেও হিতবাদীতে প্রকাশিত তারাপ্রসন্নের কীর্তি গল্পে কল্পিত অনেকগুলি পত্রিকাব নাম (গৌড়বার্তাবহ, নবপ্রভাত, ভারতভাগ্যচক্র, শুভজাগরণ, অরুণালোক, সংবাদতরঙ্গভঙ্গ, আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচবী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরী-প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক ইত্যাদি) উল্লেখ করে যেন তাদেরই প্রতি ইঙ্গিত কবে গিয়েছেন।

আমরা সাধারণত বইয়ের প্রথম সংস্করণেব পাঠের সঙ্গে শেষ সংস্করণ মিলিয়ে পাঠভেদ নির্ণয় করি। কিন্তু যে-রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশের পব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল—সে রচনার সাময়িকপত্রের পাঠকেই প্রথম মুদ্রিত পাঠ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁব বইয়ে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত পাঠ যথেষ্ট পরিবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠভেদ বিচারে পুবাতন পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীযতা রয়েছে।

সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং প্রবণতা কি প্রকার ছিল, তাঁর পত্রিকার সঙ্গে সমকালীন অপর কোন্ কোন্ লেখক যুক্ত ছিলেন, তাঁরা পত্রিকায় কি কি বিষয়ে লিখেছিলেন—সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে এই সকল তথ্যের সঙ্গেও আমাদের যুক্ত হওয়া দরকার। সমকাল রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে বিচার করেছিলেন তাও আমাদের জানতে হবে। আরও জানা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথই বা মাসে মাসে নিজের পত্রিকায় সমকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের কি প্রকার সমালোচনা করেছিলেন? সুবিখ্যাত সাহিত্যপত্র সাধনাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের 'কবিত্ব' অপেক্ষা 'কবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বুঝতে চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

সাধনা কার্যত প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত

"চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব।"

১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে (ডিসেম্বর ১৮৯১) সাধনা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল চার বৎসর। প্রথম তিন বৎসর সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথের। চতুর্থ বৎসর রবীন্দ্রনাথ স্বনামে সম্পাদক হিসাবে আবির্ভূত হন।

সাধনা প্রকাশের পূর্বে ওই বৎসরের গোড়ায় (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, ৩০ মে ১৮৯১) সাপ্তাহিক পত্র হিতবাদীর জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সাহিত্যশাখার সম্পাদক হন। মূল সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে পত্রে লিখছেন, "কৃষ্ণকমলবাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে [চট্টোপাধ্যায়] রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। যাই হোক্, ইতিমধ্যে দু'তিন মাসের লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাকে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে। আবার, কথা হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একটা করে ছোট গল্প থাকবে। তোমাকে এই সংকটের সময় আমার সহযোগিতা করতে হচ্ছে। গুটিকতক বেশ ছোট ছোট লঘু পাঠ্য সাহিত্য প্রবন্ধ পাঠাতে হচ্ছে। যত ছোট হয় তত ভালো অতএব সময়াভাবের ওজর ঠিক খাটবে না। বালকে তুমি যেমন বসন্ত উৎসব পাঠশালা প্রভৃতি পাড়াগাঁয়ের চিত্র দিয়েছিলে সেগুলি বড় ভালো জিনিস হয়েছিল কিন্তু আমি তোমাকে ফরমাস করতে চাইনে। তুমি তোমার কর্মস্থানেরও চিত্র দিতে পার কিংবা যা ইচ্ছা লিখতে পার। এই প্রসঙ্গে আর একটা খবর দেওয়া আবশ্যক—লেখকেরা কাগজের অংশ থেকে কিছু পরিমাণে পারিতোষিক পাবেন।—যাই হোক্ লেখা আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাবে।"[১]

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯।

এই হিতবাদী পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক মাস তিনেকের বেশি ছিল না।[২] পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্রে কবি জানিয়েছেন, "সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"[৩]

হিতবাদী প্রকাশকালেব ছয় মাসেব মধ্যে সাধনা প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীমোহনকে লিখেছেন, "সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।"

আমাদের বক্তব্য প্রথম তিন বৎসরের পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত হলেও সাধনার মুখ্য পরিচালক বা সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। পত্রিকার প্রচ্ছদে সম্পাদক হিসাবে যখন সুধীন্দ্রনাথের নাম ছাপা হচ্ছে সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার সাধনা পত্রিকাটিকে 'আমার সাধনা' বলে ঘোষণা করেছেন। একটি পত্রে[৪] সাধনা প্রসঙ্গে বলছেন, "আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'।" ওই পত্রেই পরে লিখেছেন, "সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না—এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।"—এ কার কথা? শুধু কি একজন লেখকমাত্রেব? না কি পত্রিকা সম্বন্ধে যাঁর চিন্তা ভাবনা দায়িত্ব মনোযোগ সকলের অপেক্ষা বেশি তাঁর?

অন্য একটি পত্রে[৫] কবি হঠাৎ সাধনার উল্লেখ করেছেন। সেখানেও তিনি সাধনাকে 'আমার সাধনা' বলেছেন। কবির উক্তি, "আমার সাধনার নিত্য-নৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত।"

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।
৩. আত্মপরিচয়, পরিশিষ্ট।
৪. ছিন্নপত্রাবলী, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।
৫ ছিন্নপত্রাবলী, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

সাধনার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে নতুন পত্রিকার জন্য লেখা চেয়ে চিঠি দেন। ইতিপূর্বে শ্রীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বালক পত্রিকাতেও সম্পাদকের চাপে কিছু কিছু লিখেছিলেন। আমরা দেখেছি হিতবাদীর জন্যও রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা চেয়েছেন। এবার সাধনা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাবি পত্র গিয়ে পৌঁছলো শ্রীশচন্দ্রের হাতে। কবি বলছেন, "সাধনার প্রথম সংখ্যা কি তোমার হস্তগত হয়েছে ?…তুমি কি রাজকার্যে এমনি মগ্ন হয়ে গেছ যে রাজদণ্ড ছেড়ে লেখনী ধরবার অবসর নেই ? একটু আধটু লিখো। সাধনায় কেবলই ঠাকুরের নাম ভালো দেখতে হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাকে লেখাতে অনেক সাধনা চাই, এবং সে সাধনাও সিদ্ধ হয় কি না সন্দেহ।"[৬]

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পাবে সাধনার প্রথম সংখ্যার লেখকসূচীতে পর পব যাঁরা ছিলেন: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবিতা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গল্প), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুব (প্রবন্ধ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিভাগীয় রচনা), সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গল্প), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুব (রচনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিভাগীয় রচনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ধারাবাহিক রচনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিভাগীয় রচনা)।

দেখা যাচ্ছে বিভাগীয় রচনা তিনটি। এক: সাময়িক সারসংগ্রহ, দুই: বৈজ্ঞানিক সংবাদ এবং তিন: সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা। এই তিনটি বিভাগের একমাত্র লেখক যে শুধু রবীন্দ্রনাথ তা নয়, এই বিভাগ তিনটিতে এক-একটি সংখ্যায় কবির রচনার পরিমাণও বিপুল। প্রথম সংখ্যায় সাময়িক সারসংগ্রহে পাঁচটি রচনা, বৈজ্ঞানিক সংবাদে চারটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এবং সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে আছে তিনটি সাহিত্যপত্রিকার দীর্ঘ সমালোচনা।

সাধনার প্রথম প্রকাশ পর্বে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে যে চিঠি[৭] দেন তা থেকে সাধনার উদ্দেশ্যের কথা কিছু জানা যায়। কবি লিখছেন, "একটা কাগজের ভারি দরকার হয়েছে। অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করছেন।

৬-৭. বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯।

একে ত বাঙালীর বুদ্ধি খুব যে পরিষ্কার তা নয়, তার পরে সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েছে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কাব করে বলা দরকার হয়েছে।"

পূর্বেই লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূবি পরিমাণে ছিল।" এ-বিষয়ে দু-একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে।

বলেন্দ্রনাথের দুটি রচনার কথা বলি। রত্নাবলী ও পশুপ্রীতি। সাধনা পত্রিকায় রত্নাবলী ১২৯৮ পৌষে এবং পশুপ্রীতি ১৩০০ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ পৌষ অর্থে পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে বলেন্দ্রনাথকে লিখছেন, "তোমার রত্নাবলী বেশ হয়েছে—একটু আধটু সংশোধন কবে দিলুম।"[৮]

অন্য একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পশুপ্রীতি ব'লে ব[লু] একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে, আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।·· আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে—[বলুর] লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। সব সুদ্ধ [বলুব] এ লেখাটা আমাব তেমন ভালো লাগেনি·· ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে—সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।···বানানো কথা অনেক স্থলে দূষণীয় নয়, কিন্তু এ রকম জিনিস ঠিক খাঁটি না হলে মনটা ভারী বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে অনেকটা আমি তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মত—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—পাখির সন্তানবাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মত—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন—সেই touch of nature makes the whole world kin!"[৯]

রবীন্দ্রনাথই যে সাধনা পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বলেন্দ্রনাথকে লেখা কবির কোনো কোনো চিঠিতে। সাধনার সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ-কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অগ্রহায়ণে প্রথম

৮. বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩।

৯. ছিন্নপত্রাবলী, ২২ মার্চ ১৮৯৪।

সংখ্যা বেরলো। প্রথম সংখ্যার কথা শ্রীশচন্দ্রকে লেখা কবির চিঠিতে দেখেছি। পৌষ সংখ্যা কিভাবে ছাপা হবে না-হবে, কি কি লেখা যাবে, হেডিং সাবহেডিং কেমন হবে, গল্পের নামকরণ কি হবে ইত্যাদি প্রসঙ্গের কথা বলেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে পাই।[১০] হাতে আছে ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আটটি কবিতা। তার মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে ভালো, কোন্‌টি বা পৌষ মাসে যাবে? কবি লিখছেন, "ঋতির 'অভিমান' কবিতাটি আমি ভালো বুঝতে পারলুম না – সপ্তস্বর কবিতাটি সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এইটে পৌষ মাসে দিলে ভালো হয়। সন্ধ্যার পথিকটিও ভালো। তারপরে order of merit অনুসারে লিখতে গেলে রামমোহন রায়, চিত্রদর্শন, যৌবন, ব্যাকুলতা, মালাগাঁথি, অভিমান। অভিমানটা সব শেষে পড়ে। শেষ দুটি ছাড়া অন্যগুলি বেশ ভালো হয়েছে। আমার য়ুরোপের ডায়ারি পাঠালুম। এই লেখাগুলোর হেডিংয়ের নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ('য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি') সাবহেডিং বসিয়ে দিয়ো। 'যক্ষি' নাম দেওয়াটা সঙ্গত হয় না তাহলে পাঠক শেষ পর্যন্ত পড়বার পূর্বেই গল্পটা কতক বুঝতে পারবে। বরং 'বিষয় দান' কিংবা 'সম্পত্তি সমর্পণ' নাম দেওয়া ভালো। সেই গল্পটাই পৌষ সংখ্যায় দিয়ো। – এবারকার গল্পটা বড় মস্ত হয়েছে – তার নাম 'স্বর্ণমৃগ' কিংবা 'মরীচিকা' দেওয়া যেতে পারে। পৌষ মাসের সাময়িক সাহিত্যেব জন্যে বাঙলা কাগজ পাঠিয়ো।

যদি সাধনা ছাপাব ব্যাঘাত না হয় এবং তোমার সুবিধে হয় তা হলে বোটে আমাদেব এখানে এলে আমি তোমাকে দিয়ে কতকগুলো লেখাতে পারি।…

আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, কার্তিক মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনা, প্রাচ্য সমাজ, পৌষ মাসের জন্য সাময়িক সারসংগ্রহ – এ-সবগুলো পাওনি?"[১১]

রবীন্দ্রনাথ যখন এ-চিঠি লেখেন তখনও সাধনার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। চিঠিতে তারিখ নেই। এই পত্রটিতে মুখ্যত পৌষ মাসের সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কবি যে বলেছেন "কার্তিক মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনা…পাওনি?" – এর থেকে বোঝা যায় সাধনার প্রথম সংখ্যা তখনও বেরোয়নি। কারণ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই আছে সাহিত্যের উক্ত

১০-১১. বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩।

সংখ্যার কবিকৃত সমালোচনা। তা ছাড়া কবির নির্দেশ মত অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই দেখা যাচ্ছে—য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি রচনাটির হেডিংয়ের ('যাত্রা আরম্ভ') নীচে ব্রাকেটের মধ্যে সাবহেডিংয়ে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি বসানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠির নির্দেশাদির সঙ্গে পৌষ সংখ্যাটি দেখা যেতে পারে। ঋতেন্দ্রনাথের কবিতা সপ্তস্বর পৌষ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছে। এই সংখ্যায় কবির সম্পত্তি সমর্পণও ছাপা হল। তা ছাড়া পৌষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, প্রাচ্য সমাজ, সাময়িক সারসংগ্রহ। কবি পত্রে লিখেছিলেন, "পৌষ মাসের সাময়িক সাহিত্যের জন্যে বাঙলা কাগজ পাঠিয়ো।" পৌষ সংখ্যায় সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে ছাপা হয়—নব্যভারত ও সাহিত্য—এই দুটি পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যার কবিকৃত সমালোচনা।

বলেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর-একটি পত্র[১২] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিঠিতে তারিখ নেই। তবে বিষয় দেখে বোঝা যায় ১২৯৯ শ্রাবণের পূর্বে রচিত। এ চিঠি থেকেও স্পষ্টত বোঝা যায় সাধনা পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদনা করতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অপরদিকে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে 'সম্পাদক' সুধীন্দ্রনাথের যে কিছুমাত্র ভূমিকা ছিল—এমন সন্ধান আমরা পাচ্ছি না।

নীচে বলেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি উদ্ধৃত করি :

ওঁ

বলু—

তোমাকে আজকের রেজেষ্টি ডাকে যে যে লেখা পাঠান যাচ্ছে আগে তার একটা নম্বরওয়ারি ফর্দ দিই পরে তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখব।—

১। কাবুলিওয়ালা। (গল্প)

২। সমস্যা-পূরণ। (ঐ)

৩। সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।—

৪। জাহাজের কাহিনী। (ডায়ারি)—

৫। সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ। (লোকেনের পত্র)—

১২. বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩।

৬। মানব প্রকাশ।—(তত্ত্বত্তর)।

৭। স্বরবর্ণ 'এ'।

৮। দুর্বোধ বৈষ্ণব পদাবলী।

৯। গোবিন্দ দাস।

১০। পছ সম্বন্ধে ক্ষীরোদবাবুর পত্র।—

প্রথম কথা হচ্ছে—এবারে ১৩ আশ্বিন পূজার দিন, অতএব ভাদ্র আশ্বিন মাসের কাগজ একসঙ্গে বের করা উচিত। দুটো কাগজ আলাদা না করে একসঙ্গে করবার গোটাকতক সুবিধা আছে—প্রথমতঃ মলাট এবং দপ্তরী খরচ কম পড়ে, দ্বিতীয়তঃ অনেক লেখা একত্র থাকাতে বেশ বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, তৃতীয়তঃ বড় কাগজখানা হাতে এলে লাগে ভাল, চতুর্থতঃ বড় বড় লেখাগুলো একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়—অতএব এই বেলা থেকে তৎপ্রতি মন দিয়ো।—

প্রথম দুটো গল্প তোমার কাছে রেখে দিয়ো ওদুটো আপাততঃ ব্যবহারের জন্য নয়।

নম্বর তিন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে নব্যভারত এ পর্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম।

নম্বর চার লেখাটা ভাদ্র আশ্বিন একেবারে দু-মাসের মত।

নম্বর ৫, পেন্সিলে লেখা, কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার, একটু সাবধানে ছাপতে হবে। আর কপি করতে পারিনে।—

নম্বর ছয়—ভাদ্রমাসের। ওটা এইবেলা ছাপিয়ে একটা প্রুফ লোকেনের কাছে পাঠাতে হবে, সে সেইটে দেখে তার শেষ উত্তর লিখলে তবে সেইটে আবার ঐ ভাদ্র আশ্বিনের কাগজে ছাপা হবে।—

নম্বর ৭—শ্রাবণে দেবে কি ভাদ্রে দেবে সুবিধে বুঝে তোমরা স্থির কোরো।—

নম্বর ৮, ভাদ্রমাসে দিলেই হবে।—

নম্বর ৯। অঘোরকে অবিলম্বে পত্র লিখো তার সমস্ত প্রবন্ধটা শেষ করে পাঠাতে। তা হলে ভাদ্র আশ্বিনের সংখ্যায় একবারেই বের করতে পারবে।

নম্বর দশ। এই লেখাটা ক্ষীরোদবাবু সাহিত্যে পাঠিয়েছিলেন—সাহিত্য সম্পাদক, এটা সাধনাতেই ছাপা হওয়া উচিত বিবেচনা করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন—যদি জায়গা থাকে তাহলে এটা শ্রাবণমাসে যাওয়া আবশ্যক—নতুবা

লেখকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভাদ্রমাসে দিলেও চলবে। যদি ওটা ভাদ্রমাসে যায় তাহলে নম্বর আটটা শ্রাবণমাসে দিয়ো—একসঙ্গে দুটো তিনটে বৈষ্ণবী-কীর্তন যাওয়া কিছু নয়।—

ভাদ্রমাসের কাগজটা বোধ করি অক্‌সফোর্ড অথবা অন্য কোনো প্রেসে দেওয়া আবশ্যক হবে, নইলে ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ভাদ্র আশ্বিনের কাগজ সমাজ থেকে বের করা অসাধ্য হবে। এ বিষয়ে তোমরা পরামর্শ করে যথাকর্তব্য স্থির কোরো, দ্বিধায় পড়ে কালবিলম্ব কোরো না। কিন্তু ভাদ্র আশ্বিনের কাগজ একসঙ্গে বের না করলে ভারি মুস্কিলে পড়বে। কারণ পুজোর ছুটির সময় অনেক গ্রাহকেরই ঠিকানা পরিবর্তন হবে পনেরই ভাদ্রে আশ্বিনের কাগজ পাঠালে নিশ্চয়ই তারা নিজ নিজ স্থানেই পাবে। কিন্তু ওদিকে আবার ১৩ আশ্বিন থেকে ১৩ কার্তিক সমাজ বন্ধ থাকবে, অতএব কার্তিক মাসের কাগজটাও খুব সম্ভব Oxford Mission Press-এ ছাপতে হবে। সেখানে তাহলে এইবেলা খবর নিয়ো তাদের ছুটির নিয়ম কি রকম?

ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়, আমার কোন্ দুটো গল্প দেবে? 'ছুটি' এবং 'স্বর্ণমৃগ' দিয়ো।—

শনিবার দিন তুমি আমার এই চিঠি পাবে যদি সেইদিন কিংবা রবিবার দিন জবাব দাও তাহলে আমি এখানেই পাব—নইলে শিলাইদহের ঠিকানায় দিয়ো।

রবিকাকা

এবার রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির সঙ্গে আমাদের সংযোজিত টীকা—

কবির নির্দেশানুসারেই ১২৯৯ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়।

কাবুলিওয়ালা বা সমস্যা-পূরণ গল্প সেই সময় না ছাপিয়ে পরেই ছাপা হয়। কাবুলিওয়ালা ছাপা হয় ১২৯৯ অগ্রহায়ণে, আর সমস্যা-পূরণ মুদ্রিত হয়েছিল অনেক পরে—১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে। অর্থাৎ সমস্যা-পূরণ গল্পটি মুদ্রিত হয় গল্পটি রচনার ১৬-১৭ মাস পরে। এই বিলম্বে ছাপাবার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথেরই। সে নির্দেশ—"প্রথম দুটো গল্প [কাবুলিওয়ালা ও সমস্যা-পূরণ] তোমার কাছে রেখে দিয়ো ওদুটো আপাততঃ ব্যবহারের জন্য নয়।" ১২৯৯ শ্রাবণে ছাপা হয় জীবিত ও মৃত, ভাদ্র-আশ্বিনে মুদ্রিত হয় দুটি গল্প—স্বর্ণমৃগ এবং রীতিমতো নভেল। কার্তিকে ছাপা হল জয়পরাজয়। এরপর অগ্রহায়ণে—সাধনার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হল কাবুলিওয়ালা। এর ঠিক এক বছর পর ১৩০০ অগ্রহায়ণে অর্থাৎ সাধনার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয় সেই

সমস্যা-পূরণ গল্পটি, যা ষোল মাস পূর্বেই রচিত হয়েছিল। মনে হয় স্বরচিত এই গল্পদুটি কবির নিকট বিশেষ মূল্যবান বোধ হয়েছিল তাঁর সমকালীন অন্যান্য গল্পগুলির তুলনায়। সেকালে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বলে তেমন করে কিছু বেরতো না। একালের ন্যায় পূজা সংখ্যা বা শারদীয়া সংখ্যা বলেও কিছু ছিল না। পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যাই ছিল সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা 'বিশেষ' সংখ্যা। সাধনার বর্ষারম্ভ অগ্রহায়ণে। দেখা যাচ্ছে কাবুলিওয়ালা ও সমস্যা-পূরণ দুই-ই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়েছে।

নম্বর তিনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নব্যভারত এ পর্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম।" আষাঢ় ও শ্রাবণে সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা নেই। ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় এই বিভাগে সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে নব্যভারতেরও সমালোচনা মুদ্রিত হয়। বোঝা যাচ্ছে, কবি পরে নব্যভারত পেয়ে সমালোচনা পাঠিয়ে দেন।

নম্বর চার, জাহাজের কাহিনী ভাদ্র-আশ্বিনেই ছাপা হয়।

নম্বর পাঁচ, লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্র-প্রবন্ধ শ্রাবণে (১২৯৯) এবং নম্বর ছয়, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত তদুত্তর মানবপ্রকাশ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

নম্বর সাত, কবির স্বরবর্ণ-এ শেষ পর্যন্ত শ্রাবণ বা ভাদ্র-আশ্বিনে ছাপা না হয়ে কার্তিকে প্রকাশিত হয়।

নম্বর আটে, 'দুর্বোধ বৈষ্ণব পদাবলী' বলতে কবি কোন্ রচনাটির কথা নির্দেশ করেছেন বোঝা যাচ্ছে না।

নম্বর নয়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ গোবিন্দদাস ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় সম্পূর্ণ ছাপা হয়।

নম্বর দশ, পন্থ সম্বন্ধে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের পত্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত।

কবি চিঠির শেষে লিখেছেন, "ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়, আমার কোন্ ছুটো গল্প দেবে? 'ছুটি' এবং 'স্বর্ণমৃগ' দিয়ো।" কবি যখন এ-চিঠি লেখেন তখনো শ্রাবণ সংখ্যা ছাপা হয় নি। সেই সময় তাঁর হাতে অন্তত এই ক'টি গল্প ছিল— জীবিত ও মৃত, কাবুলিওয়ালা, সমস্যা-পূরণ, ছুটি, স্বর্ণমৃগ এবং রীতিমতো নভেল। কিন্তু এগুলি ছাপা হল যথাক্রমে শ্রাবণ ১২৯৯, অগ্রহায়ণ ১২৯৯, অগ্রহায়ণ ১৩০০, পৌষ ১২৯৯, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ ও ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তিনটি গল্প রচিত হবার বেশ পরে ছাপা হয়েছে। সেগুলি কাবুলিওয়ালা, সমস্যা-পূরণ ও ছুটি।

রবীন্দ্রনাথ সাধনা সম্পর্কে কতখানি চিন্তা-ভাবনা করেন তা এই চিঠিটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। কবির ভাবনা তো শুধুমাত্র রচনার প্রতি নয়। কেন ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা এক সঙ্গে ছাপা উচিত—এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। দুটি সংখ্যা একসঙ্গে বের করলে যে মলাট ও দপ্তরীর খরচ কম পড়ে—এদিকেও কবির দৃষ্টি আছে। মনে হয় অন্যের রচনা অপরিষ্কার হাতের লেখায় থাকলে কপি করে প্রেসে পাঠাতেন। অন্তত কবির এই কথাটি থেকে ('পেন্সিলে লেখা, কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার, একটু সাবধানে ছাপতে হবে। আর কপি করতে পারি নে') এ-রকম ধারণাই হয়।

কবি যে শুধু নিজে লিখতেন, পরের লেখা সংশোধন করতেন, অন্যের অপরিষ্কার হাতের লেখা পুনরায় কপি করতেন, পত্রিকা সম্পাদনা করতেন—তাই নয়; পত্রিকার প্রুফও তিনি নিজের হাতে সংশোধন করতেন। ১২৯৯এর ১৬ জ্যৈষ্ঠ (মে ১৮৯২) তারিখের একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর থেকে লিখছেন, "একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ·· পাওয়া গেল।"[১৩]

১৩০০র ১৯ চৈত্র তারিখে রবীন্দ্রনাথ উমেশচন্দ্র বটব্যালকে যে চিঠি দেন তার থেকে বোঝা যায় পত্রিকার লেখকবর্গের সঙ্গেও তিনি গভীরভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। উমেশচন্দ্র ছিলেন সাধনার অন্যতম লেখক। তাঁর সাংখ্য-দর্শন শীর্ষক দীর্ঘ রচনা সাধনায় ১৩০০ আষাঢ় থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে ওই বৎসর চৈত্র সংখ্যায় শেষ হয়। চৈত্র সংখ্যা ১৫ তারিখে বেরোয়; রবীন্দ্রনাথ ১৯ তারিখ এই পত্র লেখেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে এরূপ চিঠি যে পত্রিকার লেখককে উৎসাহিত উদ্বোধিত করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই চিঠি থেকে বোঝা যায় সাধনার লেখা নিয়ে পত্রিকার এই লেখক ও পরিচালকের মধ্যে আরও চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে উমেশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কোনো ফাইল নেই। উমেশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৯ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দের একটি চিঠি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। সেখান থেকে পত্রটি এখানে সংকলিত হল :

১৩. ছিন্নপত্রাবলী।

পাতিসর, আত্রাই

সপ্রীতি নমস্কার নিবেদন—

আপনার সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা পুনশ্চ আপনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইলাম। বঙ্গভাষায় আপনার এ রচনার আর তুলনা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল মালদহে উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় লাভ করিব এবং সশরীরে আপনাকে সাধুবাদ দিয়া আসিব কিন্তু ব্যস্ততা-বশতঃ সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল—কোনো এক সময়ে পরিচয়ের অবসর হইবে এরূপ আশ্বাস রহিল। সাক্ষাৎ পরিচয় থাক বা না থাক আমাকে আপনার একটি ভক্ত পাঠকের মধ্যে গণ্য করিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে কাল-ক্রমে যদি আপনার বন্ধুশ্রেণীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারি তবে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। 'সাহিত্যে' আপনার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে তাহা আমি সবিশেষ আনন্দ ও আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া থাকি জানিবেন। অবশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে আপনি যে পাঠকের বিরাগ ও শ্রান্তির আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা মন হইতে দূর করিবেন।...ইতি ১৯ চৈত্র, ১৩০০। ভবদীয় ভক্ত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেখা যায়, ১৩০১ বৈশাখেই উমেশচন্দ্রের আবার নতুন রচনা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম নূতন তাম্র শাসন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—পর পর তিনটি সংখ্যায় এই দীর্ঘ রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি যে উমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁর দ্বিতীয় পত্র, তা বোঝা যায় চিঠির প্রথম ছত্র থেকেই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম পত্রে কি লিখেছিলেন তা বর্তমানে জানবার উপায় নেই, তবে রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে উমেশচন্দ্র যে পত্র লেখেন সেই মূল পত্রটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। সম্পূর্ণ পত্রটি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল :

মালদহ ১ জুলাই। '৯৩

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ—

প্রিয়তম রবীন্দ্রবাবু, আপনাকে পরিচিতের ন্যায় পত্র লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। এদেশে অনেক লোক যাহারা আপনাকে চক্ষে দেখে নাই বা দেখিবে না তাহারা সাহিত্যসংসারে আপনাকে সুপরিচিতের ন্যায় বোধ করে এবং করিবে। আমার সামান্য প্রবন্ধ আপনার ন্যায় পাঠকের যে প্রীতিকর হইয়াছে ইহা আমার পরম আহ্লাদের বিষয়—শুধু আহ্লাদের কেন শ্লাঘার বিষয়।

এই প্রবন্ধটি লিখিয়া আপনার সহিত যে আমার পরিচয় হইল ইহা পরম লাভ। বঙ্গদেশের মধ্যে আপনাদের পরিবার সুরুচি, সুশিক্ষা ও সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের আদর্শস্বরূপ এবং আপনি এক্ষণে সেই পরিবারের একটি রত্নস্বরূপ। আপনার গদ্যে ও পদ্যে বঙ্গভাষা ভূষিত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে আপনার রচনা পাঠে আপনার স্বজাতীয় বলিয়া আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করি। এক-একবার আপনি ও আমি উভয়েই ভট্টনারায়ণ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি বলিয়া জ্ঞাতি সম্বোধন করিতে বাসনা হয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন—অধিক কি লিখিব। ইতি আপনার গুণানুরাগী শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

চিঠির এই তারিখ থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সাংখ্য-দর্শনের প্রথম সংখ্যা ছাপিয়েই উমেশচন্দ্রকে প্রথম চিঠিটি দিয়েছিলেন।

সাধনার তৃতীয় বর্ষের পর রবীন্দ্রনাথ কি পত্রিকার জন্য অপর কোনও সম্পাদকের নাম চিন্তা করেছিলেন? মনে হয় প্রথম তিন বৎসর যেমন সম্পাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের নাম ছাপিয়ে নিজেই সম্পূর্ণ পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছিলেন, চতুর্থ বর্ষে সুধীন্দ্রনাথেব স্থলে তিনি সেইরকমই আর-কিছু করতে চেয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথ সাধনার সম্পাদক হিসাবে কার কার নাম ভেবেছিলেন? আমরা এখানে দুটি নাম উল্লেখ করতে পারি। এক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দুই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে সাধনার সম্পর্ক প্রথমাবধি ভাল ছিল না। তবে কেন হঠাৎ সাধনা-সম্পাদনায় সুরেশচন্দ্রের নাম এল? ১৩১০ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত নিত্যকৃষ্ণ বসুর স্বরচিত দিনলিপিতে নিম্নরূপ আছে—

"১৯শে আশ্বিন [১৩০১]। প্রিয়বাবুর মুখে 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায় শুনিয়া রবীন্দ্রবাবু সাহিত্যের সহিত 'সাধনা'র সম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন। 'সাধনা'র আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু 'সাহিত্য' এখন নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত সম্মিলন কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা সহজে ঠিক করিতে পারা যায় না।...এই সম্মিলনের পরিণাম প্রকৃতপক্ষে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না।"

২৩ আশ্বিনের ডায়রিতে লেখা—"সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধু অক্ষয়বাবুর সহিত

দেখা হইল। তিনি 'সাহিত্য' ও 'সাধনা'র সম্মিলনের কথা উত্থাপন করিলেন। অনেকের মত নাই শুনিয়া তিনিও মত দিতে পারিলেন না। আপত্তি প্রায় সকলেরই এক রকমের। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, এ দিকে 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার মন বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। সম্মিলনটা বোধ হয় নিতান্তই অনিবার্য। তবে একটু আশার কথা এই যে, সু-চন্দ্রই সম্পাদক রহিলেন, রবিবাবু কেবল লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন।"

২৮ আশ্বিনের ডায়রিতে আছে – "সাহিত্য ও সাধনার সম্মিলন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইল না দেখিতেছি। সু-চন্দ্র আজ রবিবাবুকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই ছয় মাস তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন না। আমাদের বলিলেন, ছয় মাস কেন, ও প্রস্তাব আর কখনই বোধহয় সফল হইবে না। এত পরামর্শ, লোক জানাজানি করিয়া শেষে সব ভাসাইয়া দেওয়াটা আমার মতে ভালো না হইলেও, সম্মেলন না হওয়াতে যে আমি আনন্দিত, তাহা আব না বলিলেও চলে। আর একখানা 'ঠাকুরবাড়ির কাগজ' বাড়াইয়া কোনও ফল নাই।"

সাহিত্য-এ ১৯ আশ্বিনের ডায়রি ১৩১৩ বৈশাখ এবং ২৩ ও ২৮ আশ্বিনের ডায়রি ১৩১৩ কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত।

অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি পত্র থেকে জানতে পারি সাধনার চতুর্থ বর্ষের সম্পাদক হিসাবে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম চিন্তা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর নিয়োগ করা হয় নি। ঠাকুরদাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৭ কার্তিক ১৩০১) –

"যাহা হউক এ বৎসরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আবশ্যক বোধ করি ত আগামী বৎসরে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা করিব। পূর্বের ন্যায় ব্যয় বাহুল্য বলিয়া আপনাকে সাধনার সম্পাদক পদে নিয়মিত নিযুক্ত করিতে সাহস করিলাম না।"[১৪]

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাধনার সম্পাদক হিসাবে নিজের নাম প্রকাশ করলেন।

১৪. ভারতবর্ষ ১৩২৪ বৈশাখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাত ওল্‌টাচ্ছিলুম—মনে জানি যে, চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফ্ শিট্ সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবা-মশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে…।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধনা পর্বে রবীন্দ্রজীবনের রেখাচিত্র

সাধনা প্রকাশিত হল ১২৯৮ অগ্রহায়ণ মাসে। অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। কবি দ্বিতীয়বার বিলাতবাস সাঙ্গ করে দেশে ফিরলেন ১৮৯০ নভেম্বর মাসে। বিলাত থেকে ফিরবার দু মাসের মধ্যেই কবিকে মহর্ষির নির্দেশে উত্তরবঙ্গে যেতে হল জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করে।

জমিদারির কার্যকাল-পর্বেই সাধনা পত্রিকার প্রকাশ। ১২৯৮ কার্তিক মাসের গোড়ায় কবি শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসেন। সাধনা প্রকাশিত হবে অগ্রহায়ণের ১৫ তারিখে। কলকাতায় আসবার পূর্বে ৩ কার্তিক তারিখে শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে পত্রে লেখেন, "নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না—ও-ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এ পর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্ ঝিক্ করছে—একটি লোক নেই, একটি নৌকো নেই—ও পারের নতুন চরে একটি গাছ নেই, একটি তৃণ নেই—মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে—জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধু ধু করছে।…আমি যেন এই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম।… কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ, এই নিরুদ্দেশ

নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী – হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে।"[১]

মনের মধ্যে যখন প্রকাশের অন্তহীন সুতীব্র আকুলতা সেই সময়েই দেখা গেল সাধনা পত্রিকা প্রকাশের উদ্‌যোগ আয়োজন। এই পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে কবি নিজে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে কর্তব্যভার একটা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল শিলাইদহের জমিদারি দেখাশুনার দায়িত্ব, এর সঙ্গে এসে যুক্ত হল নূতন পত্রিকা পরিচালনার প্রায় সবটুকু দায়িত্ব। শুধু সম্পাদকী দায়িত্ব নয়, মুখ্য লেখকের দায়িত্বভারও তাঁকেই নিতে হল।

কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ আবার দিন কয়েকের জন্য শিলাইদহ চলে গিয়েছিলেন। ছিন্নপত্রাবলীতে শিলাইদহ থেকে ৬ অগ্রহায়ণ তারিখের পত্র পাই। এই অগ্রহায়ণের শেষে বা পৌষের গোড়ায় তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয়। ১২৯৮এর ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। উৎসবে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়ে গান করেন। উৎসবের পর কবিকে পুনরায় জমিদারিতে চলে যেতে হয়।

শিলাইদহে ১২৯৮ ফাল্গুনে লিখলেন সোনার তরী ও শৈশবসন্ধ্যা কবিতা এবং বিম্ববতী শীর্ষক 'রূপকথা' কবিতা। শিলাইদহ থেকে ৮ এপ্রিল ১৮৯২ তারিখের পত্রে লিখছেন, "এখানে এসে আমি এত এলিমেণ্টস অফ পলিটিক্‌স এবং প্রব্লেম্‌স্ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে।... এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।"[২]

চৈত্রের শেষ প্রান্তে কবিকে দেখি জোড়াসাঁকোয়। সেখানে বসে লিখলেন রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে শীর্ষক 'রূপকথা' কবিতা।

১২৯৯ বৈশাখ। কবি এখন সপরিবারে বোলপুরে। কবির এখন বয়স একত্রিশ, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর বয়স কুড়ি। মাধুরীলতা (৬) রথীন্দ্র (৪) ও রেণুকা (২) – রবীন্দ্রনাথ এ-সময় এই তিন সন্তানের জনক। সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের মধ্যে একমাত্র দ্বিতল গৃহ 'শান্তিনিকেতন'। কবি সপরিবারে এই গৃহে

১-২ ছিন্নপত্রাবলী।

থাকেন। গার্হস্থ্যজীবনের সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে সেই সময়কার কোনো কোনো চিঠিতে। বোলপুর থেকে ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ তারিখের চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, "সেদিন সন্ধ্যেবেলায় খোকাতে বেলাতে একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়ে গেছে, সেটা উদ্ধৃত করবার যোগ্য। খোকা বললে—'বেলা, আমার জল ক্ষিধে পেয়েছে।' বেলা বললেন—'দূর ফোক্‌লা, জল ক্ষিধে বুঝি বলে! জল তেষ্টা। খোকা অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে—'না, জল ক্ষিধে।' বেলা—অ্যাঁ খোকা! আমি তোর চেয়ে তিন বছরের বড়ো, তুই আমার চেয়ে ছ বছরের ছোটো, তা জানিস! আমি তোর চেয়ে কত বেশি জানি!' খোকা সন্দিগ্ধভাবে—'তুমি এত বড়ো!' বেলা—'আচ্ছা, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্।' খোকা অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে—'তেমনি আমি যে দুধ খাই, তুমি যে দুধ খাও না।' বেলা অবজ্ঞাভরে—'তাতে কী! মা তো দুধ খায় না, তাই বলে কি মা তোর চেয়ে বড় নয়!' খোকা সম্পূর্ণ নিরুত্তর, এবং বালিশে মাথা রেখে চিন্তান্বিত। তখন বেলা বকতে আরম্ভ করলে, 'O father, একজনের সঙ্গে আমার ভয়ানক ভয়ানক friendship। সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি! Oh I can eat her up!' বলে ছুটে রেণুকে গিয়ে এক পত্তন চট্‌কে চুমো খেয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে এল।"

এই উদ্ধৃতাংশের মধ্য দিয়ে কবির তৎকালীন পারিবারিক জীবনের মধুর চিত্র ধরা পড়ে। এই সময় তাঁর 'সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক লেখা'র কাজ চলছে—গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-সমালোচনা ইত্যাদি। শান্তিনিকেতন থেকে ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ তারিখে চিঠিতে লিখেছেন, "রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানে নি, প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়।"[৩]

পরের দিনই (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) কবি বর্ষা-যাপন নামক কবিতায় লিখলেন—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,

৩. ছিন্নপত্রাবলী।

সহস্র বিস্মৃতিরাশি 		প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতার শেষে লিখিত আছে, 'শেষ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ / শান্তিনিকেতন / আরম্ভ বহুদ্দিনের।' আমরা ১১২ চরণের কবিতাটির মধ্যে ৯১-৯৬ চরণ উদ্ধৃত করেছি। এই অংশকে সহজেই বর্তমান কবিতার শেষ ভাগ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাহলে এই অংশের রচনাকাল ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ বলে গ্রহণ করতে পারি।

ছিন্নপত্রাবলী ও বর্ষা-যাপন কবিতা থেকে যে-দুটি অংশ উদ্ধৃত হল তা থেকে বোঝা যায় কবি এই সময় ছোটগল্প এবং কবিতা—উভয় রচনার প্রতিই সমান আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া 'দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে।'[৪]

শান্তিনিকেতনে কবি ১৪ জ্যৈষ্ঠ (১২৯৯) তারিখে লিখেছেন নিদ্রিতা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ সুপ্তোত্থিতা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ তোমরা ও আমরা, ১৭ জ্যৈষ্ঠ সোনার বাঁধন ও বর্ষা-যাপনের শেষাংশ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ হিং টিং ছট্ এবং ১৯ জ্যৈষ্ঠ পরশপাথর।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে কবি বোলপুর থেকে উত্তরবঙ্গে চলে এলেন। স্ত্রী-পরিবার থেকে গেলেন কলকাতায়। বোলপুর থেকে শিলাইদহে এসে ৭ আষাঢ় ১২৯৯ তারিখে কবি তাঁর গোড়ায় গলদ প্রহসনটির 'শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত' করেন।[৫]

শিলাইদহ থেকে কবি ক'দিন পরেই সাহাজাদপুরে এসে উপস্থিত হন। এখানে বসে সাধনার কাজ চলছে। সঙ্গে আছে জমিদারির কাজ, গ্রাম্য-স্কুলের ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব, পুণ্যাহ প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন।

এবার উত্তরবঙ্গ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ তিনটি কবিতা লেখেন। সাহাজাদপুরে ১২৯৯ এর ১৮ আষাঢ় তারিখে লেখেন বৈষ্ণব কবিতা, সাহাজাদপুরে ১৯ আষাঢ় দুই পাখী এবং বোটে বিরাহিমপুরের পথে লেখেন আকাশের চাঁদ শীর্ষক কবিতা।

রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, "পদ্মার জীবন কেবল কবিতার ছন্দরচনা ও জমিদারি যন্ত্রচালনা নহে। জমিদারি যন্ত্রের মধ্যে হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট আছে

৪. ছিন্নপত্রাবলী, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

৫. ছিন্নপত্রাবলী, ২২ জুন ১৮৯২।

—ফটিক মজুমদারের মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষের উকিল বক্তৃতায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি কি কথা বলিয়াছে, তাহাও মন দিয়া শুনিতে ও তার পর যথাযোগ্য ব্যবস্থা দিতে হয়। 'সাবেক ইজারাদারদের নামে বাকি খাজনার ডিক্রি করা হয়েছে—তার সুদ ধাপ নিয়ে কিস্তিবন্দী করে টাকা দিতে চায় এবং তাদের দেনার মধ্যে যে সমস্ত ওজর আছে তারও একটা সদ্‌বিচার' করিতে হয়। এই শ্রেণীর কাজ অগণিত।"৬

সাধনার বিচিত্র রচনাসম্ভার সরবরাহের মধ্যে ক্ষীণ অবসরের ফাঁকে দুটি নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল ১২৯৯ ভাদ্র মাসে—চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য ও গোড়ায় গলদ প্রহসন। তবে চিত্রাঙ্গদা রচিত হয়ে গিয়েছিল এক বৎসর পূর্বেই—১২৯৮ ভাদ্রে। এই এক বৎসরের মধ্যে মাজা-ঘসার কাজ নিশ্চয় চলেছে।

কবি ১২৯৯ ভাদ্র মাসের গোড়ায় কলকাতায় আসেন এবং তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে আহ্বান করে গোড়ায় গলদ প্রহসনটি পড়ে শোনান। গোড়ায় গলদ প্রকাশিত হয় ৩১ ভাদ্র তারিখে। রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, "বোধ হয় গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ভাদ্র মাসের কোনো সময়ে উহার অভিনয় হয় সংগীতসমাজ গৃহে।"৭

শরৎকালটা রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকেন। স্থির হয় মৃণালিনী দেবী সন্তানদের নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে সোলাপুর যাবেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কবি পরিবারের সকলকে কলকাতায় রেখে শিলাইদহে চলে আসেন কার্তিক মাসে। শিলাইদহে যাত্রার পূর্বে ১৪ কার্তিক ১২৯৯ তারিখে কবি লিখলেন যেতে নাহি দিব। শিলাইদহ থেকে কবি গেলেন রাজশাহী (রামপুর-বোয়ালিয়া); এখানে বন্ধু লোকেন পালিত জেলা-জজ হয়ে এসেছেন পূর্বের মাসে (১১ অক্টোবর ১৮৯২)। কবি এখানে কাটালেন কয়েকটি দিন; ২৯ কার্তিক থেকে ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ পর্যন্ত। ১৭ নভেম্বর বা ৩ অগ্রহায়ণ ইন্দিরা দেবী সোলাপুরে চলেছেন পিতামাতার (সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনী) নিকট; সঙ্গে আছেন মৃণালিনী দেবী ও তাঁর সন্তানগণ। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী থেকে ইন্দিরা দেবীকে ১৮ নভেম্বর পত্রে লিখছেন, "আজ সকালবেলায় উঠে অবধি আমি মনে মনে তোদের গাড়ির জানালার পাশে

৬-৭. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

বসে তোদের সঙ্গে রেলের দুই পার্শ্বের রৌদ্রোজ্জ্বল চিত্রগুলি দেখে যাবার চেষ্টা করছি।"[৮]

লোকেন পালিতের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছেন প্রমথ চৌধুরী। রাজশাহীতে সে-ক'দিন কবিকে ঘিরে রীতিমত একটি সাহিত্যিক মজলিশ জমে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লোকেন পালিত ও প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে মজলিশে এসে যোগ দিতেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শরৎকুমার রায় প্রমুখ তৎকালীন তরুণের দল।

রাজশাহীতে থাকা-কালেই কবি শিক্ষার হেরফের শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখে সেখানকার এসোসিয়েশনে পাঠ করেন। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সমর্থন জানালেন বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে রাজশাহী থেকে রবীন্দ্রনাথ এবার নাটোর যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন লোকেন পালিত। ঘোড়ার গাড়িতে আটাশ মাইল পথ। গাড়ির মধ্যে লোকেন বই পড়েন, কবি গান ধরেন 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি'। পথে বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে তর্ক চলে দুই বন্ধুতে।

সাত দিন নাটোরে থেকে কবি শিলাইদহে ফিরে আসেন। নাটোরে কয়েকটা দিন কবি দন্তশূলে বিশেষ কষ্ট পান। সেখানকার সেবাযত্নে তিনি সুস্থ হয়ে শিলাইদহে ফেরেন। ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখে শিলাইদহ থেকে কবি ইন্দিরা দেবীকে লেখেন, "এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি।"[৯]

রাজশাহী নাটোর হয়ে শিলাইদহে ফেরার মধ্যে একটি কবিতা রচিত হয়—প্রতীক্ষা। এই কবিতাটির প্রথম খসড়া ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ রাজশাহীতে, পুনর্লিখিত হয় ২০ অগ্রহায়ণ নাটোরে এবং শেষ রূপদান ঘটে শিলাইদহে ফিরে ২৭ অগ্রহায়ণ।

শিলাইদহ ফেরবার পরই কবি 'দিন তিনেকের জন্যে পাবনা' যান।[১০] শিলাইদহ থেকে বোট ছাড়বার মুখে সোলাপুর থেকে স্ত্রীর পত্র এসে পৌঁছায়।

৮-৯. ছিন্নপত্রাবলী

১০. চিঠিপত্র ৫।

মৃণালিনী দেবী লিখেছেন যে সোলাপুরে তাঁর আর ভালো লাগছে না, যথাশীঘ্র কলকাতায় ফিরবেন। কবি পত্রোত্তরে লিখছেন, "ছেলেরা অনেকটা শুধরে এবং শিখে এবং ভাল হয়ে আসবে এই রকম আমি খুব আশা করেছিলুম। যাই হোক সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়।…সমস্ত দিন বোট চলছে সন্ধ্যে হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ত পাবনায় পৌঁছলুম না।"[১১]

পাবনা থেকে ফিরে এসেই (১৪ ডিসেম্বর ১৮৯২) কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, "আমি কতক জমিদারির কাজ দেখচি, কতক সাধনার জন্যে লিখচি এবং চেষ্টা করচি এরই মধ্যে একটুখানি অবসর করে নিয়ে [কবিতা] লিখতে।"[১২]

৪ পৌষ ১২৯৯, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯২ কবি লিখলেন মানসসুন্দরী কবিতা।

১৯ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে কবি শিলাইদহ থেকে লেখেন, "মনে করি তাড়াতাড়ি অনেকগুলি কাজ একদমে চুকিয়ে ফেলে তার পরে বেশ আরামে নিশ্চিন্ত এবং নিরিবিলি আমার কবিতা নিয়ে পড়ব – কিন্তু প্রতিদিন এবং প্রতিমাস আপনার নতুন নতুন কাজ নিয়ে এসে হাজির হয় – কেউ নেই, যে আমাকে দয়া ক'রে একটু সাহায্য করে – কাজেই হুহুঃ শব্দে সমস্ত কাজ সেরে যেতে হয় – বেশ একটু রসিয়ে রসিয়ে জিরিয়ে জিরিয়ে বেশ ধীরে ধীরে আস্বাদ করে যে সমস্ত কাজ করতে হয় – ঠিক কাজ নয়, মনের যে সমস্ত সখ মেটাবার ইচ্ছে হয় সে সমস্তই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্যে একপাশে ঠেলে রেখে দিতে হয়। কত কর্তব্য কাজই হয়ে ওঠে না – আত্মীয়দের কত অভিমান সহ্য করতে হয় এবং নিজের মনের মধ্যেও প্রতিদিন কত অতৃপ্তি বহন করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্চে, যখন যে কর্তব্যটা স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা। যে অবস্থা দ্বারা পরিবৃত হওয়া যায় সেই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উপস্থিত কর্তব্য সেগুলো পালন করা। তাই আমি প্রতিমাসে নতশিরে সাধনার লেখা লিখে যাচ্ছি এবং প্রতিদিন জমিদারির সমস্ত খুচরো কাজ মনোযোগপূর্বক করছি।"[১৩]

১৮৯২ সাল এইভাবে কেটে যায়।

১৮৯৩ সাল। কলকাতায় মাঘোৎসবের পর ফেব্রুআরির গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ

১১. চিঠিপত্র ১।

১২-১৩. চিঠিপত্র ৫।

বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে জমিদারি তদারকের কাজে উড়িষ্যায় যাত্রা করলেন। নৌকায় করে খালে খালে কটক পৌঁছলেন।

কটকে তাঁরা উঠলেন বিহারীলাল গুপ্তের বাসায়। বিহারীলাল গুপ্ত ছিলেন সে-সময় কটকের ডিস্ট্রিক্ট জজ।

কবি কটকে থাকতে একদিন (৯ ফেব্রুআরি ১৮৯৩) বিহারীলালের বাড়িতে এক ভোজসভায় র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খাবার টেবিলে বসে সেই সাহেব ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে এমন কিছু মন্তব্য করেন যেটা কবির অন্তস্তলকে বিদ্ধ করে। সাহেবের মতে ভারতীয়দের নৈতিক জীবনের মান এতই নীচু এবং জীবনের পবিত্রতা বিষয়ে তারা এতই উদাসীন যে জুরি প্রথায় তাদের সংখ্যা যত কমানো যায় ততই ভাল। সে-সময় দেশে জুরি প্রথার সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন চলছিল। কবি এই ঘটনার উল্লেখ করে ১০ ফেব্রুআরি তারিখের পত্রে লিখছেন, "আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল,...উঃ, ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা! অপমান চুপ করে সয়ে থাকাই যথেষ্ট হেয়, কিন্তু তার উপরে আবার ওদের কাছে গায়ে পড়ে আদর কাড়তে যাওয়া আমার বোধহয় অবনতির একশেষ!"[১৪] সম্ভবত এই দিনের কথা স্মরণ করে কবি কিছুকাল পরে অপমানের প্রতিকার শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন। সেটি সাধনায় ১৩০১ ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

কটক থেকে রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল পুরী যাত্রা করেন। ১৪ ফেব্রুআরি 'রাত্রে কনারক সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে' যান। এরপর ভুবনেশ্বরের মন্দির কবি দেখেন। সাধনায় ১৩০২ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যখন ভুবনেশ্বর ও কনারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায় তখন মনে হয়, এই আশ্চর্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্‌বুদের মতো হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল?"

কবি পুনরায় পুরী থেকে কটক ফিরে আসেন। কটক থেকে ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে লেখা চিঠিতে জানা যাচ্ছে সাধনার জন্য কবির লেখা এখন 'হু হু করে এগিয়ে' যাচ্ছে।[১৫] শিলাইদহ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখের চিঠিতে

১৪-১৫. ছিন্নপত্রাবলী।

প্রমথ চৌধুরীকে কবি লিখেছিলেন, "আমি প্রতিমাসে নতশিরে সাধনার লেখা লিখে যাচ্ছি এবং প্রতিদিন জমিদারীর সমস্ত খুচ্‌রো কাজ মনোযোগপূর্বক করচি। তুমি কি মনে কর এতে আমি কোনো সুখ পাই? আজকাল আমি চিঠিও যা লিখি সেও আমার কর্তব্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[১৬] অথচ দু' মাস পরেই পুরীর সমুদ্র ও উড়িষ্যার মন্দিরাদি দর্শন সাঙ্গ করে ২৫ ফেব্রুআরিতে লিখছেন, "যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি।"[১৭]

কটক থেকে কবি বালিয়া যান ফেব্রুআরির শেষে। পাণ্ডুয়ার কুঠিতে দিন তিন-চার ছিলেন। তারপর কটকে ফিরে আসেন ৬ মার্চ তারিখে। পর দিন স্টীমার যোগে কলকাতা রওনা হন।

পাণ্ডুয়া থেকে কটক এবং কটক থেকে কলকাতা ফেরার পথে কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। তালদণ্ডা খাল, পাণ্ডুয়া থেকে কটকের পথে, ২২ ফাল্গুন ১২৯৯ তারিখে লেখেন অনাদৃত। ২৩ ফাল্গুন সেই খালপথে লেখেন নদীপথে ও দেউল শীর্ষক দুটি কবিতা। ২৬ ফাল্গুন স্টীমার যোগে কটক থেকে কলকাতায় আসার পথে লেখেন বিশ্বনৃত্য।

১২৯৯ চৈত্র মাসের গোড়ায় (মার্চ ১৮৯৩) কবি কটক থেকে কলকাতায় ফিরেছেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মাঝে সাত দিন কাটাতে না কাটাতেই তাঁকে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করতে হল। রাজশাহীতে লোকেন পালিতের নিকট কয়েকদিন কাটিয়ে জমিদারি দেখে কবি চৈত্র মাসেই ফিরে আসেন।

কলকাতা থেকে রাজশাহী যাবার পথে কবি ১১ চৈত্র ১২৯৯ তারিখে লিখলেন দুর্বোধ শীর্ষক কবিতা, ১৫ চৈত্র রামপুর বোয়ালিয়ায় লেখেন ঝুলন, এবং এই স্থানে অবস্থানকালে ১৭ চৈত্র তারিখে লেখেন সমুদ্রের প্রতি শীর্ষক কবিতাখানি।

রবীন্দ্রনাথের ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস প্রদানকালে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধাস্পদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ শরৎকালটা কলিকাতায় থাকিয়া যান। এই সময় স্থির হয় মৃণালিনী দেবী সন্তানদের লইয়া

১৬. চিঠিপত্র ৫।
১৭. ছিন্নপত্রাবলী।

অগ্রহায়ণ মাসে [১২৯৯] সোলাপুরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে যাইবেন, তাঁহার সন্তানসম্ভাবনা। বোধ হয় সেইজন্য সেখানে পাঠাইতেছিলেন এবং তদ্রূপ স্থির করিয়া কার্তিক মাসে শিলাইদহে ফিরিতেছিলেন।"[১৮] আমাদের মনে হয় মৃণালিনী দেবী সে-সময় সন্তানসম্ভবা ছিলেন না। তাঁর তৃতীয় সন্তান রেণুকার জন্ম হয় ১১ মাঘ ১২৯৭, ২৩ জানুআরি ১৮৯১। অর্থাৎ ১২৯৯ বা ১৮৯২এর পূর্বেই। মনে হয় মৃণালিনী দেবী তাঁর চতুর্থ সন্তান গর্ভে ধারণ করেন আমাদের আলোচ্য পর্বে, অর্থাৎ ১২৯৯ চৈত্র অর্থাৎ ১৮৯৩ মার্চ মাস নাগাদ। দশ মাস পর দেখি চতুর্থ সন্তান মীরা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তারিখ ২৯ পৌষ ১৩০০, ১২ জানুআরি ১৮৯৪।

কবি বর্ষশেষের কয়েকদিন পূর্বেই কলকাতায় ফিরেছেন। দেখতে দেখতে নূতন বর্ষ এসে পৌঁছলো। ১৩০০ বঙ্গাব্দ। ৮ বৈশাখ প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের নূতন পুস্তক 'গানের বহি'। বৈশাখের মাঝ পর্যন্ত কবি কলকাতায়। ৩০ এপ্রিল তারিখেও কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছেন। ২ মে ১৮৯৩ তারিখে শিলাইদহ থেকে লিখছেন, "এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। ...এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাৎ হয়ে যায়। কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসে ছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুর বেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেন্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি।"[১৯]

১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের শেষার্ধে শিলাইদহে কাটিয়ে জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় কবি কলকাতায় ফেরেন। ২২ জুন (১৮৯৩) তারিখেও কলকাতা থেকে পত্র লিখেছেন। ২ জুলাই তাঁকে পুনরায় শিলাইদহে দেখি। এবার আষাঢ় মাসটা জুড়ে কবি বেশ কয়েকটি কবিতা লেখেন। ১২ আষাঢ় (১৩০০) তারিখে হৃদয় যমুনা শীর্ষক কবিতা লেখেন। ১২ আষাঢের অর্থ হল ২৫ জুন। এ-সময় কবি কলকাতাতে থাকতে পারেন আবার শিলাইদহের পথেও যাত্রা করতে পারেন। ব্যর্থ যৌবন শীর্ষক ১৬ আষাঢ়ে রচিত কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা। তবে ভরাভাদরে, প্রত্যাখ্যান ও লজ্জা এই তিনটি কবিতা যথাক্রমে ২৭, ২৭ এবং ২৮ আষাঢ় তারিখে রচিত হওয়ায় বোঝা যায় উত্তরবঙ্গে রচিত।

১৮. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ৩৫২।

১৯. ছিন্নপত্রাবলী।

কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাগুলির সঙ্গে রচনাকাল দেওয়া আছে কিন্তু রচনাস্থলের নির্দেশ নেই।

কবি এবার একটানা অনেকদিন উত্তরবঙ্গে আছেন। ১৩ শ্রাবণ তারিখে দীর্ঘ কবিতা লিখলেন, পুরস্কার। ২৬ শ্রাবণ পতিসরে বিদায় অভিশাপ রচনা শেষ করেন।

কালীগ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরলেন ভাদ্রের (১৩০০) গোড়ায়। কলকাতায় ফিরে দেখেন রাজনৈতিক নানা ঘটনা উপলক্ষে শিক্ষিতমহলে উত্তেজনা। রবীন্দ্রনাথও এর মধ্যে থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেনের অবিশ্রাম উত্তেজনায় কবিকে রাজনীতি সমালোচনায় যোগ দিতে হল। চৈতন্য লাইব্রেরিতে কবি প্রবন্ধ পাঠ করলেন—ইংরেজ ও ভারতবাসী। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। সভায় পাঠ করার পূর্বে বঙ্কিমকে এই প্রবন্ধটি একবার শোনাতে হয়েছিল। শোনাবার পর বঙ্কিমের প্রশংসা বাক্যে কবি 'অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন' হয়েছিলেন। বঙ্কিমও 'প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন।'

সেপ্টেম্বরের (১৮৯৩) গোড়ায় কবিকে কার্মাটারে দেখি। তিনি কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করতে এখানে চলে এসেছেন।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বা আশ্বিনের গোড়ায় কলকাতায় ফিরে আসেন কবি।

কার্তিকের শেষ দিকে দুটি কবিতা লেখেন দেখতে পাই। একটি ২৬ কার্তিক ১৩০০, বসুন্ধরা, দ্বিতীয়টি ২৯ কার্তিক, কণ্টকের কথা। এর পরেই পাই আটটি সনেট—মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ (৫ অগ্রহায়ণ)।

কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের সিমলা শৈলে এসে থাকেন। এখানে দুটি কবিতা লেখেন অচল স্মৃতি ও পথ। দুটি কবিতারই রচনাকাল ১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০।

এই অগ্রহায়ণে সাধনা পত্রিকা তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করে। এই দুই বৎসরে রবীন্দ্রনাথ গদ্য পদ্য অজস্র লিখেছেন। সাধনার সূচীপত্রের দিকে একবার তাকালেই তা অনুধাবন করা যাবে। দু-বৎসর বা চব্বিশ মাসে তেইশটি ছোটগল্প লিখেছেন। অর্থাৎ বাইশ সংখ্যায় তেইশটি গল্প। সাময়িক সারসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ,

কবিতা, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গকৌতুক, গান, ডায়রি ইত্যাদি বিবিধ রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করে আছেন। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে কেবল সেই সকল রচনার উল্লেখ করছি যেগুলির রচনাকাল ও রচনাস্থল সংগ্রহ করা গেছে। কবির বিচিত্র জীবনযাত্রাপথের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখনী কিভাবে চলেছে—সেই বিষয়ে আমরা কৌতূহলী।

১৩০০ অগ্রহায়ণ মাস সিমলায় কাটিয়ে পৌষের গোড়ায় কবি কলকাতায় ফিরলেন। তৃতীয় বার্ষিক ব্রহ্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। সকালের উপাসনায় গান গেয়ে উৎসবকে মধুময় করে তোলেন।

২৯ পৌষ ১৩০০ বা ১৮৯৪এর ১২ জানুআরি তারিখে কবির চতুর্থ সন্তান মীরা (তৃতীয়া কন্যা) জন্মগ্রহণ করেন।

এর কয়েকদিন মাত্র পূর্বে ২ জানুআরি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

জ্যোৎস্নারাত্রে ও প্রেমের অভিষেক কবিতা দুটি রচিত হয় ১৩০০ মাঘ মাসে, যথাক্রমে ৫-৬ মাঘ ও ১৪ মাঘ তারিখে। রচনাস্থল জোড়াসাঁকো।

ফাল্গুনের গোড়ার দিকে কবি পতিসর চলে আসেন। ৯ ফাল্গুন সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। নদীপথে এসে পৌঁছেছেন রাজশাহী, এখানে আছেন কবি-বন্ধু লোকেন পালিত। এখানে কবি ২৩ ফাল্গুন (১৩০০) তারিখে লেখেন এবার ফিরাও মোরে। সাধনার চৈত্র সংখ্যাতেই তা ছাপা হয়ে গেল। এই ফাল্গুন চৈত্র মাসের অধিকাংশই কবির কাটে উত্তরবঙ্গে। বেশিরভাগ পতিসরে, কয়েকটা দিন বন্ধুর কাছে রাজশাহীতে।

১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের মাঝামাঝির পর বা শেষের দিকে কবি কলকাতায় ফেরেন। এবার এখানে বসে কয়েকটি কবিতা লেখেন। ১৩০০র বর্ষশেষের দিন স্নেহস্মৃতি, ১৩০১ পয়লা বৈশাখ নববর্ষে, ৫ বৈশাখ দুটি কবিতা দুঃসময় ও মৃত্যুর পরে, ৬ জ্যৈষ্ঠ ব্যাঘাত।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র। ১৩০১এর বৈশাখ (২৮ এপ্রিল ১৮৯৪) চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কবি বিহারীলালের মৃত্যু ঘটল ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। সাধনার আষাঢ় সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়।

১৩০১ গ্রীষ্মকালের অধিকাংশ সময় কাটে কলকাতায়, মাঝে কয়েকদিনের জন্য যান কার্সিয়াং। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আহ্বানে কবি কার্সিয়াং যান।

আমাদের আলোচ্যপর্বে হ্যামারগ্রেন নামে এক সুইডিশ যুবকের মৃত্যু ঘটলে রবীন্দ্রনাথ সাধনার শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩০১) বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই সংখ্যাতেই অনধিকার প্রবেশ শিরোনামে তাঁর ছোট গল্পটির প্রকাশও তাৎপর্যপূর্ণ।

আষাঢ় মাসের গোড়ায় কবি উত্তরবঙ্গ যাত্রা করেন। ৭ আষাঢ় ১৩০১ (২০ জুন ১৮৯৪) কবি শিলাইদহে পৌছান। ২৭ জুন তারিখে কবি মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি লিখতে শুরু করেন। "আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।"[২০]

১৩০১ আষাঢ় মাসের শেষ দিকে কবি উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফেরেন। শিশু-কন্যা মীরা এখন ঠিক ছয় মাসের। কলকাতা থেকে কবি ১৯ জুলাই (১৮৯৪) তারিখে লিখছেন, "মীরার জন্যে আমার কোনো কাজ হবার জো নেই।· ·সে বিবিধ চঞ্চল ভঙ্গীতে তার বাহু দুটি বিক্ষেপ করে আমার গোঁফ দাড়ি চুল নাক কান চশমা ঘড়ির-চেন নিয়ে মহা উপদ্রব করতে থাকে, এবং ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে আমার সময় চলে যায়।"[২১]

শ্রাবণের সপ্তাহ তিন কাটিয়েই কবিকে আবার উত্তরবঙ্গে যাত্রা করতে হয়।

ভাদ্র ১৩০১ কবি রচনা করেন অন্তর্যামী কবিতা। এই সময় নবীনচন্দ্র সেনের আহ্বানে একদিনের জন্য রাণাঘাটে আসেন কবি। তারিখ ১৮ ভাদ্র ১৩০১, ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। তারপরে শিলাইদহ হয়ে আবার সাজাদপুর। সাজাদপুরের কুঠিতে এসে উঠলেন ২১ ভাদ্র। সেখান থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখে লিখছেন, "আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল।"[২২] এই নিবন্ধটি মেয়েলি ছড়া নামে সাধনায় ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

২০-২২. ছিন্নপত্রাবলী।

সাজাদপুর পতিসর বোয়ালিয়া ঘুরে কবি কলকাতায় ফিরলেন। ছড়া সম্বন্ধে চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ পাঠ করলেন ১৬ আশ্বিন ১৩০১ (অক্টোবর ১৮৯৪)। রবীন্দ্রনাথেব ছোটগল্পের তিনটি বই – বিচিত্র গল্প (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) এবং কথা-চতুষ্টয় – এই মাসেই প্রকাশিত হয়।

সাধনার তৃতীয় বর্ষে দেখি (১৩০০ অগ্রহায়ণ – ১৩০১ কার্তিক) প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা কম। মাত্র তিনটি।

১ কার্তিক (১৭ অক্টোবর) কবি কলকাতা থেকে বোলপুরে চলে আসেন। ৪ কার্তিক ১৩০১ (২০ অক্টোবর) শান্তিনিকেতনে বসে লিখলেন সাধনা শীর্ষক কবিতা। ২৫ অক্টোবর তারিখে সুবিচারের অধিকার শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করেন। কবিতা ও প্রবন্ধটি সাধনায় ১৩০১ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই মুদ্রিত হয়। অগ্রহায়ণে কবিকে আবার শিলাইদহে দেখা গেল। এই মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বনামে সাধনার সম্পাদক।

উত্তরবঙ্গ ও কলকাতায় যাওয়া আসা চলছেই। এরই সঙ্গে চলছে সাধনার কাজকর্ম সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে। ব্রাহ্মণ কবিতাটির রচনাকাল ৭ ফাল্গুন ১৩০১। সাধনার ফাল্গুনেই প্রকাশিত হয়। পুরাতন ভৃত্য কবিতার রচনাকাল ১২ ফাল্গুন ১৩০১। সাধনার চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত।

১৩০১এর ২৫ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় বাংলা জাতীয় সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি ১৩০২ বৈশাখ সংখ্যার সাধনায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধ পাঠেব পাঁচ দিন পূর্বে (২ এপ্রিল ১৮৯৪) কলকাতা থেকে এক পত্রে কবি লিখছেন, "আজও সমস্ত দিন সেই বক্তৃতাটা নিয়ে পড়েছিলুম।"[২৩]

চৈত্র (১৩০১) ও বৈশাখ (১৩০২) মাসটা কলকাতায় কাটলো। জ্যৈষ্ঠে কবিকে দেখা গেল পতিসরের পথে।

সাধনার জন্য ঠাকুর্দা গল্প লেখেন ২২ জ্যৈষ্ঠ এবং দুই বিঘা জমি শীর্ষক কবিতাটি লেখেন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২।

আষাঢ়ের গোড়ায় আবার কলকাতায় আগমন। পার্ক স্ট্রীটে পিতার সঙ্গে দেখা করে কবি বিষয়কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। জমিদারির চিঠি লেখা সাধনার প্রুফ দেখা – সকল কাজই চলছে। কলকাতা থেকে এই আষাঢ়েই

২৩ ছিন্নপত্রাবলী।

আবার সাজাদপুর চলে আসেন। ২৮ জুন ১৮৯৫ (১৫ আষাঢ় ১৩০২) তারিখে লিখছেন, "বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি।"[২৪] এ গল্প সম্ভবত অতিথি। সাধনার শেষ সংখ্যায় (ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩০২) প্রকাশিত হয়। ১৮ আষাঢ় তারিখে কবি শীতে ও বসন্তে শীর্ষক কবিতা লেখেন, মুদ্রিত হল সাধনার শ্রাবণে।

কবি শ্রাবণের গোড়ায় কলকাতায় আসেন। ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুস্মরণ দিবসে কলকাতার এমারেল্‌ড্‌ থিয়েটার গৃহে অধিবেশন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর চরিত শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধটি সাধনার শেষ সংখ্যা অর্থাৎ সম্মিলিত ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সাধনার শেষ বর্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা দশ। অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় তাঁর একটি করে গল্প প্রকাশিত হয়।

২৪. ছিন্নপত্রাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনা সম্পাদনকর্মে রবীন্দ্রমানস

সাধনা পত্রিকার কাল ১২৯৮ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২ কার্তিক। ছিন্নপত্রাবলীতে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ তারিখের চিঠিতে প্রথম সাধনার প্রসঙ্গ পাই। তারপর বহু চিঠিতে সাধনার কথা এসেছে। সাধনার শেষ সংখ্যাটিব কথাও ছিন্নপত্রাবলীতে আছে। এই চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে সাধনা সম্পর্কে কবির তৎকালীন মনের চিত্রটি অনেকটা ধরা পড়ে। এই চিঠিগুলি বোলপুব, কটক, সাজাদপুর, পতিসর, শিলাইদহ, কলকাতা, কুস্টিয়া থেকে লেখা। 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে[১] শচীন্দ্রনাথ অধিকারী লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ যখন পুরাদস্তুর জমিদার ও পল্লীবাসী, তখন যুগপৎ তিনি সাধনার সম্পাদক, ভারতীর লেখক, শান্তিনিকেতন আবাসিক বিদ্যালয়েব প্রতিষ্ঠাতা, মাসিক মাত্র ২৫০ টাকা মাসোহারাভোগী তিন চারটি সন্তানের স্বাধীনচেতা পিতা, পাটের ব্যবসায়ে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ঋণী···। আবার উনপঞ্চাশ পবনের মত শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, শিলাইদহ, কালীগ্রাম, সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রভৃতি জমিদারিতে অবিরত গমনাগমন করেছেন। তারই মধ্যে চলেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যসৃষ্টি।"

মনে হয় সাধনার প্রতি কবির আকর্ষণ আকুলতা ও উৎসাহ সর্বাধিক ঘটেছিল সাধনার দ্বিতীয় বর্ষকালে। এমন কি এ-কথাও হয়তো বলা যেতে পারে যে শেষ বর্ষে সাধনা যখন তাঁর স্বনামে ছাপা হচ্ছিল তখন ক্রমেই যেন কবির মন পত্রিকার আকর্ষণ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। সম্পাদনাব কাজে নানা কারণে কবিচিত্তে ক্লান্তি ও অবসাদ নেমে আসে। সাধনার প্রথম সংখ্যা (১২৯৮ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হলে কবি বলেছিলেন "আমার ত সবসুদ্ধ মন্দ লাগল না।"[২] এই সাধনা সম্পর্কেই দ্বিতীয় বর্ষে, ১২৯৯ ফাল্গুনে কবির (২৫ ফেব্রুআরি ১৮৯৩) দৃপ্ত ঘোষণা, "আমি নিশ্চয় জানি আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে।"[৩] ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই পত্রে

১. জিজ্ঞাসা প্রকাশিত।

২. শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯।

৩. ছিন্নপত্রাবলী।

সাধনার প্রতি কবির গভীর আকর্ষণ ও অনুরাগ উপলব্ধি করা যায়। কবির নিকট তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক বোধ হয় না, মনে হয় তাঁর নিজের কাজের পক্ষে তিনি নিজেই যথেষ্ট।

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষকালেই কবি বলেছেন (৩০ আষাঢ় ১৩০০, জুলাই ১৮৯৩) মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, তাঁর দশাও যেন সেইরকম হয়েছে। মিউজদের মধ্যে কোনোটিকেই নিরাশ করা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। সাধনার জন্য ছোটগল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ডায়রি-রসরচনা-সাময়িক সারসংগ্রহ-বৈজ্ঞানিক সংবাদ-সাহিত্যসমালোচনা সবই তাঁকে লিখতে হচ্ছে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে। বোঝা যায় এত লেখালেখির চাপের মধ্যেও কবি ক্লান্তিহীন—বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম কবিকে সাধনার কাজে নিয়োজিত করে রেখেছে—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তাঁর নিকট আজ এক-একটি প্রণয়িণীর মত। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ সর্বক্ষেত্রেই সমান আকর্ষণ।

এক বৎসর পরের কথা। ২৭ জুন ১৮৯৪। তখন সাধনার তৃতীয় বর্ষ চলছে, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৩০১) বেরিয়ে গেছে। ইন্দিরা দেবীকে কবি লিখেছেন, সাধনার জন্য উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ হলেও তিনি যেন তাতে আর তেমন সুখ পাচ্ছেন না, আর নাকি পেরেও উঠছেন না। বরং গল্প লেখাতেই তাঁর এখন বেশি তৃপ্তি। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিন-রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে" ইত্যাদি।[৪] এইখানে প্রথম দেখা গেল সাধনার সব রকম লেখার জন্য কবির মন আর ঠিক তেমনভাবে আকর্ষণবোধ করছে না। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধ সাধনায় বেরিয়েছিল ১২৯৯ পৌষে। পরে সে-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের মন্তব্য বেরলো ১২৯৯ চৈত্রে। রবীন্দ্রনাথ ৩০ আষাঢ় ১৩০০ লিখলেন—যখন শিক্ষার হেরফের নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। গল্পরচনার মত এ-কাজেও তাঁর সমান আগ্রহ ও আকর্ষণ। কারও প্রতি প্রণয়ে কৃপণতা নেই। কিন্তু ২৭ জুনের চিঠিতে স্পষ্ট বললেন—সাধনার জন্যে প্রবন্ধ রচনা অপেক্ষা গল্প লেখায় সুখ বেশি।

৪. ছিন্নপত্রাবলী।

যে রচনায় সুখ নেই, পত্রিকার তাগিদে সে রচনাও তাঁকে লিখতে হয়েছে। পত্রিকার জন্য যখনই যা লিখেছেন, সুখ না থাকলেও এতটুকু অবহেলা করেন নি, "যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে"[৫] লিখেছেন।

শিলাইদহ থেকে ২৭ জুনের (১৮৯৪) চিঠিতে যা বলেছেন, বোলপুর থেকে ২৫ অক্টোবরেব চিঠিতে তা-ই বললেন। চারিদিকে ঘন বর্ষা নেমেছে। কবি বলছেন, "এমন দিনে কি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে!"[৬] ইচ্ছা যে করে না তা চিঠি পাঠ করলেই বোঝা যায়। ভোরে উঠে পদরত্নাবলীর পাতা ওলটান—মন সুদূরে চলে যায়; কিন্তু সাধনা যে এদিকে তাঁর দিকে রিক্ত হস্তে তাকিয়ে রয়েছে। সুতরাং পোলিটিকাল প্রবন্ধটা যেমন করেই হোক শেষ করতেই হয়। লেখা পেলেই যে পত্রিকা প্রেসে যাবে।

১৪ জানুআরি ১৮৯৫ তারিখের চিঠিতে লিখছেন, "এত দিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল—মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব। এখন একটু গরম হাওয়া পড়বা মাত্রই মনে হচ্ছে এডিটরি করাব চেয়ে আমি সেই-যে কবি ছিলুম সে ছিলুম ভাল"[৭] এ-চিঠি কবি যখন লেখেন তখন তাঁর নামে সাধনার সবেমাত্র দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে।—১৩০১ অগ্রহায়ণ ও পৌষ, অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষের প্রথম দুটি সংখ্যা। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামাঙ্কিত সাধনাকে কখনো পৃথক করে দেখেন নি। ওই যে বলেছেন 'মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব'—তা কেবল সাধনার দুটি মাত্র সংখ্যা সম্পাদনা করে নিশ্চয় বলেননি। বরংচ বলা চলে তিন বৎসর দু মাস সম্পাদনার পরেই একজন সম্পাদকের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব।

পূর্ব পত্রের ঠিক তিন সপ্তাহ পরে (৪ ফেব্রুআরি ১৮৯৫) একটি চিঠিতে কবি লিখলেন, "বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর-কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তাহলে ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়।"[৮] এই চিঠি যখন তিনি লেখেন তখন সবেমাত্র সাধনার চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (১৩০১ মাঘ) বেরিয়েছে। অর্থাৎ কবির নামাঙ্কিত সাধনার তিনটি সংখ্যা ছাপা হয়েছে। কিন্তু কবির মনের মধ্যে যে একটা ক্লান্তির আভাস দেখা যাচ্ছে তা তিন বছর তিন মাস একটানা সাধনা পত্রিকা পরিচালনার ভিত্তিতেই।

৫-৮. ছিন্নপত্রাবলী।

ইতিপূর্বে সাধনায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনা কম করেননি; কিন্তু এখন ক্রমেই "পরিপূর্ণ আলস্যরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে" উঠছে।[৯] সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' লিখতে আর ইচ্ছা করে না। বাইরে ফাল্গুনের প্রশান্ত মধ্যাহ্ন। সাধনার সমালোচনা অপেক্ষা প্রকৃতির নিস্তব্ধ সুন্দর রূপ কবিকে বেশি আকর্ষণ করে। কিন্তু 'অদৃষ্টের পরিহাস বশত' কবিকে সাধনার জন্য সমালোচনা লিখতে হয়। তাঁর ভাষায়, "নিতান্ত বাজে কাজ—এ রকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়।...সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।" (১৮ ফেব্রুআরি ১৮৯৫)[১০]

পাঁচ দিন পরে যে চিঠি লিখলেন তাতেও শুনি পূর্বপত্রেরই প্রতিধ্বনি। স্পষ্টতই কবি বলেন, "এখন সাধনার জন্যে লিখতে লিখতে কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে যাই, বাইরে যা-কিছু ঘটে তাতেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়। সাধনার পাঠকদের জন্যে যখন আমি উচ্চ অঙ্গের খোরাক সংগ্রহে নিযুক্ত তখন নদীর ধারে তৃণগুল্মরাশির উপরে গোরু মোষ চরার সামান্য দৃশ্য আমাব সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।"[১১]

এই সকল চিঠিপত্র পাঠ করলেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত ক্রমেই সাধনার দপ্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধীরে ধীরে মন ছুটি চাইছে—বাইরের প্রকৃতি তাঁকে গভীরভাবে আহ্বান করে।

শুধু যে সাধনার সম্পাদনাতেই সারাদিন কাটে তা তো নয়, সেই সঙ্গে আরও কাজ আছে। "চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফ্‌শিট্‌-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে।" (১৫ মার্চ ১৮৯৫)।[১২] এত কাজ রয়েছে, "তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপমাত্র নেই—বোধ হয় অনুতাপ করবার মত উদ্যম শরীরমনে ছিল না।"[১৩]

একদিকে সাধনার লেখক ও সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি যেমন বাড়ছে অন্যদিকে তেমনি "সব ছেড়েছুড়ে লোকের ভিড় ঠেলেঠুলে নিজের যথার্থ প্রাইভেট বাসস্থানের নিভৃত কোণে ঢোকবার প্রবল ইচ্ছা বোধ হচ্ছে।"

৯-১৩. ছিন্নপত্রাবলী।

কবি বলছেন, "সাধনায় প্রতিমাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে।" (৩ আগষ্ট ১৮৯৫)[১৪]

এই ক্লান্তি বিরক্তি আলস্য ক্রমেই কবিকে সাধনার কর্মস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে আনে। সাধনার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে (৬ অক্টোবর ১৮৯৫) কবি বললেন, "এখন প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনা, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক, এই পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব।"[১৫]

১৪-১৫. ছিন্নপত্রাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিন্নপত্রাবলীতে সাধনা প্রসঙ্গ

সাধনা পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী রচিত। এই পত্রগুলির মধ্যে সাধনা পত্রিকার উল্লেখ বিশেষভাবে আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রবীন্দ্র-মানস আলোচনা প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রাবলী থেকে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে সাধনা-সমকালীন ছিন্নপত্রাবলীতে সাধনা প্রসঙ্গ কালানুক্রমিকভাবে সংকলিত এবং তৎসহ প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য সংযোজিত হল।

ক. আমার সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত।

—৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

খ. একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল।

—১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

গ দেখিস আমার লেখা আজ হু হু করে এগিয়ে যাবে—চৈত্র মাসের[১] সাধনার জন্যে যে ডায়ারিটা[২] লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এবং যা ভাঙা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মতো কিছুতে এগোতে পারছিল না, আজ সেটা নিশ্চয় শেষ করে ফেলব। যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয় আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে

১. সাধনা ১২৯৯ চৈত্র।

২. পঞ্চভূতের ডায়ারি : নরনারী।

গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে. গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব—নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না—এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

—২৫ ফেব্রুআরি ১৮৯৩

ঘ. পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না—এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের শ্রান্তি আর যায় না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্ ফাঁস্ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়—তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ—আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।

—২ মে .৮০৩

ঙ. সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান।

—৮ মে ১৮৯৩

চ. আসলে আমরা খাব, পরব, বেঁচে থাকব, এই রকম কথা ছিল—আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছেপূর্বক খুব শক্ত একটা ছন্দ বানিয়ে তারই মধ্যে খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা চাই, আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে সাধনা বের করি, এর কী আবশ্যক ছিল—ও দিকে নারায়ণ সিং দেখো ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে

তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পূর্বক দু-এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুর বেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে লো [কেনে] র সামান্য দু-চারটে কাজ করে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে ; জীবনটা যে ব্যর্থ হল, বিফল হল, এমন কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় না – পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনও দায়িক করে না।

–২১ জুন '৮৯৩

ছ. আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে – এদিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি, ওদিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া[৩] আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল সাধনা[৪] রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈ তো নয় – এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে – লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয় – আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি[৫] প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন তো কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়। আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন – মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী

৩. সাধনার 'সম্পাদক' অর্থে অবশ্যই সুধীন্দ্রনাথ তবে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "সাধনার যুগে শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর [বলেন্দ্রনাথ] ফরমাস আসত গল্প চাই।" – প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৪।

৪ ১৩০০ব আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম-সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়।

৫. যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, পঞ্চভূতের ডায়ারি সাধনায় প্রকাশিত।

যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে।…যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না।…আবার যখন 'বাল্যবিবাহ'[৬] কিংবা 'শিক্ষার হেরফের'[৭] নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ।

—৩০ আষাঢ় ১৩০০

জ. শ্রাবণ মাসের[৮] ডায়ারিটা[৯] তুই ভালো বুঝতে পারিস নি? বোঝাতে গেলে একখানা গ্রন্থবিশেষ লিখতে হয়।

—২৬ শ্রাবণ ? ১৩০০

ঝ সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি তাতে আমি তেমন সুখ পাচ্ছিনে এবং পেরেও উঠছি নে। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী[১০] উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি, এবং সে পাঁচটি লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু-বিন্দু বারিশীকর-বর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের আগমন হল—তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে।

—২৭ জুন ১৮৯৪

৬. সাধনার ১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় সাময়িক সার সংগ্রহ বিভাগে 'বাল্যবিবাহ' শিরোনামে একটি রচনা মুদ্রিত হয়। তবে সেটির লেখক হিসাবে নাম আছে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন কয়েক বৎসর পূর্বে 'হিন্দুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে, ভারতী ১২৯৪ আশ্বিনে।

৭. সাধনা ১২৯৯ পৌষ। তৎসহ দ্রষ্টব্য সাধনা ১২৯৯ চৈত্র।

৮. সাধনা ১৩০০ শ্রাবণ।

৯. পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি।

১০. দ্রষ্টব্য, মেঘ ও রৌদ্র গল্প। সাধনা ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক।

ঞ একটি উন্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত এবং তাঁহার সম্মুখভাগে অপর বেত্রাসনে তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত··· সাধনার জন্যে গল্পরচনায় একাগ্রমনে প্রবৃত্ত।

—৪ আগষ্ট ১৮৯৪

ট. যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যা কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি—আমার সরস্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে।

— ১৩ আগষ্ট ১০৯৪

ঠ আজ সকালে বসে 'ছড়া'[১১] সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন-কানুন নেই—মেঘ-রাজ্যের মতো।

— ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

ড. কাল 'ব ব' সঙ্গে 'মেয়েলি ছড়া'[১২] প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি।

— ১৭ অক্টোবর ১৮৯৪

ঢ. এমন দিনে কি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে!···আজ একটি অর্ধ সমাপ্ত পোলিটিকাল প্রবন্ধ[১৩] শেষ করতে হবে।···সাধনা ছাপাখানায় দেবার সময় হয়ে এসেছে, এবং পোলিটিকাল প্রবন্ধটা আজ যেমন করেই হোক শেষ করতেই হবে।

—২৫ অক্টোবর ১৮৯৪

ণ. এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল—মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব। এখন একটু গরম হাওয়া পড়বা মাত্রই

১১-১২ মেয়েলি ছড়া, সাধনা ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক। লোকসাহিত্য গ্রন্থে ছেলেভুলানো ছড়া নামে মুদ্রিত (১৩১৪)।

১৩. সুবিচারের অধিকার, সাধনা ১৩০১ অগ্রহায়ণ।

মনে হচ্ছে, এডিটরি করার চেয়ে আমি সেই-যে কবি ছিলুম সে ছিলুম ভাল। ইচ্ছে করছে একটা খোলা জানালার কাছে পড়ে পড়ে একটা শ্লেট হাতে করে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গুন্ গুন্ করে করে কবিতা লিখে যাই—চোখের সামনে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে খানিকটা সবুজ ডালপালা দেখা যায় এবং বাতাসটি এসে সর্বাঙ্গে লাগতে থাকে। কবিতা যদি বা না লিখি গান তৈরি করা একটা কাজ আছে, সেটাও এরকম অবস্থায় বেশ লাগে ভালো। গানের সুরের দ্বারা জগতের সমস্ত চেহারা একেবারে বদলে যায় এবং মাথার ভিতরে একটা অপরূপ নেশা জমে ওঠে। কিন্তু সেরকম নেশাতুর ব্যাকুল এবং আত্মবিস্মৃত পাগলের মতো তৃষার্ত উন্মনা আনন্দচঞ্চল হয়ে থাকার চেয়ে গম্ভীর শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটরি করাই আমার পক্ষে ভালো।

—১৪ জানুআরি ১৮৯৫

ত. বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর-কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলে ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়—কারণ, সম্বৎসর sanity বজায় রেখে চলাও আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড়ো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, দু মাস অন্তর তার ঋতু-পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বারো মাস সমভাবে ভদ্রতা রক্ষা করে চলি কী করে!

—৪ ফেব্রুআরি ১৮৯৫

থ. আজকের দিনটি এমনি নিস্তব্ধ এবং সুন্দর যে, পরিপূর্ণ আনন্দরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু সাধনার জন্যে[১৪] 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'[১৫] এখনো বাকি আছে। দুখানা অপাঠ্য বই[১৬] পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ—এ রকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসবশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে বসে, সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে।

১৪. সাধনা ১৩০১ ফাল্গুন।

১৫. 'গ্রন্থ সমালোচনা' বিভাগ।

১৬. ক দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব—যোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক প্রকাশিত। খ মনোরমা—কুমারকৃষ্ণ মিত্র। এই পুস্তক দুটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা বর্তমান গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে সংগৃহীত।

সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।...এইমাত্র আমার বোটের পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল। তার একজন মুসলমান দাঁড়ি বুকের উপর এক বই নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে একটি কাব্য পাঠ করছে। ও লোকটারও বেশ রসবোধ আছে—ওকে বোধহয় ধরে পিটলেও দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে বলতে পারে না।

—১৮ ফেব্রুআরি ১৮৯৫

দ. এখন সাধনার জন্যে[১৭] লিখতে লিখতে কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে যাই, বাইরের যা-কিছু ঘটে তাতেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়—নৌকো চলে যায় মুখ তুলে দেখি—খেয়া পারাপার করে তাই দেখেও অনেকটা সময় চলে যায়—ডাঙায় আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পুরে দিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বেস ফেলে কচ্ কচ্ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে লেজের ঝাপটায় পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলতে থাকে, তার পরে একটা অতি ক্ষুদ্র শীর্ণ দুর্বল উলঙ্গ-প্রায় ছেলে এসে এই প্রশান্তপ্রকৃতি বৃহৎ জন্তুটার পিঠে একটা ছোটো লাঠির গুঁতো মেরে হঠ্ হঠ্ শব্দ করতে থাকে।...কী কথা বলতে কী কথা উঠল দেখ্। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে, সাধনার পাঠকদের জন্যে যখন আমি উচ্চ অঙ্গের খোরাক-সংগ্রহে নিযুক্ত তখন নদীর ধারে তৃণগুল্মরাশির উপরে গোরু মোষ চরার সামান্য দৃশ্য আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।

—২৩ ফেব্রুআরি ১৮৯৫

ধ. কাল বিকেলে সাধনার জন্যে একটা গল্প লেখা শেষ করে আজ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি।

—১৬ ফাল্গুন ১৩০১

ন. আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি। তার আরম্ভই হচ্ছে—

পরের পায়ে ধরে প্রাণ দান করা
সকল দানের সার!

তারপরে অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আমাকে সে কখনো দেখে নি, কিন্তু

১৭. ১৮ ফেব্রুআরি তারিখের পত্রে যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার কথা কবি বলেছিলেন সেটি সাধনার ১৩০১ ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এখানেও ১৩০১ ফাল্গুন—এই রকম সময় ধরা যেতে পারে।

আজকাল আমার 'সাধনা'র মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়। তাই লিখেছে— 'তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক তবুও তার জন্যেও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

প. আমি কৌতুকহাস্যের কথা[18] সাধনায়[19] লিখেছি।

—১০ মার্চ ১৮৯৫

ফ. আজ সকালবেলাটা যে কী করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি নে। কোনো কাজই করিনি, বোধহয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাত ওল্টাচ্ছিলুম— মনে জানি যে, চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফশিট্-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে, কিন্তু তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপমাত্র নেই— বোধহয় অনুতাপ করবার মতো উদ্যম শরীর মনে ছিল না। কিন্তু এই বসন্ত-প্রভাতের বাতাসে আমাকে বড়ো মাটি করে দেয়। কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্বশরীরে লাগানোই একটা যথেষ্ট কর্তব্য কাজ বলে মনে হয়— মনে হয়, এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক-একটা সকালবেলা এক-একটা দৈববাণীর মতো আমার কাছে এসে উপনীত হয়েছিল— একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কী! কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটরি[20] করা নয়, এই-সমস্ত আত্মবিস্মৃত অচেতন ক্ষণগুলিও জীবনের সার্থকতার একটা প্রধান অঙ্গ।

—১৫ মার্চ ১৮৯৫

১৮. কৌতুকহাস্য: পাঞ্চভৌতিক সভা।

১৯. ১৩০১ পৌষ।

২০. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত বিশ্বভারতী পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩৫২ কার্তিক-পৌষ) প্রকাশিত এই অংশের টীকায় বলা হয়েছে—

ব. মাঘ মাসের সাধনার[21] সেই গল্পটা[22] সাধারণত অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল—সেই কারণে সাহিত্যের সমালোচনা[23] পড়ে অনেকে চটে গেছে। অন্যের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সম্বন্ধে কিছু বোঝবার যো নেই—বুঝলেও সে অনুসারে নিজের ক্ষমতাকে গড়ে তোলা যায় না। সেই জন্যে বাইরের লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়। নিজের ভিতরে যে-একটা আদর্শ আছে সেইটেই মানুষের ধ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে, সাহিত্যচর্চা করে, সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচনা হয় তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো লাগিল' বা 'ভালো লাগিল না' সে

"১৩০১ অগ্রহায়ণ—১৩০২ কার্তিক, সাধনা, চতুর্থ বর্ষ। বস্তুত, প্রথম তিন বৎসরও রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র সম্পাদক আখ্যা গ্রহণ না করিলেও সম্পাদকীয় কর্তব্যভার বহুল-পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

২১. ১৩০১ মাঘ।

২২. নিশীথে।

২৩. 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', সাহিত্য ১৩০১ ফাল্গুন—

"সাধনা। মাঘ। 'নিশীথে' একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আখ্যান কৌশল অকিঞ্চিৎকর; কেবল ভাষার সৌন্দর্যে ও বর্ণনীয় ঐশ্বর্যে গল্পটির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এমন ভাষা, এমন অলংকার নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু অর্ধেক রাত্রে ডাক্তারের বাড়ির দরজায় ঘা দিতে দিতে 'ডাক্তার। ডাক্তার!' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে এই গল্পের সূত্রপাত করিলেন। ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গাইয়া অত রাত্রে কেন যে তিনি নিজের কাহিনী কহিতে বসিলেন তাহার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দক্ষিণাবাবু রাত্রি আড়াইটার পর যে ভাষায়, যেরূপ অলংকার দিয়া সাজাইয়া নিজের গল্প বলিতেছিলেন তাহাও স্বাভাবিক নহে। একজন লোক পূর্বকাহিনী বলিতে বলিতে, সুকবির কবিতার ভাষায় বহু পূর্ব দৃষ্ট প্রকৃতির প্রত্যেক ছবি, সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া, শুভ্র নির্মল চন্দ্রালোক হইতে অন্ধকার, শব্দ, সৌরভ, নিঃশ্বাস পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিতেছেন, ইহা ঠিক স্বভাব-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণাবাবু একজন সেন্টিমেণ্টাল কবি হইলে বরং কতকটা মানাইয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাকে যাত্রাদলের একজন স্মরণশক্তিশালী অভিনেতা বলিয়া বোধ হয়। লেখক তাঁহাকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, সাধনা পাঠকের গল্পপিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি রাত্রি আড়াইটার সময় তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন মাত্র। লেখকের গল্পকৌশলের অভাবে এবং স্বভাবসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না থাকায় গল্পটির মুণ্ডপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বর্ণনাভঙ্গী ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়। আর এতখানি ভাষার ব্যয় কিসের জন্য? মানবজীবন রহস্যের কোন অংশের ছবি আঁকিবার জন্য লেখকের এত প্রয়াস তাহাও ত স্পষ্ট বোধগম্য হইল না।"

কথা শুনে কোনো ফল নেই। তাতে কেবল লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল, কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্যব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কোনো লোকের মত মাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই—তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তারা সৃজনকার্যের মাঝখানে বাস করছে না। তারা যথার্থ অভিজ্ঞতা-দ্বারা জানে না কোন্‌টা সহজ কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা অনিত্য কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা সেন্টিমেণ্ট এবং কোন্‌টা সেন্টিমেণ্টা-লিজ্‌ম্। আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তার পরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি ভালো সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব। আমি দেখছি, যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে—প্রশংসা এবং নিন্দা তেমন গভীরভাবে আঘাত করে না—বোধহয় দুটোই অনেকটা পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের বিচারের উপর নিজের বিশ্বাসও ক্রমে বোধহয় দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

—১৮ মার্চ ১৮৯৫

ভ. তারপরে সকলকে বিদায় করে দিয়ে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখতে বসেছিলুম—মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এল।[২৪] তাই দৃঢ় সংকল্প করে খুব নিবিড়ভাবে মনঃসংযোগপূর্বক এইমাত্র লেখা[২৫] শেষ করে ফেললুম।

—৬ জুন ১৮৯৫

ম. বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি,[২৬] একটু আষাঢ়ে গোছের

২৪. ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিক।

২৫. আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক (১৩০২)—এই তিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প বেরোয়। আষাঢ়ে প্রতিহিংসা, শ্রাবণে ক্ষুধিত পাষাণ এবং ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিকে অতিথি প্রকাশিত হয়। এই তিনটির মধ্যে কোন্ গল্পটি রবীন্দ্রনাথ এই দিন লেখেন? ৬ জুনের অর্থ জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয়ার্ধ। 'মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এল' বলতে জ্যৈষ্ঠ মাসের কথাই কবি বলেছেন। আষাঢ় মাসের সাধনায় যে গল্পটি প্রকাশিত হয়, মনে হয় সেটিই এদিন লিখে শেষ করেন।

২৬. অতিথি, সাধনা ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক।

গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি—একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে—আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সবুজ এবং সোনালি এবং নীল সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত! তা হলে সবাই তার মর্মের সত্যটুকু কেমন অতি সহজেই বুঝতে পারত। তা হলে কেউ তাকে সমালোচনা[২৭] করতে সাহস করত না।

—২৮ জুন ১৮৯৫

য. এবারে আমার পাঞ্চভৌতিকে[২৮] নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য নূতন ভাব আছে, সেটা আমি দেখলুম কোনো পাঠকেই ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি।...কিন্তু আমি বারম্বার দেখেছি পাঞ্চভৌতিকে আমি যে-সকল চিন্তার অবতারণ করি তার ঠিক মর্মটি প্রায় কেউ গ্রহণ করে না। আসলে বোধহয় আমি ভালো করে বোঝাতে পারি নে—বোঝানোও বিষম শক্ত।

—২০ জুলাই ১৮৯৫

র. সাধনায় প্রতি মাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি খ্যাতি জিনিসটা ভালো নয়—ওতে অন্তরাত্মার কিছুমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

—৩ আগস্ট ১৮৯৫

২৭. খুব সম্ভব সাহিত্য পত্রিকার সমালোচনা লক্ষ্য করে কথাটি বলেছেন।

২৮. অপূর্ব রামায়ণ : পাঞ্চভৌতিক সভা, সাধনা ১৩০২ আষাঢ়।

ল. আমার সাধনার লেখার কাজে এখনও হাত দিইনি।

—২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

শ. তুই 'আমরা ও তোমরা' লেখকের[২৯] উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলুম। লোকটা কিন্তু 'খুব মজা করেছি' মনে করে বসে আছে।

—৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

ষ. এখন প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনা, ত্রৈমাসিক[৩০] এবং মাসিক, এই পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব।

—৬ অক্টোবর ১৮৯৫

২৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আমরা ও তোমরা, সাধনা ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক।

৩০. সাধনা ত্রৈমাসিক, ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক একত্রে। এটিই সাধনার শেষ সংখ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়

"সাধনার সাইজ ও কাগজ কমানো সম্বন্ধে অনেক হিতৈষী বন্ধু আপত্তি করাতে অবশেষে তাঁহাদের অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার হইয়াছি।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধনা পত্রিকা : বহিরঙ্গ পরিচয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাধনা প্রকাশের তিন মাস পূর্বে সাধনার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। তত্ত্ববোধিনীতে ১২৯৮ আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় সাধনার বিজ্ঞাপন বেরোয়। তিন সংখ্যাতেই এক বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ :

সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে প্রকাশিত।

আকার ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৮০ পৃষ্ঠা।

প্রথম সংখ্যায় যে সকল প্রবন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা নিম্নে উল্লিখিত হইল।

শকুন্তলা (কবিতা)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রাইচরণ (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ঋতুসংহার (সমালোচনা)	শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আধুনিক বিজ্ঞান—	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
স্বরলিপি (মায়ার খেলা—গীতিনাট্য)	
স্বপ্নপ্রয়াণ (চিত্র)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সাময়িক সংবাদ—	
সোরাব ও রস্তম (গল্প)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জানালার ধারে—	শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া	
প্রবন্ধ বা কবিতা	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরকন্না —

বাগান —

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা —

বিবিধ —

বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

কলিকাতা ও মফস্বলে সর্বত্রই ডাকমাশুল (ওজন ১০ তোলার অধিক হওয়ায়) বার্ষিক ৸০ বারো আনা এবং প্রতি খণ্ডের ৴০ এক আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য এবং মাশুল ব্যতীত কাহাকেও কাগজ পাঠান হইবে না।

দশ জন গ্রাহক করিয়া দিতে পারিলে কেবল মাত্র ডাকমাশুল লইয়া এক বৎসর কাগজ দেওয়া যাইবে।

যাঁহাবা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাম ধাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীনীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন অনুযায়ী সাধনা প্রকাশিত হল ১২৯৮এর ১৫ অগ্রহায়ণ।

সাধনার মলাটের বাম দিকের মাথায় নিরলঙ্কৃতভাবে লাইন ব্লকে ছাপা পত্রিকার নাম এবং মলাটের নীচের ডানদিকে ছাপার গ্রেট হরফে সম্পাদকের নাম এবং তার নীচে ডানদিক ঘেঁষে সম্পাদিত শব্দটি পাইকায় মুদ্রিত। কভারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সূচীপত্র। কভারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সাধনার নিয়মাবলী এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'ভাগ', 'বর্ষ', 'সংখ্যা', 'মাস', 'বৎসর', এবং শেষে মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম ও প্রকাশকাল মুদ্রিত। সাধনা পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য এবং তার কভার অতীব দুর্লভ। নিম্নে সাধনার ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠাটিতে যা লেখা আছে উদ্ধৃত করি :

২য় ভাগ। প্রথম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১২৯৯। | কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। | শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। | ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

১২৯৯ জ্যৈষ্ঠের পত্রিকা থেকে সাধনার 'নিয়মাবলী' উদ্ধৃত হল :

নি য় মা ব লী।

১। কলিকাতা ও মফস্বলে সর্বত্রই সাধনার বার্ষিক মূল্য দুই টাকা এবং ডাকমাশুল বারো আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম মূল্য

এবং মাশুল না পাইলে 'সাধনা' পাঠান হয় না। যাঁহারা কার্যালয় হইতে পত্রিকা লইয়া যাইবেন তাঁহাদের মাশুল লাগিবে না।

২। প্রতি মাসের ১৫ই তারিখে 'সাধনা' বাহির হইবে। যথাসময়ে কাগজ না পাইলে গ্রাহকগণ মাসের ৩০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন। কাগজের মোড়কে যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক-নম্বর।

৪। টাকা-কড়ি ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৫। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৬। সাধনায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ প্রতি পৃষ্ঠা বার্ষিক ত্রিশ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, শ্রীনীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধনার আকার ক্রাউন ১৬ পেজি। পত্রিকা স্মল পাইকায় ছাপা। পত্রিকার প্রথম তিন সংখ্যায় (১২৯৮ অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ) ম্যাটার মুদ্রিত হয়েছিল ১৩½ এম্ × ৮½ এম্ পরিসীমায়। এই সীমার বাইরে পৃষ্ঠার শিরোদেশে ছিল — বাম দিকের পৃষ্ঠায় পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ও পত্রিকার নাম এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় রচনার নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা। প্রথম তিন সংখ্যায় প্রতি পৃষ্ঠায় ২৪ ছত্র মুদ্রিত। চতুর্থ সংখ্যা অর্থাৎ ১২৯৮ ফাল্গুন সংখ্যা থেকে ম্যাটার অংশ মুদ্রিত হয়েছে ১৪ এম্ × ৮½ এম্ পরিসীমায়। তখন থেকে সাধনার প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ২৪ এর স্থলে ২৫।

পত্রিকার মধ্যে পৃষ্ঠার শিরোদেশে কোনো মাস কাল বা সংখ্যার উল্লেখ নেই। কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠা ব্যতীত পত্রিকার অন্য কোনো অংশে মাস কালের উল্লেখ নেই। ফলে একালে পুরাতন সাধনা পত্রিকার বাঁধানো ফাইল ব্যবহার করা বিশেষ অসুবিধাজনক। সাধনার প্রতি বর্ষ দুটি 'ভাগে' বিভক্ত—প্রথম ভাগ অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখ এবং দ্বিতীয় ভাগ জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক। বৈশাখে প্রথম ভাগের এবং কার্তিকে দ্বিতীয় ভাগের রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র বেরত।

নিয়মাবলীতেই দেখা গেছে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যবস্থা ছিল। ১২৯৮ মাঘ সংখ্যায় আমরা দুটি বিজ্ঞাপন পেয়েছি। প্রতি সংখ্যায় কি কি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে আজ আর জানবার সুযোগ নেই। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন ও অন্যত্র বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সাধনার যে ফাইল আছে তাতে পত্রিকার কভার এবং বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি দুর্লভ; বাঁধাবার সময়েই ফেলে দেওয়া হয়েছে—সংগ্রহ করা হয় নি। তাছাড়া পত্রিকার পাতাগুলিও এখন দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে।

১২৯৮ মাঘে পত্রিকার রচনা শেষ হবার পর কিঞ্চিৎ পাত্‌লা কাগজে দুটি বিজ্ঞাপন আছে। প্রথমে আছে 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্' কোম্পানির হারমোনিয়ম ও 'আর্গিন যন্ত্র'র পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন। এর উল্টো পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বইয়ের বিজ্ঞাপন। সেটি নীচে উদ্ধৃত করি :

বি জ্ঞা প ন।

শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

রাজা ও রাণী	(নাটক)	এক টাকা
বিসর্জন	(নাটক)	এক টাকা
রাজর্ষি	(উপন্যাস)	পাঁচ সিকা
মানসী	(কবিতা)	দুই টাকা
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	(ভূমিকা)	আট আনা

উক্ত গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত গ্রন্থ কলেজ স্ট্রীট পীপ্‌ল্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

কড়ি ও কোমল	(কবিতা)	এক টাকা
সমালোচনা		এক টাকা

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা	দুই আনা
সোনার কাটি ও রূপার কাটি	দুই আনা
সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা	দুই আনা

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সরোজিনী নাটক (পঞ্চম সংস্করণ) এক টাকা

সাধনার কেবল প্রকাশন পারিপাট্য সম্বন্ধে তৎকালীন সমালোচকদের কিছু কিছু মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

নব্যভারত ১২৯৮ ফাল্গুন সংখ্যায় সাধনার সমালোচনায় লিখেছে, "তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তিন সংখ্যাই পাইয়াছি। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা, এরূপ পরিপাটি পত্রিকা এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই।"

সাহিত্য ১২৯৮ পৌষ সংখ্যায় সাধনা সম্পর্কে যে বৃহৎ সমালোচনা প্রকাশ করে তার প্রথম কয়েক ছত্র : "আমরা সাদরে 'সাধনা'র আবাহন করিতেছি। পত্রিকার আকার প্রকার অতি সুন্দর ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ভাব বলা যাইতে পারে।"

১২৯৮ চৈত্র সংখ্যায় অনুসন্ধান পত্রিকার মন্তব্য, "প্রথম হইতে দু-চারি দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উল্টাইয়াও বুঝিতে পারিলাম না যে, এখানা কি? ও হো, হঠাৎ মনে পড়িল, বিজ্ঞাপনে যে দেখিয়াছিলাম,—'সাধনা'—মাসিক পত্র। ভাল! ভাল! বা! বেশ কাগজখানি তো!—এক এক সংখ্যা যেন এক একখানি পুস্তক! কি সুন্দর ছাপা!—কি পুরু পুরু পরিষ্কার কাগজ!"

নব্যভারত ১২৯৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখেছে, "সাধনা খুব বড় ঘরের কাগজ, রূপ দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়।—এরূপ উৎকৃষ্ট বেশভূষায় কোনো গরীবের কাগজ এদেশের বাজারে বাহির হয় নাই।"

সাহিত্য পত্রিকায় ১২৯৯ পৌষ সংখ্যায় সাধনার দ্বিতীয় বর্ষের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

সা ধ না।

নানাবিষয়িণী মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত।

আকার ক্রাউন ১৬ পেজী ৮০ পৃষ্ঠা।

(১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।)

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ডাকমাশুল ওজন দশ তোলার অধিক হওয়ায় ৸৹ বারো আনা। অগ্রিম মূল্য ও মাশুল ব্যতীত কাহাকেও কাগজ পাঠানো হয় না।

১৫ই কার্তিক সাধনার এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম বর্ষ ১১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অল্পসংখ্যক এখনও অবশিষ্ট আছে। মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ৷৵৹ নয় আনা।

প্রথম বর্ষের সাধনা (দুই খণ্ডে বিলাতী বাঁধাই)। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৸০ এবং মাশুল ।০ চারি আনা।

যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। কার্য্যাধ্যক্ষ।
৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলিকাতা।

চার বৎসরের সাধনার প্রতি মাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা নিম্নরূপ :

১২৯৮ অগ্রহায়ণ ১-৯২, পৌষ ৯৩-১৮৮, মাঘ ১৮৯-২৮৬, ফাল্গুন ২৮৭-৩৮২, চৈত্র ৩৮৩-৪৭৮, ১২৯৯ বৈশাখ ৪৭৯-৫৬৬, জ্যৈষ্ঠ ১-১০৪, আষাঢ় ১০৫-১৯২, শ্রাবণ ১৯৩-২৮৮, ভাদ্র-আশ্বিন ২৮৯-৪৪৮, কার্তিক ৪৪৯-৫৪০ ॥ অগ্রহায়ণ ১-৯২, পৌষ ৯৩-১৮০, মাঘ ১৮১-২৭৬, ফাল্গুন ২৭৭-৩৬০, চৈত্র ৩৬১-৪৫৬, ১৩০০ বৈশাখ ৪৫৭-৫৫২, জ্যৈষ্ঠ ১-৯৬, আষাঢ় ৯৭-২০০, শ্রাবণ ২০১-৩০২, ভাদ্র ৩০৩-৩৯৮, আশ্বিন-কার্তিক ৩৯৯-৫৯০ ॥ অগ্রহায়ণ ১-১০০, পৌষ ১০১-১৯৬, মাঘ ১৯৭-২৯২, ফাল্গুন ২৯৩-৩৮০, চৈত্র ৩৮১-৪৬৮, ১৩০১ বৈশাখ ৪৬৯-৫৬৪, জ্যৈষ্ঠ ১-৮২, আষাঢ় ৮৩-১৭৮, শ্রাবণ ১৭৯-২৬৬, ভাদ্র ২৬৭-৩৫৪, আশ্বিন-কার্তিক ৩৫৫-৫০৫ ॥ অগ্রহায়ণ ১-৯৬, পৌষ ৯৭-১৯৪, মাঘ ১৯৫-২৯২, ফাল্গুন ২৯৩-৪০৪, চৈত্র ৪০৫-৪৮৮, ১৩০২ বৈশাখ ৪৮৯-৫৮৮, জ্যৈষ্ঠ ১-৯০, আষাঢ় ৯১-২০২, শ্রাবণ ২০৩-২৯৮, ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ২৯৯-৫৫৪ ॥ চার বৎসরেব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৫৯।

সাধনার প্রতিটি সংখ্যা সম্ভবত মেশিনে না-ছাঁটা হয়ে প্রকাশিত হত। একালে বিশ্বভারতীর আবাঁধা রবীন্দ্ররচনাবলী যে-ভাবে বিক্রয় হয়। 'সম্ভবত' বলার কারণ, না ছাঁটা সাধনার কোনো নমুনা এখন আর পাবার সুযোগ নেই। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বা সংগ্রহে আমরা সাধনার যে ফাইল পাচ্ছি—তা প্রতি ছয় মাসের বাঁধানো সাধনার ফাইল। সাধনা যে অকর্তিত হয়ে বেরত সে সংবাদ জানতে পারি রবীন্দ্রনাথকে লিখিত গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি থেকে। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ তারিখের পত্রে প্রভাতকুমার সাধনা সম্পর্কে লিখেছেন, "ধারগুলা কাটিয়া দিলে বেশ সুশ্রী দেখায় ; তাহা দেন না কেন? দেওয়া উচিত। বাঁধাইতে হইবে তাহা ত জানি মহাশয়, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেও একটু সুশ্রী দেখায়, ইহা আমার বিবেচনায় অত্যাবশ্যকীয়।"[১]

১. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫।

সাধনার প্রকাশন পারিপাট্য ও ব্যয় বাহুল্যের কথা সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বীকার করে গেছেন স্পষ্টভাবে। সাধনার তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হলে পত্রিকার শেষে তিনি লিখলেন, "আমরা কিয়ৎপরিমাণেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছি কিনা জানি না। কিন্তু একথা গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না যে, যে পরিমাণ জনাদর প্রাপ্ত হইলে বহুব্যয়সাধ্য 'সাধনা' স্বচ্ছন্দে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিত তাহা 'সাধনা'র অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাতে হয়ত আমাদের অক্ষমতা অথবা দুর্ভাগ্য অথবা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের একটি উৎসাহের কারণ এই আছে যে, আমরা অনেক কৃতবিদ্য পাঠক লাভ করিয়াছি এবং সাধনার প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তবুও যে, সাধনার আর্থিক অবস্থার অস্বচ্ছলতা ঘটিয়াছে সে কেবল সাধনার অনুষ্ঠাতাগণের বিবেচনার দোষে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙলা দেশের কোনো সাময়িকপত্রের তাদৃশ ব্যয়বাহুল্য করা উচিত হয় না।

পত্রিকার স্থায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আগামী বৎসর হইতে সাধনার সাইজ রয়াল করা হইবে—এবং কাগজের ভার লাঘব করিয়া যাহাতে দুই পয়সা মাশুলে যায় তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। আগামী বৎসর হইতে পত্রিকার মূল্য ডাক-মাশুল সমেত তিনটাকা স্থির হইল। এক্ষণে গ্রাহকগণকে ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা বার আনা দিতে হইতেছে তাহার উপর কেবল চারি আনা মূল্য বৃদ্ধি হইল।"

সাধনার এই রূপপরিবর্তনের প্রস্তাবে পত্রিকার হিতৈষী সুহৃদেরা খুশী হন নি। সাধনার প্রকাশন সৌষ্ঠবে ব্যয়সংক্ষেপের প্রস্তাবে তাঁরা সমর্থন জানাতে পারলেন না। তাঁদের মত, সাধনা যেমনভাবে যে-রূপে ছাপা হচ্ছিল সেই ভাবেই প্রকাশিত হোক। রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই সময় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (৭ কার্তিক ১৩০১) লিখেছেন, "সাধনার সাইজ ও কাগজ কমানো সম্বন্ধে অনেক হিতৈষী বন্ধু আপত্তি করাতে অবশেষে তাঁহাদের অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার হইয়াছি। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে সাধনার কোষ্ঠিতে ব্যয়ের ঘরে এ বৎসরেও শনির দৃষ্টি আছে, আয়ের ঘরে যদি রাহু থাকেন তাহা হইলে মৃত্যু অতি সন্নিকট। যাহা হউক এ বৎসরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যদি আবশ্যক বোধ করি ত আগামী বৎসরে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা করিব।"[২]

২. ভারতবর্ষ ১৩২৩ বৈশাখ।

১৩০১ অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাধনা প্রকাশিত হল। প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি ছাপা হয় তার নাম 'সাধনা'। তার প্রথম কয়েকটি ছত্রে আছে :

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবসনিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বারবার,
ভালোয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।
তবু ওগো, দেবী, নিশিদিন করি পরানপণ,
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।

এই কবিতায় কাব্যলক্ষ্মীর উদ্দেশে কবির রোমান্টিক আকুতি আত্মপ্রকাশ করলেও 'ব্যর্থ সাধনখানি'র মধ্যে গত তিন বৎসরের সাধনার 'দুর্ভাগ্য' যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে সাধনার 'মৃত্যু অতি সন্নিকট' তার জীবন-শক্তি আর কি ফিরে আসবে না? কবি কিছুতেই তাঁর সাধনাকে ব্যর্থ হতে দিতে পারেন না। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে।'

চতুর্থ বর্ষ থেকে (১৩০১ অগ্রহায়ণ) সাধনা পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। বার্ষিক মূল্য দু টাকা বারো আনার স্থলে তিন টাকা করা হয়। চতুর্থ বৎসরে সাধনার কর্মাধ্যক্ষ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) সাধনার প্রকাশন সৌষ্ঠব সম্পর্কে অনেক কথা লেখেন। তাঁর চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করি :

"সাধনা সম্বন্ধে গোটাকতক কথা আমার বলিবার আছে। সাধনার মূল্য বাড়াইয়া আমার বিবেচনায় বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই—কারণ নির্বাচিত অল্পসংখ্যক যাঁহারা সাধনা লন, দু দশ আনার কমবেশীতে তাঁহাদের কিছু আসে যায় না আশা করি। কিন্তু সাধনার কাগজ অপেক্ষাকৃত পাতলা করিয়া কাজটা ভাল হয় নাই। 'খুব ভাল কাগজ' ইহা সাধনার বাহ্যিক অংশের একটা বিশেষত্ব ছিল।…বিজ্ঞাপনের পাতলা কাগজগুলা সাধনার মুখের উপর না চাপাইয়া, পশ্চাতে দিলেই ভাল হয়। মলাট খুলিলেই সাধনার প্রথম পাতা দেখা যাওয়া উচিত।…যে পৃষ্ঠায় এক প্রবন্ধ শেষ হয়, সে পৃষ্ঠায় অন্যটি আরম্ভ না করিলেই ভাল হয়। সাধনার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রত্যেক খণ্ডে সমান থাকা উচিত। ৯৬ পৃষ্ঠা —১২ ফর্মা প্রতিবারে দিলেই ঠিক হয়। মলাট ছিঁড়িয়া গেলে, বইখানি কোন্ মাসের এবং কোন্ বৎসরের তাহা জানিবার উপায় থাকে না।"[৩]

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সাধনার হিসাবের খাতা[৪] থেকে সাধনা সম্পর্কে অনেক সংবাদ জানা যায়। এটি চতুর্থ বর্ষের হিসাবের খাতা। চতুর্থ বর্ষে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন—এইচ বোস (কুন্তলীন), বি দত্ত ব্রাদার্স (চিৎপুর), ডায়মণ্ড মেডিকেল স্টোর্স (হ্যারিসন রোড), বি সি মল্লিক এণ্ড কোং (চিৎপুর), নরসিংহপ্রসাদ দত্ত এণ্ড সন্স, বালি পেপার মিলস্ ইত্যাদি। একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন—কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দর্শন।

বিজ্ঞাপনের হার ছিল এক বছরের জন্য পূর্ণ পৃষ্ঠা ত্রিশ টাকা। মাসিক আড়াই টাকা মূল্যের বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছে।

সাধনা ছাপা হত হাজার কপি। গ্রাহকের সংখ্যা ছিল তার অনেক কম। নগদ দামেও খুব বেশি বিক্রি ছিল না। ১৪ বৈশাখ ১৩০২ নগদ বিক্রির খাতে জমা দেখা যায় পাঁচ টাকা এক আনা। বিজ্ঞাপনের টাকাগুলিও নিয়মিত পাওয়া যেত না। গাড়ি ভাড়া খরচ করে টাকা সংগ্রহের জন্য যেতে হত। সাধনার নিয়মিত গ্রাহকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, চুণীলাল বসু, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, জগদিন্দ্রনাথ রায়,

৩. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫।

৪. খাতার উপরে লেখা—সাধনার ক্যাশ বহি। হিসাব লেখা শুরু হয় ৪ কার্তিক ১৩০১, ২০ অক্টোবর ১৮৯৪ থেকে। লাল কাপড়ে বাঁধানো বড় আকারের এই খাতাটির শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে পরিগ্রহণ-সংখ্যা 97. A।

রজনীকান্ত সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, চন্দ্রমাধব ঘোষ, হরিনারায়ণ আপ্তে (মারাঠী লেখক)।

নতুন গ্রাহক সংগ্রহকারী এবং চাঁদা সংগ্রহের জন্য আদায়কারীকে টাকায় এক আনা হারে কমিশন দেওয়া হত।

রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ পত্রিকার জন্য আর্থিক সাহায্য করতেন প্রায় মাসে মাসে।

হিসাবের খাতা থেকে আরও নানা সংবাদ জানতে পাই। পত্রিকার প্রতি ফর্মা ছাপার খরচ ছিল ছয় টাকা। বাঁধাই প্রতি ফর্মা এক আনা।

ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় (১৩০২) একটি ছবি ছাপা হয়েছিল—বিদ্যাসাগরের। রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধের সঙ্গে ছবিটি বেরোয়। থ্যাকার স্পিংক থেকে এক হাজার কপি ছবি ছাপিয়ে আনতে খরচ পড়েছিল পঁচানব্বই টাকা।

চতুর্থ বর্ষের সূচনায় সাধনার প্রচারের জন্য কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ১৩০১এর ১৭ অগ্রহায়ণের খাতায় লেখা আছে, "সাধনার প্লাকার্ড মারিবার মজুরি শোধ—সাড়ে চার টাকা।"

এই বৎসর অন্তত দুজন লেখককে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণার পরিমাণ রচনাপ্রতি পাঁচ টাকা। পেয়েছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর একটি প্রবন্ধের জন্য ও দীনেন্দ্রকুমার রায় তিনটি প্রবন্ধের জন্য। দীনেন্দ্রকুমার শেষ রচনাটির জন্য দশ টাকা পান।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমকালীন পত্র-পত্রিকায় সাধনা প্রসঙ্গ

সাধনা পত্রিকাকে তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিল। সাধনা পত্রিকায় প্রায় প্রতিটি সংখ্যার সমালোচনা দেখতে পাই সমকালীন সাহিত্য পত্রিকার পাতায়। টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে, সাহিত্য পত্রে রবীন্দ্ররচনার যে সমালোচনা মুদ্রিত হয়েছিল তা একত্রে সংকলিত হয়েছে। এখানে প্রথমে সাহিত্য পত্রিকা থেকে সাধনার প্রথম সংখ্যার সম্পূর্ণ সমালোচনাটি উদ্ধার করা গেল। তাছাড়া সাধনার প্রথম বর্ষ সম্পর্কে সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচনা সংকলিত হল। সাধনার তৃতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যা ও চতুর্থ বর্ষের প্রথম ও শেষ সংখ্যা সম্পর্কিত সমালোচনাও সংগৃহীত হল।

ক. সাহিত্য ১২৯৮ পৌষ

আমরা সাদরে 'সাধনা'র আবাহন করিতেছি। পত্রিকার আকার প্রকার অতি সুন্দর ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন বলা যাইতে পারে। সাধনার প্রথম সংখ্যায়, বিলক্ষণ নূতনত্ব আছে, নানাবিধ প্রবন্ধের সমাবেশে বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে, সাধনার উন্নতি ও সম্পূর্ণ সিদ্ধি কামনা করি।

আমরা রবীন্দ্রবাবুর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন আমোদ পাইয়াছি, উপসংহারে তেমনই নিরাশ হইয়াছি। এই গল্পটির আরম্ভভাগ, অতি মনোরম, বেশ স্বাভাবিক! ইহার প্রাঞ্জল ভাষা, সরল প্রণালী ও সহজ অলঙ্কার, গল্পটিকে আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। আদুরে খোকার খামখেয়ালী মেজাজ কেমন স্বভাবিক। কিন্তু যখন রাইচরণ নিজের বুড়া খোকাটিকে, মুন্সেফবাবুর সেই আদুরে খোকা বলিয়া আনিয়া দিতেছে, তখন আমাদের কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মুন্সেফবাবু যেন গল্পটি সমাপ্ত করিবার জন্যই, সন্দেহ সংশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পরের ছেলেটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এইজন্য গল্পটি কেমন অঙ্গহীন ও কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়।

আমরা সেদিন একখানি বিলাতী কাগজে পড়িতেছিলাম, রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ

ঔপন্যাসিক কাউণ্ট টলস্টি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—একজন প্রকৃত ভালো লেখকের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ কিছু ভালো বলিবার থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ তাহা ভালো রকমে বলা চাই, তৃতীয়তঃ অন্তরের সহিত বলা চাই। ডিকেন্সের এই তিনটি গুণই ছিল। থ্যাকরের বলিবার বিষয় বড় বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু কেমন করিয়া বলিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন; কিন্তু তাঁহারও আন্তরিকতা ছিল না। রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহারও শেষ দুটি গুণ যথেষ্ট আছে, তাঁহার বলিবার প্রণালী চমৎকার; তিনি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লিখিতে পারেন, সুতরাং তাহাতে বেশ আন্তরিকতা থাকে, কিন্তু তাঁহার বলিবার বিষয়ের বড় অভাব।

'ঋতুসংহারে'র সমালোচনা আমাদের খুব ভালো লাগিয়াছে। ইহাতে আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই; লেখক সরল ভাষায় ঋতুসংহারের সৌন্দর্য বেশ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন।

'প্রাণ ও প্রাণী' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রায় প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। তাঁহার বক্তব্য বিষয় তিনি সরল ভাষায় বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

'সোরাব ও রোস্তম' নামক গল্পটি একটি ইংরাজী কবিতার ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এ গল্পটিও আমাদের ভালো লাগিল না। মূল কবিতায় স্ত্রীচরিত্রের অস্তিত্ব নাই, লেখক তাহা স্বয়ং উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেমন খাপছাড়া হইয়াছে। ম্যাথু আর্ণল্ডের প্রতিভাকে ভিত্তি করিয়া, তাহার উপর নূতন সৃষ্টি করা, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় বড় যুক্তিসঙ্গত নহে। লেখককে বড় সাবধানে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, বোধ করি এইজন্য তাঁহার ভাষাও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। চর্বিতচর্বণের দৌরাত্ম্যে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। এ অবস্থায়, ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের শরণ গ্রহণ বড় মন্দ কথা নহে, বরং আশাপ্রদ। আমরা আশা করি, সোরাব ও রোস্তম লেখক এবার অকৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া এ পথ পরিত্যাগ করিবেন না। কেন না, তাঁহার ব্রতই সাধনা।

'সাময়িক সার সংগ্রহ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই প্রবন্ধের লেখক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। অল্পের মধ্যে কেমন করিয়া লিখিতে হয়, তিনি তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন। ইহাতে, নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরীর কয়েকটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা হইয়াছে। এরূপ সংগ্রহে যেরূপ দক্ষতার প্রয়োজন,

লেখক তাহার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। এই সকল সংগৃহীত সংক্ষিপ্তসারের উপর লেখকের নিজের সমালোচনা আছে। তাহাতেও বিশেষ সংযম ও সমীচীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' এই সংখ্যার আর একটি মনোজ্ঞ বিষয়। কিন্তু এত অল্প যে, পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। আমরা আশা করি, বারান্তরে ডায়ারি একটু অধিক করিয়া প্রকাশিত হইবে।

সাধনায় একখানি ছবি আছে—স্বপ্নপ্রয়াণ। চিত্রখানি ভাল হয় নাই, আর বাঙালা দেশে এখন চিত্রশিল্পের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ইহা অপেক্ষা ভালো ছবিও বোধ করি অসম্ভব।

'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় ভারতী, নব্যভারত ও আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা আছে। লেখক, মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী'র সমালোচনায় বলিয়াছেন—'প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে। অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না।…যিনি প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য।'

আমাদের বোধ হয়, লেখকের মত এই যে, মেয়েদের বাহিরে কার্যক্ষম করিবার উপযোগী শিক্ষা না দিয়া তাহাদিগকে সম্যকরূপে জননী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই কর্তব্য। কিন্তু কথা এই যে, জননীর উপযুক্ত শিক্ষা দিতে গেলে কেবল নাটক নবেল পড়াইলে চলিবে না। অবশ্য দু-একটি গুরুতর বিষয়েও শিক্ষা দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিও কিছু মার্জিত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু এটা বড় বিপদের বিষয় এই যে, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু অনুশীলিত হইলে, তাঁহারা আমাদের চিন্তাশীল লেখকদের সাহায্য ব্যতীতও নিজেদের জন্য ভাবিতে ও কাজ করিতে শিখিবেন। পৃথিবীর আরম্ভ হইতে এতদিন ভাবুক লেখকেরা যে পথ দেখাইয়া আসিয়াছেন, সেই পথের উপর তাঁহাদের বড় বিশ্বাস থাকিবে কি না, সে বিষয়েও আমাদের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন হয়ত কাঁদিয়া বলিয়া আমাদিগকে পুনর্বার বলিতে হইবে,—'জগতের এই দুর্বিষহ ভার বহন করা তোমাদের কাজ নয়।' এইরূপ কঠিন ন্যায়শাস্ত্রের বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে, অবশেষে আমাদিগকে মহাস্ত্র

পাশবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আর একটি কথাও মেয়েরা বলিতে পারেন—'তোমরা নানা রকম শিক্ষার ও কার্যের ভিতর থাকিয়াও তোমাদিগের পুরুষত্ব হারাও না, আর আমরা বাহিরে গেলেই আমাদিগের কোমলতা, সহৃদয়তা, সন্তানপালন প্রভৃতি সবই নষ্ট হইবে, ইহা বড়ই আশ্চর্য। এ ন্যায়টুকু পুরুষদিগের একচেটে। তোমরা যদি বল, সভ্যতার খাতিরে তোমাদিগের শিক্ষা দরকার, আমরাও বলি, সভ্যতার খাতিরে আমরাও সমাজে একটুকু পা ছড়াইবার জায়গা পাইতে পারি।' যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদিগের চিন্তাশীলা লেখিকার মত কি আমরা তাহা জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

খ. নব্যভারত ১২৯৮ ফাল্গুন

সাধনা। মাসিকপত্র, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য ২৲, মাশুল ৵৹। তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তিন সংখ্যাই পাইয়াছি। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা, এরূপ পরিপাটি পত্রিকা এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। আমরা যত ভাবি, ততই বুঝি, মহর্ষির বাড়ির সকলই মধুর, সকলই সুন্দর। বঙ্গের আর কোনো পরিবারে এতগুলি বাঙ্গালা ভাষার সাধক দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতৃসেবার জন্য এ বাড়ির সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে লালায়িত। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি সেইরূপ কৃতিত্ব লাভ করিতেছেন। সাধনার লেখার পারিপাট্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। আশা করি, পত্রিকাখানি মহর্ষির পরিবারের গৌরব আরো উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।

গ. নব্যভারত ১২৯৯ চৈত্র

ইহা ঠাকুরদের সখের জিনিস। ইহাতে সর্বসাধারণের প্রয়োজন সিদ্ধ কি পরিমাণে হয়, ঠিক বলা যায় না। সাধনার প্রবর্তক শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথবাবুর আত্মম্ভরিতার মাত্রার বাড়াবাড়ি না হইলে পত্রিকা সমাজের বিশেষ উপকারিণী হইত। ইহার আবির্ভাবে উপকার হইয়াছে।

ঘ অনুসন্ধান ১২৯৮ চৈত্র

সাধনা। শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। প্রথম হইতে দু'-চারি-দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উল্টাইয়াও বুঝিতে পারিলাম না যে, এখানা কি? ওহো, হঠাৎ মনে পড়িল, বিজ্ঞাপনে যে দেখিয়াছিলাম,—'সাধনা'—মাসিকপত্র! ভাল! ভাল! বা! বেশ কাগজখানি তো! এক এক সংখ্যা যেন এক একখানি পুস্তক!

কি সুন্দর ছাপা! কি পুরু পুরু পরিষ্কার কাগজ! লেখকগণ আবার দেখি—সব্বাই 'ঠাকুর'! বা! বেশ সারি সারি সাজানো তো!

যাই হোক, বাস্তবিকই 'সাধনা' কাগজখানি বেশ একটি 'সখের জিনিস' হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ির আবালবৃদ্ধ-বনিতা—তাঁরাই সকলে এ কাগজখানিতে লেখেন; তাঁদেরই এটি 'সখের জিনিস'। সুন্দরই হইতেছে। প্রবন্ধও—ইস্তক বেদালোচনা নাগাদ সা-রি-গা-মা—শেষ রঙ্-তামাসা-চুটকি-মজাদার—সবই রকম আছে। মন্দও আছে, ভালোও আছে—এই পাঁচ ফুলের সাজি আর কি? ফলতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে এটিকেও একটি পরিপাটি জিনিস বলিতে হয়। বাস্তবিকই এটি লাগেও ভাল। আর, তাই আমরা অন্তরের সহিত ইহার স্থায়িত্ব কামনা করি।

ঙ. বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৯৯ কার্তিক

সাধনা। শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। ইহার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। প্রবন্ধের বৈচিত্র্য, ভাষার মাধুর্য, চিন্তার গাম্ভীর্য ও মুদ্রাঙ্কনাদির পারিপাট্য সকল বিষয়েই সাধনা প্রশংসার্হ। এরূপ পত্রিকার দীর্ঘ জীবন আমরা প্রার্থনা করি।

চ. নব্যভারত ১২৯৯ অগ্রহায়ণ

সাধনা। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। সাধনার এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সাধনা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি; এই জন্যই, এক বৎসর সাধনা পাঠে আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহা লিখিতেছি; নচেৎ লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সাধনা খুব বড় ঘরের কাগজ, রূপ দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। এরূপ উৎকৃষ্ট বেশভূষায় কোনো গরীবের কাগজ এদেশের বাজারে বাহির হয় নাই। যাঁহারা বাহ্য চাকচিক্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই রূপে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, হাতে করতালি দিয়া বলিয়াছেন, শুনিয়াছি, এদেশে এরূপ জিনিস আর বাহির হয় নাই। যাঁহারা অন্তরদর্শী বাহ্যে চাকচিক্যে তত পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা সাধনা সম্বন্ধে প্রায়ই নীরব; দুই এক জনের মত শুনিয়াছি, তাহা তত আশাপ্রদ নহে। কিন্তু সে সকল কথায় কাজ নাই।

আমরা সাধনা সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম এবং তাহা নব্যভারতে ব্যক্তও করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্বৎসর পরে, ধীরে এবং নিরপেক্ষভাবে

সাধনার চাল্‌চলতি নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগকে কিছু নিরাশ হইতে হইয়াছে। আমরা একদিন পরম শ্রদ্ধেয়, সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বাগ্রজ তীক্ষ্ণ প্রভাবশালী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শন, প্রচার ও নবজীবন আমাদের বহু যত্নের ফল, কিন্তু একটানা সুরে সাধা ছিল বলিয়া স্থায়ী হইল না।' সাধনাও একটানা সুরে সাধা। এক ব্যক্তি যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন; প্রতি মাসে বহু প্রবন্ধ লিখিলেই তাঁহাকে একটানা ভাবে চলিতে হইবে। মাসিক কাগজে বিভিন্ন মতাবলম্বী যত বহু লোকের লেখা থাকিবে, ততই সাধারণের আদরের জিনিস হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাধনায় একা রবীন্দ্রনাথ লিখিবেন, অর্ধেক কিংবা ততোধিক প্রবন্ধ। ইহাতে যে সাধনা একটানা সুরে সাধা হইবে, আশ্চর্য কি? পত্রিকাখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যায়, এ যেন একজনেরই কাগজ। 'রবীন্দ্রবাবুর মাসিক প্রবন্ধ ও গল্প' নাম সাধনাকে দিলে যে খুব অন্যায় হয়, আমাদের বোধহয় না। সাধনার এ দোষ সংশোধিত হয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

সাধনায় পূর্বে সাময়িক পত্রিকার সমালোচনা বাহির হইত, আজ কাল আর তাহা দেখিতেছি না। এইরূপ সমালোচনার কাজ অবশ্য খুব ভালো। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তি ভিন্ন এ কাজে হাত দিয়া কেহই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। অন্যকে সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু নিজেকে সেই সমালোচনার অতীত করা বড়ই কঠিন। সাধনায় অন্যান্য পত্রিকার যে সকল প্রবন্ধের তীব্র নিন্দা প্রকাশিত হইয়াছিল, সাধনার বহু প্রবন্ধ বিশিষ্ট হইলে তদপেক্ষা অধিক নিন্দার জিনিস হইয়া দাঁড়ায়। সাধনা যদি আপনার কলেবর শোভিত প্রবন্ধ-সমূহের ঐরূপ নিন্দা ঘোষণা করিতেন, নিরপেক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিতাম। সাধনার সাময়িক পত্রিকার সমালোচনায় গত বৎসর অহংকার-প্রসূত অযথা নিন্দা-গরলের অস্ফুট আভাস পাইয়া আমরা বেদনা পাইয়াছি। সাধনা যে বংশের গৌরব উজ্জ্বল করিতে অবতীর্ণ, আমাদের ইচ্ছা, এ দোষ সাধনাকে আর কলুষিত না করে। প্রতিভার আদর সর্বদেশে, কিন্তু অহংকারদূষিত প্রতিভা সকল দেশেই নিন্দিত।

সাধনার আমরা একান্ত পক্ষপাতী, আমরা একান্ত হিতৈষী। এক ক্ষেত্রে কার্য করিতেছি বলিয়া তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপ ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই দোষের উল্লেখ করিলাম। বেশভূষার সহিত সাম্বন্ধে সাধনা

এ দেশের গৌরবের জিনিস হউক, সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

ছ. সাহিত্য ১৩০১ কার্তিক

এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা'র সম্পাদকতা পরিত্যাগ ও যোগ্যতর হস্তে সম্পাদকীয় কার্যভার ন্যস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, 'কিন্তু একথা গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না যে, যে পরিমাণ জনাদর প্রাপ্ত হইলে বহু ব্যয়সাধ্য সাধনা স্বচ্ছন্দে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত, তাহা সাধনার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাতে হয়ত আমাদের অক্ষমতা অথবা দুর্ভাগ্য অথবা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।' সাহিত্য হিসাবে 'সাধনা' সফল হইয়াছে, বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চার অত্যন্ত দুরবস্থা না হইলে, 'বহু ব্যয়সাধ্য' 'সাধনা'র আকার প্রকার পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইত না। সুধীন্দ্রবাবু তিন বৎসর দক্ষতার সহিত 'সাধনা'র সম্পাদকতা করিয়া বিদায় লইলেন,—আমরা তাঁহার যত্নে এ তিন বৎসর সাহিত্য ক্ষেত্রে যে আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দি। তিনি 'সাধনা'র সফলতায় অপ্রত্যয় বটে, কিন্তু আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, তাঁহার 'সাধনা' সিদ্ধ হইয়াছে।

জ. সাহিত্য ১৩০১ পৌষ

এই সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা'র বিশেষ কোনো বৈলক্ষণ্য হইয়াছে এমন বোধ হইল না। তবে দেখা যাইতেছে,—নূতন সম্পাদক সমালোচনার বিষয় অবহিত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় দুইটি সমালোচনা প্রবন্ধ ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র 'গ্রন্থ সমালোচনা' আছে। বর্তমান সম্পাদক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন শক্তিশালী সুকবি, তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, সৌন্দর্য দৃষ্টি, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাহিত্যে অনুরাগ ও বঙ্গ সাহিত্যে প্রভূত প্রতিষ্ঠা আছে। তিনি যদি কর্তব্যবোধে নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং অবাধে ও অসংকোচে সেই ব্রত পালন করেন, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর হয়। তাঁহার সকল সমালোচনা সাধারণের মতানুগত ও প্রীতিপদ হইবে, এমন আশা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী লেখকের লেখনী সমালোচনায় নিযুক্ত থাকিলে যে প্রভূত উপকারের আশা আছে তাহা বোধ

করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। নূতন সম্পাদক লেখকগণের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন।

ঝ. সাহিত্য ১৩০২ কার্তিক

সাধনা। ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক,—একত্র। পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, 'সাধনা' অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না। সাহিত্য সংসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া সাধনাকে সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। তাহার পর 'সাধনা' ত্রৈমাসিক হইতেছে শুনিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা 'সাধনা'র বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। 'সাধনা' বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোনো কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশ হয় নাই। তথাপি মনে হয় বাঙ্গালী পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে 'সাধনা' বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে সাধনাব মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবকাশ পায়, সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

ঞ. সাহিত্য

একমাত্র সাহিত্য পত্রিকায় সাধনা সম্পর্কে যেরূপ ধারাবাহিক সমালোচনা প্রকাশিত হয় তৎকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তদ্রূপ লক্ষ্য করা যায় না। সাহিত্যের কোন্ কোন্ সংখ্যায় সাধনার কোন্ কোন্ সংখ্যা সমালোচিত হয়েছিল তা নির্দেশিত হল—

সাহিত্য ১২৯৮ পৌষ (সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ), সাহিত্য ১৩০০ বৈশাখ (সাধনা ১২৯৯ চৈত্র), সাহিত্য ১৩০০ বৈশাখ (সাধনা ১৩০০ বৈশাখ); সাহিত্য ১৩০০ শ্রাবণ (সাধনা ১৩০০ আষাঢ), সাহিত্য ১৩০০ ভাদ্র (সাধনা ১৩০০ শ্রাবণ); সাহিত্য ১৩০০ অগ্রহায়ণ (সাধনা ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক); সাহিত্য ১৩০০ পৌষ (সাধনা ১৩০০ অগ্রহায়ণ); সাহিত্য ১৩০০ মাঘ (সাধনা ১৩০০ পৌষ) ; সাহিত্য ১৩০০ ফাল্গুন (সাধনা ১৩০০ মাঘ) ; সাহিত্য ১৩০০ চৈত্র (সাধনা ১৩০০ ফাল্গুন) ; সাহিত্য ১৩০১ বৈশাখ (সাধনা ১৩০০ চৈত্র), সাহিত্য ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ (সাধনা ১৩০১ বৈশাখ) ; সাহিত্য ১৩০১ আষাঢ় (সাধনা ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ) ; সাহিত্য ১৩০১ শ্রাবণ (সাধনা ১৩০১ আষাঢ়) ; সাহিত্য ১৩০১ ভাদ্র (সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ) ; সাহিত্য ১৩০১ আশ্বিন (সাধনা ১৩০১ ভাদ্র) ; সাহিত্য ১৩০১ কার্তিক (সাধনা ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক) ; সাহিত্য ১৩০১

পৌষ (সাধনা ১৩০১ অগ্রহায়ণ) ; সাহিত্য ১৩০১ মাঘ (সাধনা ১৩০১ পৌষ) ; সাহিত্য ১৩০১ ফাল্গুন (সাধনা ১৩০১ মাঘ) ; সাহিত্য ১৩০১ চৈত্র (সাধনা ১৩০১ ফাল্গুন) ; সাহিত্য ১৩০২ বৈশাখ (সাধনা ১৩০১ চৈত্র) ; সাহিত্য ১৩০২ আষাঢ় (সাধনা ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ) ; সাহিত্য ১৩০২ শ্রাবণ (সাধনা ১৩০২ আষাঢ়) ; সাহিত্য ১৩০২ আশ্বিন (সাধনা ১৩০২ শ্রাবণ), সাহিত্য ১৩০২ কার্তিক (সাধনা ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক) ।

চতুর্থ অধ্যায়

"নিতান্তই লেখার বাতিক ছিল বলিয়া শিশুকাল হইতে কেবল লিখিতেছি।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাময়িকপত্র

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থের ঘরের পড়া অধ্যায়ে তাঁর বাল্যকালের যে-সকল সাময়িকপত্র-পত্রিকার উল্লেখ করে গেছেন সেগুলি হল বিবিধার্থ সংগ্রহ, অবোধ-বন্ধু, বঙ্গদর্শন ও প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ। এ ছাড়াও সেকালের একটি বিশিষ্ট পত্রিকার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য—সেটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই পত্রিকার নাম জীবনস্মৃতি গ্রন্থে নেই। যদিও এই তত্ত্ববোধিনীতেই কবির দ্বিতীয় পদ্য ও প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাপ্রকাশ অধ্যায়ে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকা এবং তৎসহ সাধারণী ও এডুকেশন গেজেটের নাম আছে। ভারতী শীর্ষক অধ্যায়টিতে ভারতী পত্রিকার শৈশবকালের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এই পত্রিকায় কবির 'বাল্যলীলার' অনেক নিদর্শন বর্তমান। "ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলএর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।" এ কথা বিবৃত হয়েছে জীবনস্মৃতির বালক শীর্ষক অধ্যায়ে। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শন ব্যতীত যে-সকল পত্রিকার নামোল্লেখ আছে সেগুলি হল নবজীবন প্রচার ও সঞ্জীবনী। বিবিধার্থ সংগ্রহের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বিলাতের তিনটি কাগজের নামোল্লেখ করেছিলেন। সেই তিনটি কাগজ—চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্‌ ম্যাগাজিন ও স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন। সাধনার পূর্বে রবীন্দ্রজীবনে উল্লেখ-যোগ্য আর একটি পত্রিকার নাম হিতবাদী।

উপরে যতগুলি বাংলা সাময়িকপত্রের নামোল্লেখ করা হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তার মধ্যে প্রাচীনতম। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন তত্ত্ববোধিনীর তখন চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম। তত্ত্ববোধিনী বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে শুধু বিশিষ্ট নয়, একটি অত্যন্ত দীর্ঘায়ু পত্রিকা হিসাবেও তার গৌরবমূল্য অনেকখানি। তত্ত্ববোধিনীর জীবৎকাল ১৮৪৩-১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথও এই পত্রিকার একসময় সম্পাদক ছিলেন, সেটা ১৯১১ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

কোন্ সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যদি ভারতভূমি রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা হয় তবে বলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনেই তাঁর প্রথম রচনা মুদ্রিত হয়েছিল।[১] ভারতভূমি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮০ মাঘ সংখ্যায়।

সজনীকান্ত দাসের মতে তত্ত্বাবোধিনীতে ১৭৯৫ শকের (১২৮০) জ্যৈষ্ঠ ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র শিরোনামে যে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—সেটি রবীন্দ্রনাথ রচিত। কিন্তু বিবিধ তথ্যের আলোকে স্পষ্টত বলা যায় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত হওয়া সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন যে তত্ত্ববোধিনীতে জ্যোতিষবিষয়ক তাঁর একটি বাল্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই রচনা কোন্‌টি? মনে হয় গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি—সেই রচনা।[২] তত্ত্ববোধিনীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে রচনা প্রকাশিত হয় সেটি কবিতা। নাম অভিলাষ। প্রকাশ কাল ১২৮১ অগ্রহায়ণ। গ্রহগণ জীবের আবসভূমি এর পরের মাসেই প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সে রচিত আর একখানি কবিতা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১২৮১ মাঘ বান্ধব পত্রিকায় মুদ্রিত এই কবিতার নাম হোক্ ভারতের জয়।[৩]

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিতা হিন্দুমেলায় উপহার মুদ্রিত হয় ১৮৭৫এর ২৫ ফেব্রুআরি (১২৮১ ফাল্গুন) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায়, কবির স্বাক্ষর সংযুক্ত হয়ে।[৪]

অতঃপর ১৮৭৫ এপ্রিল-মে মাসে (১২৮২ বৈশাখ) প্রতিবিম্ব পত্রিকায় প্রকৃতির খেদ প্রকাশিত হয়।

দু মাস পর ১৮৭৫ জুন-জুলাইয়ে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৯৭ শকের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকৃতির খেদ শীর্ষক কবিতাটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'বালকের রচিত' বলে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ সংবলিত হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে রচনাপ্রকাশ অধ্যায়ে লিখেছেন যে জ্ঞানাঙ্কুরেই [জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব] তাঁর পদ্য এবং গদ্য রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু

১-৩. দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ) চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত। রচনাবলীতে কবিতার শিরোনামে হিন্দুমেলার উপহার ছাপা হয়েছে। হিন্দুমেলায় উপহার হবে।

দেখা যাচ্ছে জ্ঞানাঙ্কুরের পূর্বেই তাঁর পদ্য এবং গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যকে সাময়িকপত্রে প্রকাশের ভিত্তিতে যদি যুগবিভাগ করি তবে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বকে অবশ্যই কবির প্রথম পর্বের রচনাধারার একটি বিশেষ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করতে হবে।

প্রকৃতির খেদ পর্যন্ত রচনাধারাকে প্রবোধচন্দ্র সেন 'উদ্যোগপর্ব' বা 'অজ্ঞাত-বাসপর্ব' নাম দিয়েছেন।[৫] এখানে প্রশ্ন আসে, হিন্দুমেলা কবিতাটি তো স্বনামেই প্রকাশিত, তাহলে এই সময়কার রচনাকে অজ্ঞাতবাসপর্বের অন্তর্গত করি কেমন করে? এ প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেনের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করি। –

"হিন্দুমেলার এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত হলেও এটি তাঁর অজ্ঞাতবাসপর্বেরই অন্তর্গত। প্রকাশ্য জনসভায় লেখককর্তৃক আবৃত্তি করা হয়েছিল বলে স্বভাবতই এটি লেখকের নামযুক্ত হয়ে সাময়িক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আসলে এটি বেনামী কবিতা প্রকাশের যুগেরই অন্তর্গত। বোধ করি এই বেনামী কবিতা প্রকাশে বড়দাদা এবং জ্যোতিদাদাই তাঁর পথপ্রদর্শক। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রথম সর্গ বঙ্গদর্শনে (১২৮০ শ্রাবণ) বেনামী ভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও প্রথম দুটি গ্রন্থে ('কিঞ্চিৎ জলযোগ' এবং 'পুরুবিক্রম') লেখকের নাম গোপন করা হয়েছিল।"[৬]

এই 'অজ্ঞাতবাসপর্বে'র সমাপ্তি কবে? প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকার ১২৮২ অগ্রহায়ণ (১৮৭৫ নভেম্বর-ডিসেম্বর) সংখ্যা থেকে 'প্রলাপ' ও 'বনফুল' কাব্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই 'বনফুল'-প্রকাশের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাস ও উদ্যোগ-পর্বের সমাপ্তি ঘটলো।"[৭]

পুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানতে পারছি জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রে বনফুল কাব্যোপন্যাস মুদ্রিত হয় পত্রিকার নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিতে:

১২৮২ ॥ অগ্রহায়ণ, মাঘ, চৈত্র

১২৮৩ ॥ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক।

গ্রন্থপঞ্জী থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে এই 'রচনা স্বাক্ষরহীন'।

৫-৭. প্রবোধচন্দ্র সেন – রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা, ১৩৫০ বৈশাখ।

সুতরাং বনফুল যখন প্রকাশিত হয় তখনও কবির অজ্ঞাতবাসপর্ব চলছিল বলতে হয়। বনফুল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় সাময়িকপত্রে প্রকাশের তিন বৎসর পরে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে। ৯ মার্চ ১৮৮০। এর পূর্বেই কবি-কাহিনী কবির স্বনামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছে। প্রকাশকাল ৫ নভেম্বর ১৮৭৮। বঙ্গাব্দের হিসাবে ১২৮৫। কবি-কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ভারতীতে ১২৮৪ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রচনাধারাকে অবশ্যই 'অজ্ঞাতবাসপর্ব' বলা চলতে পারে। খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দাঁড়ায় এপ্রিল ১৮৭৮।

এখন আবার প্রশ্ন উঠতে পারে, ১৮৭৮ এপ্রিলেই কি অজ্ঞাতবাসপর্বের সমাপ্তি ঘটেছে বলা চলতে পারে? যদিও কবি-কাহিনী (নভেম্বর ১৮৭৮) বনফুল (মার্চ ১৮৮০) কাব্যগ্রন্থ দুটি কবির নাম-যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই দেখি বাল্মীকিপ্রতিভা (১২ ফেব্রুআরি ১৮৮১) কবির নাম ব্যতিরেকে প্রকাশিত হল। বঙ্গাব্দের হিসাবে প্রকাশকাল ২ ফাল্গুন ১২৮৭।

এই ১২৮৭তেই ভারতী পত্রে ভগ্ন হৃদয়ের চয় সর্গ প্রকাশিত হয় কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায়। ভারতীতে এ-রচনাও ছিল স্বাক্ষরবিহীন। বস্তুতপক্ষে এই সময়কার ভারতীতে তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছিল অস্বাক্ষরিত। অপরদিকে লক্ষণীয়, বাল্মীকিপ্রতিভা প্রকাশের পর কেবল কাল-মৃগয়া গীতিনাট্য (১২৮৯ অগ্রহায়ণ, ডিসেম্বর ১৮৮২) ব্যতীত তাঁর সকল গ্রন্থই স্বনাম-সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাল্মীকিপ্রতিভার পরেই রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যগ্রন্থ কবি-নাম-সংবলিত প্রকাশিত হয় তার নাম ভগ্ন হৃদয় (২৩ জুন ১৮৮১)।

এখন পুনরায় জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছিলেন, "আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।" তাছাড়া কবি আরও লেখেন, "প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা।" জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে রবীন্দ্ররচনার সূচী প্রদত্ত হল :

১২৮২ অগ্রহায়ণ	বনফুল	প্রথম সর্গ, প্রলাপ কবিতাগুচ্ছ
মাঘ	বনফুল	দ্বিতীয় সর্গ
ফাল্গুন	প্রলাপ	কবিতাগুচ্ছ
চৈত্র	বনফুল	তৃতীয় সর্গ

১২৮৩ বৈশাখ	প্রলাপ	কবিতাগুচ্ছ
জ্যৈষ্ঠ	বনফুল	চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ
শ্রাবণ	বনফুল	ষষ্ঠ সর্গ
ভাদ্র	বনফুল	সপ্তম সর্গ
কার্তিক	বনফুল	অষ্টম সর্গ, এবং গদ্যপ্রবন্ধ : ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী।

জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে বনফুল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এমনি সময়টাতে জ্ঞানাঙ্কুর বলিয়া একটি কাগজ বাহির হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমার এই বাল্যের কবিতাগুলিও সম্পাদক মহাশয় আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলেন নাই। পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'বনফুল' নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধকরি জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইয়াছিল।"[৮]

জীবনস্মৃতিতে ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী শীর্ষক রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"আমি তখন ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের এই বাল্যপর্বের রচনাটির বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৯]

বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, বান্ধব, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে রচনা প্রকাশের একটা পর্ব সমাপ্ত হলে নূতন পর্বের সূচনা ঘটে ভারতী পত্রিকার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হল ১২৮৪ শ্রাবণে (১৮৭৭ খ্রী)। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

"এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার

৮. জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ।

৯. সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড।

বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম।…এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থে আছে—

"একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতলার ঘরে বসিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা, অমনি কাজ। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এই সংকল্প জানাইলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুও এ প্রস্তাবে অনুকূল মত দিলেন। এখন এ পত্রের কি নাম হইবে, এই সমস্যাসমাধানেই সর্বাগ্রে সকলে যত্নবান্ হইয়া পড়িলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু নাম করিলেন 'সুপ্রভাত'—কিন্তু এ নামটি জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন একটু স্পর্ধার ভাব আসে; অর্থাৎ এতদিনে ইহাদের দ্বারাই যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত হইল। সুপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্য হইল না, তখন দ্বিজেন্দ্রবাবুই আবার তাহার নাম রাখিলেন 'ভারতী'।"[১০]

কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণী রবীন্দ্রনাথকে ভারতীর "ভিত্তিস্থাপনাকারীর অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

শরৎকুমারী আরও বলেছেন—

"সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া ভারতী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।…

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হইলেন ভারতীর সম্পাদক। প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু ও 'তাঁহার' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] রচনা কিছুনা-কিছু প্রকাশিত হইতই। ছোটগল্প প্রথমে যেটি প্রকাশিত হয়, তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে।"[১২]

ভারতী চল্লিশ বর্ষে পদার্পণ করলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবির নাড় শীর্ষক একটি

১০. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

১১-১২. শরৎকুমারী চৌধুরাণী—ভারতীর ভিটা, শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

প্রবন্ধে বঙ্গসাহিত্যে ভারতী পত্রিকা আবির্ভাবের মুহূর্তটি বিশ্লেষণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নীচে উদ্ধৃত করি—

"সে সময়ে নব-রত্নপরিবেষ্টিত আমাদের সাহিত্য-বিক্রমাদিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্গদর্শনে'র সিংহাসনে আসীন হয়ে বঙ্গসাহিত্যের রাজ্যে একাধিপত্য করছিলেন। আশ-পাশের আকাশে দুই তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, কবিতার কিরণধারা বর্ষণ করছিলেন। বঙ্গদর্শনেব প্রতিভা-প্রভাবে অর্ধসুপ্ত বঙ্গসাহিত্য আবার জেগে উঠেছিল। মৃতকল্প হিন্দুসমাজ খুব একটা নাড়া পেয়েছিল। আমাদের বাড়িতেও এই সময় কাব্য-রচনার, গান-রচনাব, সাহিত্যালোচনার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল। আমার তখন পূর্ণ যৌবন। মন উৎসাহ উদ্যমে, আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ। সৌন্দর্যরস, কবিত্বরস উপভোগেব জন্য আকুল। একটা অনির্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা মনকে দখল করে বসেছিল। 'কিছু-একটা করতে হবে'—কিন্তু সে কি তা আমি জানি না। তা দেশেব হিতসাধনই হোক্ আর সাহিত্যের উন্নতিসাধনই হোক্। ·

আমি তেতালায় যে-ঘরটিতে বসতুম, সেখানে একটা গোল টেবিল, তার চারিধারে খানকতক চৌকি। আর দেয়ালেব গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি আমাব নিত্য সঙ্গী (বালক-কবি তখন জগৎ-কবি হন নি), আর এক কবি, আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় মধ্যে এসে জুটতেন। ·

একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করছি—কি শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল—এই দুই কবিবিহঙ্গ আকাশে আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছে, ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লোকালয়ের কোনো কুঞ্জকুটিরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধতে পারে, তাহলে কত লোকে ওদের স্বর-সুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র, দোতালায় নেমে এলুম।

দোতালার দক্ষিণ বাবান্দায় আর একটি প্রবীণ বিহঙ্গরাজের আসন ছিল। আসনটি জমিতে থাকলেও তিনি স্বপ্নরাজ্যেই উধাও হয়ে অষ্টপ্রহব বিচরণ করতেন। তাঁর সুললিত অপূর্ব স্বরলহরীতে আমাদের সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। বুঝতেই পারছ তিনি কে [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]। আমার প্রস্তাব শোনবামাত্রই তিনি রাজি হলেন, আর তখনি দেবী 'ভারতী'কে আবাহন করে তাঁরই পুণ্যকুঞ্জে, নবীন কবি-বিহঙ্গদের জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন।"[১৩]

১৩. কবির নীড়, ভাবতী ১৩২৩ বৈশাখ।

ভারতী পত্রিকা চল্লিশ বছরে পড়লে "এই সাময়িকপত্রের খেয়া নৌকাটি প্রথম ভাসানের দিনে আমরা যাঁহারা দাঁড়ি মাঝি ছিলাম আজ আর একবার কলম হাতে আমাদের তলব" পড়লে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সূচনাকালের কথা স্মরণ করে লেখেন—

"এই সাময়িকপত্রের নৌকাখানি সময়েব স্রোতে যেদিন প্রথম ভাসানো হইল, সেদিন আমাব বয়স ছিল ষোলো। চাণক্যের মতে তখন আমার চুপ করিয়া থাকিবাব অবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁহার উপদেশটি আমি যেমন হেলা করিয়াছি এমন আর কেহ নহে।···

তখনকার কাঁচা বুদ্ধিতে যাহা আসিত তাহাই কাঁচা কলমে লিখিতে বসিলাম, মনে ভয়-ডর-মাত্র ছিল না।··· ভারতীতে যাঁহাবা বালকেব সেই লেখাগুলি বাহির করিলেন তাঁহাবাও দিব্য নিশ্চিন্ত। জগতে তখন যেন কর্ম-ফলেব নিয়মটা অত্যন্ত ঢিলা ছিল।"[১৪]

ভাবতীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথেব মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা, ভিখাবিণী গল্পের প্রথমাংশ।

ভাবতীব প্রথম বর্ষে (১২৮৪ শ্রাবণ-চৈত্র) রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রচনা : মেঘনাদবধ কাব্য, ভিখাবিণী, ভানুসিংহেব কবিতা, করুণা, কবি-কাহিনী ইত্যাদি।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথেব উক্তি—

"প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবি-কাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে-বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতাব ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।"

স্মরণীয় যে, কবি-কাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

ভানুসিংহের কবিতাবলী সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে কবিব মন্তব্য—

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহেব সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি-

১৪. রবীন্দ্রনাথ—তখন ও এখন, ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ।

একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।"

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (বিশ্বভারতী প্রকাশিত, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৭) ভানুসিংহের পদাবলীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন –

"অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে ঠিকমত নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয় ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয় তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। এ'কে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে অন্তঃপুরের কোণের ঘরে –

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।"

ভিখারিণী গল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা গ্রন্থে লিখেছেন –

"ষোলো বছর বয়সের···আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে ভারতী।···আমার মত ছেলে, যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল অথচ সেটা কারো নজরে পড়ল না, এর থেকে জানা যায় চারদিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল।···আমি লিখে বসলুম এক গল্প, সেটা

যে কী বকুনির বিস্থনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।"

করুণা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে পুনর্মুদ্রিত হয়নি। ভারতীতে করুণা প্রকাশিত হবার সাত বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুকে ভারতীর প্রথম দুই বৎসরের পত্রিকা পাঠিয়ে দিয়ে করুণা সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ পরে সমালোচনাপূর্ণ যে-পত্র দেন তাতে লেখেন "গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপানো আবশ্যক।"[১৫]

ভারতীর দ্বিতীয় বৎসরের সূচনা ১২৮৫ বৈশাখ থেকে।

"ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন, আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। ··বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে বিলাত যাত্রা করেন ১৮৭৮এর ২০ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে। এদিকে আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে ছয় মাস কাটে। অর্থাৎ কবি কলকাতা ত্যাগ করেন ১২৮৫ বৈশাখ মাস নাগাদ—ভারতী যখন সবে দ্বিতীয় বর্ষে পড়েছে।

ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষে (১২৮৫) এসে ধারাবাহিক রচনা করুণা সমাপ্ত হয়েছে। শৈশব সঙ্গীতের কবিতাগুলি একে একে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ এবং য়ুরোপীয় সেরা সাহিত্যিকদের সম্পর্কে রচনাও এই বৎসরের ভারতীতে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি আমেদাবাদে থাকাকালেই রচিত হয়েছিল। কবি তাঁর আমেদাবাদ বাসের স্মৃতি উল্লেখ করে বলেছেন—

"মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন

১৫. বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ়।

১৬. জীবনস্মৃতি।

কি, অ্যাংলো স্যাকসন ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধ-গুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"[১৭]

য়ুরোপের সাহিত্য পাঠের ফলে কবির চিত্তকে আকর্ষণ করলেন দান্তে, পিত্রার্ক, গ্যেটে। কবি এঁদের সম্পর্কে ভারতীর পৃষ্ঠায় লিখলেন বিবিধ প্রবন্ধ।

১২৮৬তে ভারতী পত্রিকায় কবির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা - য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ আশ্বিনে বিলাত যাত্রা করেন। তাই দেখি পরবর্তী অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘে তাঁর কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নি। ফাল্গুনে কেবল অপ্সরা-প্রেম শীর্ষক একটিমাত্র কবিতা মুদ্রিত হয়। চৈত্রে আবার দেখা গেল কোনো রচনার প্রকাশ ঘটে নি। ভারতীর তৃতীয় বর্ষ, অর্থাৎ ১২৮৬ বৈশাখ থেকে শুরু হল য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র, যা পরে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "অশুভক্ষণে বিলাত-যাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই।"[১৮]

কবি বিলাত থেকে ফেরেন ১২৮৬ মাঘ মাসের শেষাশেষি নাগাদ। পুরো ১২৮৬ সনটা মুখ্যত য়ুরোপ যাত্রীর পত্রই প্রকাশিত হয়, এছাড়া যা বেরোয় তা অতি সামান্যই। য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র ১২৮৭ শ্রাবণ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতীতে ১২৮৭ বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, শৈশব সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এবং ভগ্ন হৃদয়।

জীবনস্মৃতিতে ভগ্ন হৃদয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

"বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্ন হৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল।...

'ভগ্ন হৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়'।..."

১২৮৮ ভারতীতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, এবং

১৭. জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ।
১৮ জীবনস্মৃতি।

সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ভানুসিংহের পদাবলী, আর কড়ি ও কোমল-এর কবিতা। এ-ছাড়া আছে সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ, বিবিধ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির গঙ্গাতীর অধ্যায়ে সন্ধ্যা সঙ্গীতের কবিতাগুলি রচনার বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে আছে—

"বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করতেছিলেন ; আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা। সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি। এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেষণ হইয়া থাকে।...

বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারিদিক-খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমাব কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছেব মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে, এই ঘরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।"[১৯]

জীবনস্মৃতির প্রভাত সঙ্গীত অধ্যায়ে প্রভাত সঙ্গীত সম্বন্ধে কবি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ওই অধ্যায়েই কবি তৎকালীন গদ্যরচনার কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন—

"কিছু-কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে ; সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটোছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল

১৯. কবিতা সাধনা, ভারতী ১২৮৮ পৌষ ; সন্ধ্যা সঙ্গীতে পরিবর্তিত নাম—গান আরম্ভ।

কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম, মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে, প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।"

পূর্বেই বলা হয়েছে ১২৮৮ ভাবতী পত্রিকায় ববীন্দ্রনাথেব রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক দু-একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে কবি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন জীবনস্মৃতিতে গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ শীর্ষক একটি অধ্যায়ে।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতির প্রভাত সঙ্গীত অধ্যায়ে। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ভাবতীতে ১২৮৮ কার্তিক সংখ্যা থেকে মুদ্রিত হয়। কবিও জীবনস্মৃতিতে সন্ধ্যা সঙ্গীত ও বিবিধ প্রসঙ্গের গদ্যরচনাগুলির উল্লেখ করেই বলেছেন—

"বোধকরি এই সময়েই 'বউঠাকুরাণীর হাট' নামে এক বড়ো নবেল লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।"

১২৮৯এর মুখ্য বচনা বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, বিবিধ প্রসঙ্গের গদ্য, মেঘনাদবধ কাব্যেব সমালোচনা এবং প্রভাত সঙ্গীতের কবিতা।

১২৯০এ প্রকাশিত মুখ্য বচনা প্রভাত সঙ্গীতের কবিতা, ছবি ও গানের কবিতার সূচনা এবং আলোচনা গ্রন্থের অন্তর্গত গদ্যরচনার সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিব প্রকৃতিব প্রতিশোধ অধ্যায়ের পবিশেষে লিখেছেন—

"কারোয়ার হইতে ফিবিয়া আসার কিছুকাল পবে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমাব বিবাহ হয়, তখন আমাব বয়স বাইশ বৎসর"

এর পরেই ছবি ও গান শীর্ষক অধ্যায়ের প্রাবম্ভেই কবির মন্তব্য—

"ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে-কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কাব লেখা।"

১৮৯০এর ২১ মে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রে কবির উক্তি—

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত

বাহুলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্চি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না।"[২০]

১২৯১এ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা — আলোচনা গ্রন্থের অন্তর্গত গদ্যরচনা, কড়ি ও কোমলের কবিতা, বিচিত্র প্রবন্ধের নিবন্ধ। এই বৎসর ছোটগল্প রাজপথের কথা নবজীবনে প্রকাশিত হয়।

আলোচনা শীর্ষক গ্রন্থের রচনাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির প্রভাত সঙ্গীত অধ্যায়ে লিখেছেন —

"যখন সন্ধ্যা সঙ্গীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাত সঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গদ্য লেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।"

সঞ্চয়িতার ভূমিকায় (১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —

"কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

১২৯২এ কবির রচনাস্রোত বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য রচনা কড়ি ও কোমলের কবিতা, ব্যঙ্গকৌতুক, মুকুট, 'চিঠিপত্র', হেঁয়ালি নাট্য, বিচিত্র প্রবন্ধের রচনা, রাজর্ষি, শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধ, শিশুর কবিতা, ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধ। ১২৯৩ বঙ্গাব্দেও প্রকাশিত হল কড়ি ও কোমলের কবিতা এবং হেঁয়ালি নাট্য।

১২৯৪এ প্রকাশিত হল মানসীর কবিতা, সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ, সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ।

২০. চিঠিপত্র ৫।

১২৯৫এ তিনি মানসীর অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন গাজীপুরে বসে। সেগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না।

১২৯৬ এবং ১২৯৭ বঙ্গাব্দেও সাময়িকপত্রে মুদ্রিত তাঁর রচনাব পবিমাণ অত্যন্ত কম।

এরপবেই ১২৯৮এ আবির্ভাব ঘটলো হিতবাদী পত্রিকার এবং ওই বৎসবেবই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হল সাধনা মাসিক পত্র। এই বৎসর থেকে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথেব লেখনীধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার কালানুক্রমিক সূচী : আদি থেকে সাধনা পর্ব

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গদ্য-পদ্য রচনা প্রথমে সাময়িকপত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় ও পরে তা গ্রন্থভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-প্রকাশের কালক্রম যথার্থ তাঁর রচনাবলীর কালক্রম নয়। তাঁর রচনার আদি পর্ব থেকে একটি উদাহরণ দিই। সাময়িকপত্রে বনফুল আগে প্রকাশিত, কবি-কাহিনী সাময়িক-পত্রে বনফুলের পরবর্তী কালে মুদ্রিত। কিন্তু কবি-কাহিনী গ্রন্থ বনফুল গ্রন্থের দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ ক্রমবিকাশ অনুধাবন করতে হলে—গ্রন্থপ্রকাশের কালক্রম নয়, তাঁর রচনা-সমূহের প্রথম প্রকাশের কালক্রম নির্ধারণ করা আবশ্যক। তদনুসারে এই সূচী যথাশক্তি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। আদি থেকে সাধনা পত্রিকার শেষ সংখ্যা (১৩০২ কার্তিক) পর্যন্ত এই সূচী প্রস্তুত।

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
ভারত ভূমি[১]	বঙ্গদর্শন	১২৮০ মাঘ	
অভিলাষ	তত্ত্ববোধিনী	১৭৯৬ শক অগ্রহায়ণ (১২৮১ বঙ্গাব্দ)	রবীন্দ্ররচনাবলী ৪, শতবার্ষিক সংস্করণ

১ পত্রিকায় কবিতা-রচয়িতার নামোল্লেখ নেই। বঙ্গদর্শনে কবিতার শিরোনামের পর ছোট হরফে লেখা, "এই কবিতাটি এক চতুর্দশবর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। বং সম্পাদক।" এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে প্রথম অনুমান করেন সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে। সম্প্রতি সুশান্তকুমার মিত্র লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকা ও মুখবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন। এই পুস্তকে নানা তথ্য সহযোগে ভারত ভূমি কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের রচিত বলে প্রমাণ করা হয়েছে। ভারত ভূমি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় বলে মনে করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা এই পুস্তিকা পাঠ করে ভারত ভূমি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত বলেই মনে করি।

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি[২]	তত্ত্ববোধিনী	১৭৯৬ শক পৌষ (১২৮১)	
হোক্ ভারতের জয়[৩]	বান্ধব	১২৮১ মাঘ	
হিন্দুমেলায় উপহার	অমৃতবাজার পত্রিকা	১২৮১ ফাল্গুন ১৪	র র ৪
প্রকৃতির খেদ	প্রতিবিম্ব	১২৮২ বৈশাখ	

---

২ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, "বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে।...তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন।...তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি।" সজনীকান্ত দাসকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানান, "পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম" সেটা 'তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে।" এখন প্রশ্ন, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধ কোন্‌টি? সজনীকান্ত দাস মনে করেছেন তত্ত্ববোধিনীর ১৭৯৫ শকের (১২৮০) জ্যৈষ্ঠ এবং পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র শিরোনামে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেটি বালক রবীন্দ্রনাথ রচিত। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন তত্ত্ববোধিনীতে তাঁর জ্যোতিষ বিষয়ক বাল্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি এ-কথা কোথাও নির্দেশ করেন নি যে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁর সেই বাল্যরচনা। আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির সঙ্গে অমৃতসর থেকে ডালহৌসি পাহাড়ে আসেন ১২৭৯ চৈত্র মাসের শেষে। এইখানেই মহর্ষি ও বালক পুত্র রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিষচর্চা হত। ১২৮০ আষাঢ়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফেরেন। এদিকে ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ মাসেই তত্ত্ববোধিনীতে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র শীর্ষক একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় কিস্তি আষাঢ় এবং পরে আরও কয়েকটি সংখ্যায় ছাপা হয়। এই দুরূহ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি কিছুতেই বারো বছরের বালকের রচিত বলে মনে করা যায় না। বালক কবি ডালহৌসিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পিতার নিকট আকাশের গ্রহনক্ষত্র চেনেন, জ্যোতিষ বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ নেন। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠে রবীন্দ্রনাথ যখন হিমালয়ে, তখন কলকাতায় জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়ে গেছে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র। এই প্রবন্ধ ছাপাখানায় কম্পোজ হয়েছে অন্তত বৈশাখ মাসে (১২৮০)। আর প্রবন্ধটি সম্পাদকের দপ্তরে এসেছে আনুমানিক ফাল্গুন-চৈত্র মাসে (১২৭৯)। সুতরাং সজনীকান্ত দাস নির্দেশিত ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র রবীন্দ্রনাথের রচনা হওয়া সম্ভব নয়। ১২৮১ (১৭৯৬ শক) পৌষ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে আর একটি জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ দেখা যায়। শিরোনাম গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি। এটিই বালক রবীন্দ্রনাথের 'কাঁচা হাতে'র সেই জ্যোতিষ-চর্চা বলে মনে করা যায়।

৩. দ্রষ্টব্য, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী—রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য রচনা, দেশ ১০ মে ১৯৭৬।

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
প্রকৃতির খেদ (পূর্ববর্তী পাঠ থেকে বহুলাংশ স্বতন্ত্র)	তত্ত্ববোধিনী	১৭৯৭ শক আষাঢ় (১২৮২)	র.র ৪
বনফুল ১ম সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	১২৮২ অগ্রহায়ণ	বনফুল
প্রলাপ	„	„	র র ৪
বনফুল ২য় সর্গ	„	১২৮২ মাঘ	বনফুল
প্রলাপ	„	১২৮২ ফাল্গুন	ব র ৪
বনফুল ৩য় সর্গ	„	১২৮২ চৈত্র	বনফুল
প্রলাপ	„	১২৮৩ বৈশাখ	ব র ৪
বনফুল ৪র্থ-৫ম সর্গ	„	১২৮৩ জ্যৈষ্ঠ	বনফুল
বনফুল ৬ষ্ঠ সর্গ	„	১২৮৩ শ্রাবণ	„
বনফুল ৭ম সর্গ	„	১২৮৩ ভাদ্র	„
বনফুল ৮ম সর্গ	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	১২৮৩ কার্তিক	বনফুল
ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী	„	„	র ব ১৫
মেঘনাদবধ কাব্য	ভারতী	১২৮৪ শ্রাবণ	„
ভিখারিণী	„	„	র র ৭
হিমালয়	„	১২৮৪ ভাদ্র	
মেঘনাদবধ কাব্য	„	„	র র ১৫
ভিখারিণী	„	„	র র ৭
মেঘনাদবধ কাব্য	„	১২৮৪ আশ্বিন	র র ১৫
আগমনী	„	„	
ভানুসিংহের কবিতা	„	„	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
করুণা	„	„	র র ৮
উৎসর্গ-গীতি	„	„	রবিচ্ছায়া
মেঘনাদবধ কাব্য	„	১২৮৪ কার্তিক	র র ১৫

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
করুণা	ভারতী	১২৮৪ কার্তিক	র র ৮
ঝান্সীর রাণী	„	১২৮৪ অগ্রহায়ণ	ইতিহাস
ভানুসিংহের কবিতা	„	„	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
করুণা	„	„	র র ৮
ছিন্ন লতিকা	„	„	শৈশব সঙ্গীত
কবি-কাহিনী	„	১২৮৪ পৌষ	কবি-কাহিনী
মেঘনাদবধ কাব্য	„	„	র র ১৫
করুণা	„	„	র র ৮
ভানুসিংহের কবিতা	„	„	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব	„	১২৮৪ মাঘ	
বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য	„	„	
ভারতী বন্দনা	„	„	শৈশব সঙ্গীত
কবি-কাহিনী	„	„	কবি-কাহিনী
সম্পাদকের বৈঠকে	„	„	
ভানুসিংহের কবিতা	„	„	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
কবি-কাহিনী	„	১২৮৪ ফাল্গুন	কবি-কাহিনী
মেঘনাদবধ কাব্য	„	„	র র ১৫
করুণা	„	„	র র ৮
ভানুসিংহের কবিতা	„	„	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
কবি-কাহিনী	„	১২৮৪ চৈত্র	কবি-কাহিনী
সান্ত্বনা	„	„	
করুণা	„	„	র র ৮
ভানুসিংহের কবিতা	„	„	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
„	„	১২৮৫ বৈশাখ	„

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সামুদ্রিক জীব	ভারতী	১২৮৫ বৈশাখ	
করুণা	”	”	র র ৮
ইংরাজদিগের আদবকায়দা	”	১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ	
করুণা	”	”	”
দিক্‌বালা	”	১২৮৫ আষাঢ়	শৈশব সঙ্গীত
সম্পাদকের বৈঠকে	”	”	
করুণা	”	১২৮৫ শ্রাবণ	র র ৮
প্রতিশোধ	”	”	শৈশব সঙ্গীত
স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙলো-স্যাকসন সাহিত্য	”	”	
বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য	”	১২৮৫ ভাদ্র	
করুণা	”	”	র র ৮
কবিতাপুস্তক	”	”	
পিত্রার্কা ও লরা	”	১২৮৫ আশ্বিন	
লীলা	”	”	শৈশব সঙ্গীত
গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ	”	১২৮৫ কার্তিক	
ফুলবালা	”	”	”
নর্ম্যান্ জাতি ও আঙ্গলো নর্ম্যান সাহিত্য	”	১২৮৫ ফাল্গুন	
অপ্সরা-প্রেম	”	”	”
ভানুসিংহের কবিতা	”	১২৮৬ বৈশাখ	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	”	”	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
নর্ম্যান্ জাতি ও আঙ্গলো নর্ম্যান সাহিত্য	”	১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ	
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	”	”	”

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	ভারতী	১২৮৬ আষাঢ়	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
ভগ্ন তরী	„	„	শৈশব সঙ্গীত
চ্যাটার্টন—বালক কবি	„	„	
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	„	১২৮৬ শ্রাবণ	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
„	„	১২৮৬ ভাদ্র	„
ভাসিয়ে দে তরী	„	„	গীতবিতান
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	„	১২৮৬ আশ্বিন	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
„	„	১২৮৬ কার্তিক	„
সম্পাদকের বৈঠক	„	„	„
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	„	১২৮৬ অগ্রহায়ণ	„
„	„	১২৮৬ পৌষ	„
প্রেম-মরীচিকা	„	১২৮৬ ফাল্গুন	শৈশব সঙ্গীত
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	„	„	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
ভানুসিংহের কবিতা	„	১২৮৭ বৈশাখ	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	„	„	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
দুর্দিন	„	১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ	সন্ধ্যা সঙ্গীত
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র	„	„	য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
„	„	১২৮৭ আষাঢ়	„
„	„	১২৮৭ শ্রাবণ	„
বাঙ্গালি কবি নয়	„	১২৮৭ ভাদ্র	সমালোচনা
কামিনী ফুল	„	„	শৈশব সঙ্গীত

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
বাঙ্গালি কবি নয় কেন ?	ভারতী	১২৮৭ আশ্বিন	সমালোচনা
শরতে প্রকৃতি	”	”	প্রভাত সঙ্গীত
অকারণ কষ্ট	”	”	
হর-হৃদে কালিকা	”	”	শৈশব সঙ্গীত
সম্পাদকের বৈঠক/ডাকিনী, ম্যাক্‌বেথ্‌	”	”	ব র ১৫
ভগ্ন হৃদয়	”	১২৮৭ কার্তিক	ভগ্ন হৃদয়
”	”	১২৮৭ অগ্রহায়ণ	”
ভানুসিংহের কবিতা	”	”	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
গোলাপ-বালা	”	”	শৈশব সঙ্গীত
ভগ্ন হৃদয়	”	১২৮৭ পৌষ	ভগ্ন হৃদয়
পথিক	”	”	শৈশব সঙ্গীত
শীত	”	১২৮৭ মাঘ	প্রভাত সঙ্গীত
ভগ্ন হৃদয়	”	”	ভগ্ন হৃদয়
”		১২৮৭ ফাল্গুন	”
দুঃখ আবাহন	”	”	সন্ধ্যা সঙ্গীত
বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা	”	১২৮৮ বৈশাখ	সমালোচনা
জুতা ব্যবস্থা	”	১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ	
সঙ্গীত ও ভাব	”	”	সঙ্গীত
তারকার আত্মহত্যা	”	”	সন্ধ্যা সঙ্গীত
যথার্থ দোসর	”	”	
গোলাম চোর	”	১২৮৮ আষাঢ	
সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা	”	”	সঙ্গীত
জাপানের বর্তমান উন্নতি	”	”	প্রবন্ধের অন্তর্গত জাপানী কবিতার বাংলা অনুবাদ। কড়ি ও কোমল।

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সুখের বিলাপ	ভারতী	১২৮৮ আষাঢ়	সন্ধ্যা সঙ্গীত
নিমন্ত্রণ সভা	„	„	
সম্পাদকের বৈঠক	„	„	প্রভাত সঙ্গীত এবং কড়ি ও কোমল
কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন	„	১২৮৮ শ্রাবণ	সমালোচনা
আশার নৈরাশ্য	„	„	সন্ধ্যা সঙ্গীত
প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (বিদ্যাপতি)	„	„	
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়	„	„	
বিবিধ প্রসঙ্গ	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
ভানুসিংহের কবিতা	„	„	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
শিশির	„	১২৮৮ ভাদ্র	সন্ধ্যা সঙ্গীত
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ উত্তর-প্রত্যুত্তর	„	„	
বিবিধ প্রসঙ্গ	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
ডি প্রোফণ্ডিস্	„	১২৮৮ আশ্বিন	সমালোচনা
বিবিধ প্রসঙ্গ	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	১২৮৮ কার্তিক	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
পরাজয় সঙ্গীত	„	„	সন্ধ্যা সঙ্গীত
সম্পাদকের বৈঠক	„	„	কড়ি ও কোমল
বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট	„	„	
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	১২৮৮ অগ্রহায়ণ	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি	„	„	
গান সমাপন	„	„	সন্ধ্যা সঙ্গীত
এক চোখো সংস্কার	„	১২৮৮ পৌষ	সমালোচনা
কবিতা সাধনা	„	„	সন্ধ্যা সঙ্গীত [গান আরম্ভ]

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
বিবিধ প্রসঙ্গ	ভারতী	১২৮৮ পৌষ	বিবিধ প্রসঙ্গ
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	„	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
„	„	১২৮৮ মাঘ	„
সঙ্গীত ও কবিতা	„	„	সমালোচনা
বিবিধ প্রসঙ্গ	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
মহাস্বপ্ন	„	„	প্রভাত সঙ্গীত
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	১২৮৮ ফাল্গুন	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
বধিরতার সুখ	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
সংগ্রাম সঙ্গীত	„	„	সন্ধ্যা সঙ্গীত
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি	„	„	সমালোচনা
বন্ধুত্ব ও ভালবাসা	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
আদর্শ প্রেম	„	„	„ „
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়	„	১২৮৮ চৈত্র	প্রভাত সঙ্গীত
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	„	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
বিবিধ প্রসঙ্গ	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	১২৮৯ বৈশাখ	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
আমি হারা	„	„	সন্ধ্যা সঙ্গীত
বিবিধ প্রসঙ্গ	„	„	বিবিধ প্রসঙ্গ
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
বিজ্ঞতা	„	„	সমালোচনা
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	১২৮৯ আষাঢ়	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
বসন্ত রায়	„	১২৮৯ শ্রাবণ	সমালোচনা
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	„	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
মেঘনাদবধ-কাব্য	„	১২৮৯ ভাদ্র	সমালোচনা
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	„	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট
প্রত্যুত্তর	„	„	
অনন্ত মরণ	„	১২৮৯ আশ্বিন	প্রভাত সঙ্গীত
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	„	„	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	ভারতী	১২৮৯ অগ্রহায়ণ	প্রভাত সঙ্গীত
প্রভাত উৎসব	"	১২৮৯ পৌষ	"
অনন্ত জীবন	তত্ত্ববোধিনী	১৮০৪ শক পৌষ (১২৮৯)	"
পুনর্মিলন	ভারতী	১২৮৯ চৈত্র	"
স্রোত	তত্ত্ববোধিনী	১৮০৫ শক বৈশাখ (১২৯০)	"
সাধ	ভারতী	১২৯০ বৈশাখ	"
ভানুসিংহের কবিতা	"	১২৯০ জ্যৈষ্ঠ	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
নিশীথ চেতনা	"	১২৯০ আষাঢ়	ছবি ও গান
নিশীথ জগৎ	"	১২৯০ শ্রাবণ	"
কে ?	"	১২৯০ ভাদ্র	"
যোগী	"	১২৯০ আশ্বিন	"
মধুর স্মৃতি	"	১২৯০ কার্তিক	" [সুখের স্মৃতি]
পূর্ণিমায়	"	১২৯০ পৌষ	ছবি ও গান
অকাল কুষ্মাণ্ড	"	১২৯০ চৈত্র	
বিবিধ প্রসঙ্গ / ধর্ম	"	"	আলোচনা
ডুব দেওয়া	"	১২৯১ বৈশাখ	"
সৌন্দর্য ও প্রেম	"	১২৯১ আষাঢ়	"
কথাবার্তা / সন্ধ্যাবেলায়	"	১২৯১ শ্রাবণ	"
সরোজিনী প্রয়াণ	"	"	বিচিত্র প্রবন্ধ
বিদেশী ফুলের গুচ্ছ	"	"	কড়ি ও কোমল
ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী	নবজীবন	"	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৩৭৬ সংস্করণ
আত্মা	তত্ত্ববোধিনী	১৮০৬ শক শ্রাবণ (১২৯১)	আলোচনা

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সরোজিনী প্রয়াণ	ভারতী	১২৯১ ভাদ্র	বিচিত্র প্রবন্ধ
হাতে কলমে	"	১২৯১ ভাদ্র-আশ্বিন	
যোগিয়া	"	১২৯১ কার্তিক	কড়ি ও কোমল
বৈষ্ণব কবির গান	নবজীবন	"	আলোচনা
কাঙালিনী	প্রচার	"	কড়ি ও কোমল
একটি পুরাতন কথা	ভারতী	১২৯১ অগ্রহায়ণ	সমালোচনা
শরতের শুকতারা	"	"	কড়ি ও কোমল
সরোজিনী প্রয়াণ	"	"	বিচিত্র প্রবন্ধ
রাজপথের কথা	নবজীবন	"	গল্পগুচ্ছ
ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি	প্রচার	"	কড়ি ও কোমল
কৈফিয়ৎ	ভারতী	১২৯১ পৌষ	
কোথায়	"	"	"
রামমোহন রায়	"	১২৯১ মাঘ	রামমোহন রায়
মথুরায়	প্রচার	"	কড়ি ও কোমল
উপকথা	ভারতী	১২৯১ ফাল্গুন	"
বিদায়	"	১২৯১ চৈত্র	"
			[পুরাতন]
পত্র/শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু	সঞ্জীবনী	১২৯১-১২৯২ (?)	কড়ি ও কোমল
নূতন	ভারতী	১২৯২ বৈশাখ	"
পুষ্পাঞ্জলি	"	"	জীবনস্মৃতি: গ্রন্থ-পরিচয়
রসিকতার ফলাফল	"	"	ব্যঙ্গকৌতুক
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর	বালক	"	কড়ি ও কোমল
কাজের লোক কে?	"	"	ইতিহাস
মুকুট	"	"	মুকুট
গুটিকত গল্প	"	"	
ফুলের ঘা	"	"	কড়ি ও কোমল ২য় সংস্করণ

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
বিবিধ প্রসঙ্গ	ভারতী	১২৯২ জ্যৈষ্ঠ	
মা লক্ষ্মী	বালক	"	শিশু
লাঠির উপর লাঠি	"	"	
মুকুট	"	"	মুকুট
চিরঞ্জীবেষু	"	"	চিঠিপত্র
হেঁয়ালি নাট্য	"	"	হাস্যকৌতুক
সাত ভাই চম্পা	"	১২৯২ আষাঢ়	শিশু
দশদিনের ছুটি	"	"	বিচিত্র প্রবন্ধ [ছোটনাগপুর]
রাজর্ষি	"	"	রাজর্ষি
শ্রীচরণেষু	"	"	চিঠিপত্র
হেঁয়ালি নাট্য	"	"	হাস্যকৌতুক
আকবর সাহের উদারতা	"	"	
সাকার ও নিরাকার উপাসনা	ভারতী	১২৯২ শ্রাবণ	আধুনিক সাহিত্য
শাস্তি	"	"	কড়ি ও কোমল
ন্যায় ধর্ম	বালক	"	
বীরগুরু	"	"	ইতিহাস
হাসিরাশি	"	"	শিশু
রাজর্ষি	"	"	রাজর্ষি
চিরঞ্জীবেষু	"	"	চিঠিপত্র
বর্ষার চিঠি	"	"	
হেঁয়ালি নাট্য	"	"	হাস্যকৌতুক
পুরোনো বট	"	১২৯২ ভাদ্র	শিশু
রাজর্ষি	"	"	রাজর্ষি
শ্রীচরণেষু	"	"	চিঠিপত্র
হেঁয়ালি নাট্য	"	"	হাস্যকৌতুক
বাঙ্গালা উচ্চারণ	"	১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক	শব্দতত্ত্ব
রাজর্ষি	"	"	রাজর্ষি

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
চিরঞ্জীবেষু	বালক	১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক	চিঠিপত্র
হেঁয়ালি নাট্য	„	„	হাস্যকৌতুক
আকুল আহ্বান	„	„	শিশু
রুদ্ধ গৃহ	„	„	বিচিত্র প্রবন্ধ
বরফ পড়া	„	„	
শিখ স্বাধীনতা	„	„	ইতিহাস
বৈজ্ঞানিক সংবাদ	„	„	
রাজর্ষি	„	১২৯২ অগ্রহায়ণ	রাজর্ষি
পথপ্রান্তে	„	„	বিচিত্র প্রবন্ধ
শিউলি ফুলের গাছ	„	„	
হেঁয়ালি নাট্য	„	„	হাস্যকৌতুক
একটি প্রশ্ন	„	„	শব্দতত্ত্ব
রাজর্ষি	„	১২৯২ পৌষ	রাজর্ষি
লাইব্রেরী	„	„	বিচিত্র প্রবন্ধ
আহ্বান গীত	„	„	কড়ি ও কোমল
উত্তর প্রত্যুত্তর : 'রুদ্ধগৃহ'	„	„	র র ৫ (বিশ্বভারতী) গ্রন্থপরিচয়
শ্রীচরণেষু	„	„	চিঠিপত্র
হেঁয়ালি নাট্য	„	„	হাস্যকৌতুক
রাজর্ষি	„	১২৯২ মাঘ	রাজর্ষি
হেঁয়ালি নাট্য	„	„	হাস্যকৌতুক
চিরঞ্জীবেষু	„	„	চিঠিপত্র
পত্র/সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ—	ভারতী	১২৯২ ফাল্গুন	কড়ি ও কোমল
চিঠি	বালক	„	„
সংজ্ঞা বিচার	„	„	শব্দতত্ত্ব
ভেঞ্চে পিঁপড়ের মন্তব্য	„	১২৯২ চৈত্র	ব্যঙ্গকৌতুক
বানরের শ্রেষ্ঠত্ব	„	„	
জন্মতিথির উপহার	„	„	শিশু [উপহার]
শ্রীচরণেষু	„	„	চিঠিপত্র

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
চিরঞ্জীবেষু	বালক	১২৯২ চৈত্র	চিঠিপত্র
সত্য	"	"	
অবসাদ (বাল্যকালের লেখা)	"	"	র র ৪
হেঁয়ালি নাট্য	"	"	হাস্যকৌতুক
কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন	"	"	
হেঁয়ালি নাট্য	ভারতী ও বালক	১২৯৩ বৈশাখ	"
আশীর্বাদ	"	"	কড়ি ও কোমল
চিরদিন	"	১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ	"
পাখীর পালক	"	১২৯৩ শ্রাবণ	"
সত্য (১)	তত্ত্ববোধিনী	১৮০৮ শক শ্রাবণ (১২৯৩)	"
সত্য (২)	"	"	"
বিরহীর পত্র	ভারতী ও বালক	১২৯৩ ভাদ্র	"
হেঁয়ালি নাট্য	"	১২৯৩ আশ্বিন	হাস্যকৌতুক
কত রচিব শয়ন	"	"	" [বিরহ]
নাসিক হইতে/খুড়ার পত্র	"	"	প্রহাসিনী : সংযোজন
হেঁয়ালি নাট্য	"	১২৯৩ কার্তিক	হাস্যকৌতুক
"	"	১২৯৩ ফাল্গুন	"
কাব্য/স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট	"	১২৯৩ চৈত্র	সাহিত্য : সংযোজন
হেঁয়ালি নাট্য	"	"	হাস্যকৌতুক
আগে চল্	"	১২৯৪ বৈশাখ	গীতবিতান
প্রাণ সমর্পণ	"	"	"
সাহিত্যের উদ্দেশ্য	"	"	সাহিত্য : সংযোজন
সাহিত্য ও সভ্যতা	"	"	"
হেঁয়ালি নাট্য	"	"	হাস্যকৌতুক
পত্র (বাসস্থান পরিবর্তন উপলক্ষে)	"	"	মানসী
বিফল মিলন	"	১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ	মানসী [বিরহানন্দ]

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
এসেছি ভুলে	ভারতী ও বালক	১২৯৪ আষাঢ়	মানসী [ভুলে]
হেঁয়ালি নাট্য	„	„	হাস্যকৌতুক : সংযোজন
নূতন প্রেম	„	১২৯৪ শ্রাবণ	হাস্যকৌতুক [শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা]
আলস্য ও সাহিত্য	„	„	সাহিত্য : সংযোজন
মগ্ন তরী	„	„	মানসী [সিন্ধুতরঙ্গ]
হিন্দু বিবাহ	„	১২৯৪ আশ্বিন	সমাজ
শ্রাবণে পত্র	„	„	মানসী [শ্রাবণের পত্র]
জীবন মধ্যাহ্ন	„	১২৯৬ বৈশাখ	মানসী
রমা বাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র	„	১২৯৬ আষাঢ়	সমাজ
নব্যবঙ্গের আন্দোলন	„	১২৯৬ আশ্বিন	
মন্ত্রি অভিষেক	„	১২৯৭ বৈশাখ	মন্ত্রি অভিষেক
দেনাপাওনা	হিতবাদী	১২৯৮	গল্পগুচ্ছ
পোস্টমাস্টার	„	„	„
গিন্নি	„	„	„
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	„	„	„
ব্যবধান	„	„	„
তারাপ্রসন্নের কীর্তি	„	„	„
অকালবিবাহ	„	„	
লেখার নমুনা	সাহিত্য	১২৯৮ কার্তিক	ব্যঙ্গকৌতুক
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	সাধনা	১২৯৮ অগ্রহায়ণ	„
সাময়িক সারসংগ্রহ	„	„	
ক. মণিপুরের বর্ণনা			
খ. আমেরিকার সমাজচিত্র			
গ. পৌরাণিক মহাবিপ্লব			
ঘ. মুসলমান মহিলা			সমাজ

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
ঙ. প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব	সাধনা	১২৯৮ অগ্রহায়ণ	
বৈজ্ঞানিক সংবাদ	„	„	
ক. গতিনির্ণয়ের ইন্দ্রিয়			
খ. ইচ্ছামৃত্যু			
গ. মাকড়শা সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব			
ঘ. উটপক্ষীর লাথি			
বাগান	„	„	পাঠপ্রচয় তৃতীয় খণ্ড
যাত্রা আরম্ভ / য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী	„	„	য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	„	„	
ক. ভারতী			
খ. নব্যভারত			
গ. সাহিত্য			
মেঘদূত	সাহিত্য	„	প্রাচীন সাহিত্য
সম্পত্তি সমর্পণ	সাধনা	১২৯৮ পৌষ	গল্পগুচ্ছ
রোগশত্রু ও দেহ-রক্ষক সৈন্য	„	„	পাঠ-সঞ্চয়
সাময়িক সারসংগ্রহ	„	„	
ক. ক্ষিপ্ত রমণী-সম্প্রদায়			
খ. সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য			
গ. ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ			
আমার সহযাত্রী / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	„	„	য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
প্রাচ্য সমাজ	সাধনা	১২৯৮ পৌষ	সমাজ
বৈজ্ঞানিক সংবাদ	”	”	
ক. জীবনের শক্তি			
খ. ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা			
গ. মানবশরীর			
আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ-বাবুর মত	”	”	”
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	”	”	
ক. নব্যভারত			
খ. সাহিত্য			
দালিয়া	”	১২৯৮ মাঘ	গল্পগুচ্ছ
কর্মের উমেদার	”	”	সমাজ
তরী পরিবর্তন / যুরোপযাত্রীর ডায়ারী	”	”	যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
সাময়িক সারসংগ্রহ	”	”	
ক. স্ত্রী-মজুর			
খ. প্রাচীন পুথি উদ্ধার			
গ. ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্			
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	”	”	
ক. নব্যভারত			
খ. সাহিত্য			
গ. সাহিত্য ও বিজ্ঞান			
কঙ্কাল	”	১২৯৮ ফাল্গুন	গল্পগুচ্ছ
মীমাংসা	”	”	ব্যঙ্গকৌতুক
আলোচনা / পত্র	”	”	সাহিত্য
লোহিত সমুদ্রে / যুরোপযাত্রীর ডায়ারী	”	”	যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সাময়িক সারসংগ্রহ	সাধনা	১২৯৮ ফাল্গুন	
ক. আমেরিকানের রক্ত-পিপাসা			
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	„	„	
ক. সাহিত্য			
কাব্য	„	১২৯৮ চৈত্র	সাহিত্য
মুক্তির উপায়	„	„	গল্পগুচ্ছ
বিদ্যাপতির রাধিকা	„	„	আধুনিক সাহিত্য
সাময়িক সারসংগ্রহ	„	„	
ক. উন্নতি			
খ. সুখদুঃখ			
ভূমধ্য সাগরে / যুরোপযাত্রীর ডায়ারী	„	„	যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	„	„	
ক. নব্য ভারত			
খ. সাহিত্য			
নিছনি / উত্তর	„	„	শব্দতত্ত্ব
বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা	„	১২৯৯ বৈশাখ	সাহিত্য
ত্যাগ	„	„	গল্পগুচ্ছ
রেলপথের দুই পার্শ্বে / যুরোপ যাত্রীর ডায়ারী	„	„	যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
সাহিত্য / পত্রোত্তর	„	„	সাহিত্য
বিম্ববতী	„	„	সোনার তরী
হাইনের কবিতা / জর্মান্ হইতে অনুবাদিত	„	„	
১. স্বপ্ন দেখেছিনু			

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
২. আঁখি পানে যবে	সাধনা	১২৯৯ বৈশাখ	
৩. প্রথমে আশা-হত হয়েছিনু			
৪. নীল বায়লেট নয়ন দুটি			
৫. গানগুলি মোর বিষে ঢালা			
৬. তুমি একটি ফুলের মত মণি			
৭. রাণি তোর ঠোঁট দুটি মিঠি			
৮. বারেক ভালবেসে			
৯. বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা			
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	„	„	
ক. নব্যভারত			
খ. সাহিত্য			
আদিম আর্য-নিবাস	„	১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ	সমাজ
একরাত্রি	„	„	গল্পগুচ্ছ
প্যারিস হইতে লণ্ডনে / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	„	„	য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
শৈশব সন্ধ্যা	„	„	সোনার তরী
সাময়িক সারসংগ্রহ	„	„	
ক. সোশ্যালিজ্‌ম্‌			
পহুঁ	„	„	শব্দতত্ত্ব
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	„	„	
ক. নব্যভারত			

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
খ. সাহিত্য	সাধনা	১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ	
রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে	„	১২৯৯ আষাঢ়	সোনার তরী
একটা আষাঢ়ে গল্প	„	„	গল্পগুচ্ছ
চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব	„	„	
লণ্ডনে / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	„	„	য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
সাহিত্যের প্রাণ	„	„	সাহিত্য
আদিম সম্বল	„	„	সমাজ
স্বরবর্ণ ‘অ’	„	„	শব্দতত্ত্ব
সোনার বাঁধন	সাহিত্য	„	সোনার তরী
হিং টিং ছট্ / স্বপ্নমঙ্গল	সাধনা	১২৯৯ শ্রাবণ	„
বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ	„	„	ছন্দ
ভাসমান / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	„	„	য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
জীবিত ও মৃত	„	„	গল্পগুচ্ছ
ঠাকুরঘর	„	„	
পহুঁ / প্রত্যুত্তর	„	„	শব্দতত্ত্ব
সাময়িক সারসংগ্রহ	„	„	
ক. সার লেপেন্ গ্রিফিন্			রাজা প্রজা
নব্য লয়তত্ত্ব	সাহিত্য	১২৯৯ ভাদ্র	
স্বর্ণমৃগ	সাধনা	১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন	গল্পগুচ্ছ
পরশ পাথর	„	„	সোনার তরী
জাহাজের কাহিনী/য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী	„	„	য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
মানব প্রকাশ	„	„	সাহিত্য
রীতিমত নভেল	„	„	গল্পগুচ্ছ

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ক. নব্যভারত খ. সাহিত্য	সাধনা	১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন	
নিষ্ফল চেষ্টা	ভারতী ও বালক	১২৯৯ আশ্বিন	
সফলতার দৃষ্টান্ত	„	„	
জয় পরাজয়	সাধনা	১২৯৯ কার্তিক	গল্পগুচ্ছ
যাত্রা সমাপন/য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী	„	„	য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি
স্বরবর্ণ 'এ'	„	„	শব্দতত্ত্ব
ক্ষ্যাপার প্রতি	ভারতী ও বালক	„	গীতবিতান
একটি পত্র	সাহিত্য	„	
কাবুলিওয়ালা	সাধনা	১২৯৯ অগ্রহায়ণ	গল্পগুচ্ছ
যেতে নাহি দিব	„	„	সোনার তরী
টা টো টে	„	„	শব্দতত্ত্ব
সারসংগ্রহ/প্রাচীন শূন্যবাদ	„	„	
নরনারী	ভারতী ও বালক	„	সোনার তরী [দুই পাখী]
শিক্ষার হেরফের	সাধনা	১২৯৯ পৌষ	শিক্ষা
ছুটি	„	„	গল্পগুচ্ছ
তোমরা এবং আমরা	„	„	সোনার তরী [তোমরা ও আমরা]
কড়ায়-কড়া কাহন-কানা	„	„	সমাজ [অত্যাচারের অত্যাচার]
গান	ভারতী ও বালক	„	গীতবিতান
বাঙ্গলা লেখক	সাধনা	১২৯৯ মাঘ	সাহিত্য
ডায়ারি/ভূমিকা	„	„	পঞ্চভূত
উক্ত প্রবন্ধ [সুখ না দুঃখ] সম্বন্ধে বক্তব্য	„	„	

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
সুভা	সাধনা	১২৯৯ মাঘ	গল্পগুচ্ছ
মহামায়া	"	১২৯৯ ফাল্গুন	"
বৈষ্ণব কবিতা	"	"	সোনার তরী
পঞ্চভূতের ডায়ারি	"	"	পঞ্চভূত
প্রসঙ্গ কথা : সমুদ্রযাত্রা	"	"	সমাজ
দান প্রতিদান	"	১২৯৯ চৈত্র	গল্পগুচ্ছ
ডায়ারি	"	"	পঞ্চভূত
সভাভঙ্গ	"	"	কাহিনী [গানভঙ্গ]
[পত্র] প্রত্যুত্তর	"	"	শব্দতত্ত্ব
‘সাহিত্য’-পাঠকের প্রতি	"	"	
সম্পাদক	"	১৩০০ বৈশাখ	গল্পগুচ্ছ
সমুদ্রের প্রতি	"	"	সোনার তরী
ডায়ারি	"	"	পঞ্চভূত
রবীন্দ্রবাবুর পত্র	সাহিত্য	"	
আকাশের চাঁদ	সাধনা	১৩০০ জ্যৈষ্ঠ	সোনার তরী
পয়সার লাঞ্ছনা	"	"	ব্যঙ্গকৌতুক
মধ্যবর্তিনী	"	"	গল্পগুচ্ছ
সাময়িক সারসংগ্রহ	"	"	
ক. পরিবারাশ্রম			পাঠ-সঞ্চয়
খ. উদয়াস্তে চন্দ্র সূর্য			
ডায়ারি	"	"	পঞ্চভূত
প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ	"	১৩০০ আষাঢ়	ব্যঙ্গকৌতুক
অসম্ভব গল্প	"	"	গল্পগুচ্ছ
সোনার তরী	"	"	সোনার তরী
সাময়িক সারসংগ্রহ	"	"	
ক. অভ্যাসজনিত পরিবর্তন			পাঠ-সঞ্চয়

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
প্রসঙ্গ কথা : শিক্ষা সংকট	সাধনা	১৩০০ আষাঢ়	শিক্ষা [শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি]
শাস্তি	„	১৩০০ শ্রাবণ	গল্পগুচ্ছ
হৃদয় যমুনা	„	„	সোনার তরী
পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি	„	„	পঞ্চভূত
পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি	„	১৩০০ ভাদ্র	„
সাময়িক সারসংগ্রহ	„	„	
ক. মানুষ সৃষ্টি			পাঠ সঞ্চয়
খ. ওলাউঠার বিস্তার			
গ. জিব্রল্টার বর্জন			
ঘ. ঈশ্বর			
ভরা ভাদরে	„	„	সোনার তরী
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	„	„	গল্পগুচ্ছ
সমাপ্তি	„	১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক	„
ডায়ারি	„	„	পঞ্চভূত
ইংরাজ ও ভারতবাসী	„	„	রাজা প্রজা
সুখ	„	„	চিত্রা
সমস্যা-পূরণ	„	১৩০০ অগ্রহায়ণ	গল্পগুচ্ছ
তুলনায় সমালোচনা	„	„	সোনার তরী [কণ্টকের কথা]
কর্তব্যনীতি / অধ্যাপক হাক্স্লির মত	„	১৩০০ পৌষ	সমাজ
বিনিপয়সায় ভোজ	„	„	ব্যঙ্গকৌতুক
ইংরাজের আতঙ্ক	„	„	রাজা প্রজা
নিরুদ্দেশ যাত্রা	„	„	সোনার তরী
বিদায় অভিশাপ	„	১৩০০ মাঘ	বিদায় অভিশাপ
প্রেমের অভিষেক	„	১৩০০ ফাল্গুন	চিত্রা
রাজসিংহ	„	১৩০০ চৈত্র	আধুনিক সাহিত্য

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
এবার ফিরাও মোরে	সাধনা	১৩০০ চৈত্র	চিত্রা
রাজনীতির দ্বিধা	"	"	রাজা প্রজা
নববর্ষে	"	১৩০১ বৈশাখ	চিত্রা [নববর্ষা]
বঙ্কিমচন্দ্র	"	"	আধুনিক সাহিত্য
মৃত্যুর পরে	"	১৩০১ জ্যৈষ্ঠ	চিত্রা
শোকসভা	"	"	আধুনিক সাহিত্য
বিহারীলাল	"	১৩০১ আষাঢ়	"
রাজা ও প্রজা	"	১৩০১ শ্রাবণ	রাজা প্রজা
সাহিত্যের গৌরব	"	"	সাহিত্য
বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য	"	"	সমাজ
অনধিকার প্রবেশ	"	"	গল্পগুচ্ছ
অপমানের প্রতিকার	"	১৩০১ ভাদ্র	রাজা প্রজা
বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা	"	"	
অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি	"	"	ব্যঙ্গকৌতুক
মেঘ ও রৌদ্র	"	১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক	গল্পগুচ্ছ
অন্তর্যামী	"	"	চিত্রা
মেয়েলি ছড়া	"	"	লোকসাহিত্য [ছেলেভুলানো ছড়া]
স্বর্গীয় প্রহসন	"	"	ব্যঙ্গকৌতুক
ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ	"	"	পাঠ-সঞ্চয়
সাধনা	"	১৩০১ অগ্রহায়ণ	চিত্রা
প্রায়শ্চিত্ত	"	"	গল্পগুচ্ছ
সুবিচারের অধিকার	"	"	রাজা প্রজা
কাব্যের তাৎপর্য	"	"	পঞ্চভূত
ফুলজানি	"	"	আধুনিক সাহিত্য
আর্য গাথা	"	"	"
বিচারক	"	১৩০১ পৌষ	গল্পগুচ্ছ
নূতন অবতার	"	"	ব্যঙ্গকৌতুক

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
কৌতুকহাস্য	সাধনা	১৩০১ পৌষ	পঞ্চভূত
সঞ্জীবচন্দ্র : পালামৌ	„	„	আধুনিক সাহিত্য
নিশীথে	„	১৩০১ মাঘ	গল্পগুচ্ছ
সন্ধ্যা	„	„	চিত্রা
সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ	„	„	পঞ্চভূত
আবদারের আইন	„	„	
কৃষ্ণচরিত্র	„	„	আধুনিক সাহিত্য
আপদ	„	১৩০১ ফাল্গুন	গল্পগুচ্ছ
কৃষ্ণচরিত্র	„	„	আধুনিক সাহিত্য
কৌতুকহাস্যের মাত্রা	„	„	পঞ্চভূত
ব্রাহ্মণ	„	„	কথা ও কাহিনী
গ্রন্থ সমালোচনা দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব	„	„	
দিদি	„	১৩০১ চৈত্র	গল্পগুচ্ছ
পুরাতন ভৃত্য	„	„	কাহিনী
সরলতা	„	„	পঞ্চভূত
যুগান্তর	„	„	আধুনিক সাহিত্য
মানভঞ্জন	„	১৩০২ বৈশাখ	গল্পগুচ্ছ
বাঙলা জাতীয় সাহিত্য	„	„	সাহিত্য
ঠাকুর্দা	„	১৩০২ জ্যৈষ্ঠ	গল্পগুচ্ছ
গুপ্তরত্নোদ্ধার	„	„	লোকসাহিত্য ১
জ্যোৎস্নারাত্রে	„	„	চিত্রা
প্রতিহিংসা	„	১৩০২ আষাঢ়	গল্পগুচ্ছ
দুই বিঘা জমি	„	„	কাহিনী
অপূর্ব রামায়ণ : পাঞ্চভৌতিক সভা	„	„	পঞ্চভূত
আলোচনা / জাতীয় সাহিত্য	„	„	সাহিত্য

রচনার নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গ্রন্থ
ভদ্রতার আদর্শ : পাঞ্চভৌতিক সভা	সাধনা	১৩০২ শ্রাবণ	পঞ্চভূত
ক্ষুধিত পাষাণ	"	"	গল্পগুচ্ছ
শীতে ও বসন্তে	"	"	চিত্রা
বিদ্যাসাগর-চরিত	"	১৩০২ ভা-আ-কা	চারিত্রপূজা
অতিথি	"	"	গল্পগুচ্ছ
বৈজ্ঞানিক কৌতূহল : পাঞ্চভৌতিক সভা	"	"	পঞ্চভূত
কাগজের নৌকা	মুকুল	১৩০২ আশ্বিন	শিশু
ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী	"	গল্পগুচ্ছ
স্নেহ-স্মৃতি	ভারতী	১৩০২ কার্তিক	চিত্রা

১৩০২ কার্তিক পর্যন্ত এই সূচী প্রস্তুত। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার এই কালানুক্রমিক সূচী যে পূর্ণাঙ্গ—এমন কথা জোর করে কখনই বলা যায় না। হয়তো কবির এমন কিছু কিছু রচনা এই তালিকা ছাড়াও আছে, যেগুলি তাঁর গ্রন্থে অদ্যাবধি সংকলিত হয়নি এবং যে রচনাগুলি সাময়িকপত্রে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি—যা একদা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল কিন্তু পরে আর কখনই তা গ্রন্থভুক্ত হয়নি। আমরা যথাসাধ্য সতর্কতার সঙ্গে এবং সযত্নে এই কালানুক্রমিক সূচী নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছি।[৪] তৎসত্ত্বেও আমাদের অনবধানতায় কোনো কোনো রচনার নাম হয়তো বাদ পড়ে থাকতে পারে। এই তালিকা সর্বদাই সংযোজন ও পরিবর্ধনের অপেক্ষা রাখে। কিছু লেখা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল রচনাই প্রথমে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রস্তুত তালিকা থেকে বোঝা যাবে কোন্ কোন্ সাময়িকপত্র কবিকে কি কি ধরণের লেখায় এবং কি পরিমাণ সাহিত্য-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৩০২ পর্যন্ত নির্মিত তালিকা থেকে দেখা যায় প্রকাশিত রচনার পরিমাণের দিক থেকে সাধনার দ্বিতীয় বর্ষের (১২৯৯) স্থান শীর্ষে।

৪. বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার প্রথম খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অস্বাক্ষরিত অনেকগুলি রচনা রবীন্দ্রনাথের লিখিত বলে নির্দেশ করেছেন। যে-রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের বলে কোনো প্রমাণ নেই সেগুলি আমরা এই তালিকায় গ্রহণ করিনি।

পঞ্চম অধ্যায়

"আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা
গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্র-কবিতা

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে, অর্থাৎ পত্রিকার প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায়। এই সংখ্যায় বিম্ববতী এবং জর্মান্ কবি হাইনরিখ হাইনের নয়টি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত এই কবিতাগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ কবিতাগুলি অদ্যাবধি তাঁর কোনো গ্রন্থে বা তাঁর রচনাবলীতে মুদ্রিত হয় নি। এই কবিতাগুলি যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত তা সাধনার অর্ধবার্ষিক সূচীপত্রে নির্দেশ করা আছে। পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতাগুলির শিরোদেশে লেখা 'হাইনের কবিতা জর্মান্ হইতে অনুবাদিত। যেহেতু এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে কিংবা বিশ্বভারতী বা সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে নেই, সেই হেতু কবিতাগুলি সাধনা পত্রিকা থেকে এখানে সংগ্রহ করা গেল। কবিতাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো আলোচনায় বা পুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি এগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীর বহির্ভূত থাকা অত্যন্ত পরিতাপের কথা। সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'গীতবিতান ও বিবিধ কবিতা' মুদ্রিত। এই খণ্ডের অন্তর্গত একটি বিভাগের নাম 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ'। এই গুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অনেক অনুবাদ কবিতা সংকলিত হয়েছে, কিন্তু সম্ভবত অনবধানতার কারণে সাধনার অনুবাদ-কবিতাগুলি উদ্ধার করা হয় নি।

এখানে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও পরে হাইনের মূল কবিতা সংকলিত হল। একালে অনেক কৃতবিদ্য বাঙালী জর্মান ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। মূল জর্মান কবিতাগুলি এখানে সংকলিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম কতখানি মূলানুগ হয়েছে তা বুঝতে সহায়ক হবে।

১

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নি জ্বালার
সুন্দর চুলের, সুগন্ধি মালার,
তিক্ত বচনের, মিষ্ট অধরের,
বিমুগ্ধ গানের, বিষণ্ণ স্বরের।

সে সব মিলায়ে গেছে বহুদিন,
সে স্বপ্নপ্রতিমা কোথায় বিলীন।
শুধু সে অনন্ত জলন্ত হুতাশ
ছন্দে বদ্ধ হয়ে করিতেছে বাস।

তুমিও গো যাও, হে অনাথ গান,
সে স্বপ্নছবিরে করগে সন্ধান।
দিলাম পাঠায়ে, করিতে মেলানী,
ছায়া-প্রতিমারে বায়ুময়ী বাণী।

Mir traeumte einst von wildem Liebesgluehn
Von huebschen Locken, Myrten und Resede,
Von suessen Lippen und von bittrer Rede,
Von duestrer Lieder duestern Melodien.

Verblichen und verweht sind laengest die Traeume,
Verweht ist gar mein liebstes Traumgebild!
Geblieben ist mir nur, was glutenwild
Ich einst gegossen hab in weiche Reime.

Du bliebst, verwaistes Lied! Verweh jetzt auch.
Und such das Traumbild, das mir laengst
entschwunden,
Und gruess es mir, wenn du es aufgefunden—
Dem luftgen Schatten send ich luftgen Hauch.

২

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি,
দুখ জ্বালা সব যাই ভুলি।
অধরে অধর পরশিয়া
প্রাণমন উঠে হরষিয়া।
মাথা রাখি যবে ওই বুকে
ডুবে যাই আমি মহা সুখে।
যবে বল তুমি, 'ভালবাসি',
শুনে শুধু আঁখিজলে ভাসি।

২

Wenn ich in deine Augen seh,
So schwindet all mein Leid und Weh ;
Doch wenn ich kuesse deinen Mund,
So werd ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn an deine Brust,
Kommts ueber mich wie Himmelslust ;
Doch wenn du sprichst : Ich liebe dich !
So muss ich weinen bitterlich.

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না এ বেদনা ;
তবুও কোনমতে সয়েছিনু,
কি করে যে সে কথা শুধায়ো না।

Anfangs wollt ich fast verzagen,
Und ich glaubt, ich trueg es nie ;
Und ich hab es doch getragen —
Aber fragt mich nur nicht, wie ?

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল,
রাঙা গোলাপ গাল দুখানি, সুধায় মাখা সুকোমল।
শুভ্র বিমল করকমল ফুটে আছে চিরদিন!
হৃদয়টুকু শুষ্ক শুধু পাষাণসম সুকঠিন!

৪

Die blauen Veilchen der Aeugelein,
Die roten Rosen der Waengelein,
Die weissen Liljen der Haendchen klein,
Die bluehen und bluehen noch immerfort,
Und nur das Herzchen ist verdorrt.

৫

গানগুলি মোর বিষে ঢালা;
কি হবে আর তাহা বই?
ফুটন্ত এ প্রাণের মাঝে
বিষ ঢেলেছে বিষময়ী!

গানগুলি মোর বিষে ঢালা,
কি হবে আর তাহা বই?
বুকের মধ্যে সর্প আছে,
তুমিও সেথা আছ অয়ি!

Vergiftet sind meine Lieder ;—
Wie koennt es anders sein ?
Du hast mir ja Gift gegossen
Ins bluehende Leben hinein.

Vergiftet sind meine Lieder ;—
Wie koennt es anders sein ?
Ich trage im Herzen viel Schlangen,
Und dich, Geliebte mein.

৬

তুমি একটি ফুলের মত মণি,
এমনি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর !
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর !

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশীষ মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এম্‌নি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর !

Du bist wie eine Blume,
So hold und schoen und rein ;
Ich schau dich an, und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein.
Mir ist, als ob ich die Haende
Aufs Haupt dir legen sollt,
Betend, dass Gott dich erhalte
So rein und schoen und hold.

৭

রাণি তোর ঠোঁট দুটি মিঠি,
রাণি তোর মধুমাখা দিঠি,
রাণি, তুই মণি তুই ধন,
তোর কথা ভাবি সারাক্ষণ।
দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটে কি করিয়া !
সাধ যায় তোর কাছে গিয়া
চুপিচাপি বসি এক ভিতে
ছোট ছোট সেই ঘরটিতে ;
ছোট হাত খানি হাতে ক'রে
অধরেতে রেখে দিই ধরে !

ভিজাই ফেলিয়া আঁখিজল
ছোট সে কোমল করতল।

৭

Maedchen mit dem roten Muendchen,
Mit den Aeuglein suess und klar,
Du mein liebes, kleines Maedchen,
Deiner denk ich immerdar.
Lang ist heut der Winterabend,
Und ich moechte bei dir sein,
Bei dir sitzen, mit dir schwatzen,
Im vertrauten Kaemmerlein.
An die Lippen wollt ich pressen
Deine kleine, weisse Hand,
Und mit Traenen sie benetzen,
Deine kleine, weisse Hand.

৮

বারেক ভালবেসে যে জন মজে,
দেবতাসম সেই ধন্য,
দ্বিতীয় বার পুন প্রেমে যে পড়ে
মূর্খের অগ্রগণ্য।

আমিও সে দলের মূর্খরাজ
দুবার প্রেমপাশে পড়ি ;
তপন শশী তারা হাসিয়া মরে,
আমিও হাসি—আর মরি !

৮

Wer zum ersten Male liebt,
Seis auch gluecklos, ist ein Gott ;
Aber wer zum zweiten Male
Gluecklos liebt, der ist ein Narr.

Ich, ein solcher Narr, ich liebe
Wieder ohne Gegenliebe!
Sonne, Mond und Sterne lachen,
Und ich lache mit—und sterbe.

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা!
দিবেরাত্রি আহার নিদ্রে ছেড়ে,
তপিস্তে আর লড়াই ক'রে শেষে
বশিষ্টের গাইটি নিলে কেড়ে।

বিশ্বামিত্র তোমার মত গরু
ছুটি এমন দেখিনি বিশ্বে!
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এত যুদ্ধু এত তপিস্তে!

Den koenig Wiswamitra,
Den treibts ohne Rast und Ruh,
Er will durch Kampf und Buessung
Erwerben Wasischtas kuh.

O, Koenig Wiswamitra,
O, welch ein Ochs bist du,
Dass du so viel kaempfest und buessest,
Und alles fuer eine kuh!

আমরা প্রথমেই বলেছি, সাধনায় এই কবিতাগুলির শিরোদেশে লেখা ছিল 'জর্মান্ হইতে অনুবাদিত'। এখন ছুটি প্রশ্ন। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ কি জর্মান ভাষা জানতেন, এবং দ্বিতীয়ত এই কবিতাগুলি কি মূল জর্মান্ ভাষা থেকে অনুবাদ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর—রবীন্দ্রনাথ জর্মান ভাষা জানতেন; এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—এগুলি মূল জর্মান থেকেই অনূদিত। যিনি জর্মান ভাষা জানবেন, তিনি মূলের অনুবাদ না করে অনুবাদের তর্জমা করতে যাবেন কেন?

এই অনুবাদকর্ম প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বৈশাখ মাসে। এখন প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ জর্মান ভাষা চর্চা করেছিলেন কোন্ সময়ে? এখানে বলা যায়, এই কবিতাগুলি প্রকাশের বেশ কিছু পূর্ব হতেই কবি জর্মান ভাষার সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১২৯৯ বৈশাখ, মানে ১৮৯২ এপ্রিল-মে। রবীন্দ্রনাথকে এর ঠিক দু' বৎসর পূর্বে দেখি গ্যেটের ফাউস্ত মূল জর্মান ভাষাতেই পাঠ করছেন। প্রমথ চৌধুরীকে ৩ জুন ১৮৯০ তারিখে শিলাইদহ থেকে লিখছেন, "জর্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করছি। তুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ রকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্মান ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।"[১] যিনি জর্মান ফাউস্ত একা পড়ে কাজ চালাতে পারেন তাঁর পক্ষে সরল ভাষায় রচিত হাইনের ছোট কবিতাগুলি অনুবাদ করা খুবই সহজ কাজ। বিশ্বভারতীর জর্মান ভাষার অধ্যাপক প্রণব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ-কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এই অনুবাদগুলি নানা দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। হাইনের গীতি কবিতার নিটোল রূপটি তিনি যথাযথ ধরেছেন। অনুবাদগুলি পড়লে মনেই হয় না যে, এগুলি অনুবাদ, যেন নিজস্ব রচনা, অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের এই যে, কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে মূলানুসারী, জার্মান প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনাও যথাযথভাবে বাংলায় প্রতিফলিত হয়েছে।"[২]

রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ-কবিতাগুলির সঙ্গে আমরা মূল প্রতিটি কবিতার অর্থ ও ভাব মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে আমরা হাইনের ইংরেজি অনুবাদগুলির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা মিলিয়ে দেখেছি। বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, ইংরেজি অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এক নয়। ইংরেজি অনুবাদগুলি দক্ষ অনুবাদকের আর রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ হল একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকবির। অথচ মূল থেকে রবীন্দ্রনাথ কোন সময়েই সরে যান নি। রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি মূলানুসারী ছিলেন তা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে জর্মান ভাষাভিজ্ঞ পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ যে-জর্মান বই থেকে এই কবিতাগুলি অনুবাদ করেছিলেন সেই

১. চিঠিপত্র ৫।

২. আজকের জার্মানী, বিশেষ সংখ্যা—জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭২ ফেব্রুআরি।

পুরাতন বইটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। বইটি হল 'Poetisch Werke/von/H. Heine.' ৫১শ সংস্করণ, হামবার্গ, ১৮৮৫। এটি প্রথম খণ্ড। বইয়ের মধ্যে নানা পৃষ্ঠায় কবির স্বহস্ত-লিখিত নোট আছে, এবং বইয়ের নামপত্রের মাথায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ইংরেজি স্বাক্ষর আছে। হাইনের কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ ও কবির জর্মান-চর্চা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'মূল জর্মান থেকে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ কবিতা ও অনুষঙ্গ' (দেশ ২৪ নভেম্বর ১৯৭৯) শীর্ষক প্রবন্ধে।

যে সংখ্যাতে জর্মান কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত, সেই সংখ্যাতেই সচিত্র কবিতা বিম্ববতী মুদ্রিত হয়। এই কবিতা রচনার ইতিহাস জানা যায় নলিনী দেবীকে লিখিত (২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) কবির একটি পত্রে—

"অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কী একটা কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা-তা বকে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি 'সোনার তরী'তে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলাম।"[৩]

বিম্ববতী রচিত হয়েছিল প্রকাশের দুই মাস পূর্বে, ১২৯৮ ফাল্গুনে। এই ফাল্গুনেই রচিত হয় শৈশবসন্ধ্যা, চৈত্রে রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে। শেষ দুটি কবিতা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে। বিম্ববতী এবং রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে কবিতা দুটি 'রূপকথা' নামে চিহ্নিত।

এই কবিতাগুলি রচনার সময় কবির মনের ভাব কি ছিল তা জানা যাবে সেই সময়ের লেখা একটি চিঠিতে। শিলাইদহ থেকে লিখিত চিঠির তারিখ ৮ এপ্রিল ১৮৯২, অর্থাৎ চৈত্র ১২৯৮।

"এখানে এসে আমি এত এলিমেন্ট্‌স্ অফ পলিটিক্‌স এবং প্রব্লেম্‌স্ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যতরকম

৩. সোনার তরী—রচনাপ্রসঙ্গ, ১৩৭৩ পৌষ সংস্করণ।

হিজিবিজি হাজাম। বেশ সাদাসিধে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরাম শান্তি, এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেলপাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি আম-বাগানের ঘন ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষে-ক্ষেতের গন্ধের মতো—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং সকরুণতায় পরিপূর্ণ।"[৪]

শৈশবসন্ধ্যা কবিতাটির মধ্যেও কবি বলেছেন—

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের ;

এই শৈশবসন্ধ্যা কবিতাটির ব্যাখ্যা পাই ৭ জুলাই ১৮৯৪ তারিখে সাহাজাদ-পুরের পথে লেখা কবির একটি চিঠিতে।

"সন্ধ্যেবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়া ঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জন-কতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে, রাস্তা দিয়ে স্ত্রীপুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্ত ভাব, গাছপালার ভিতর দিয়ে সব দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে ভদ্র অভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের ভীড়। আকাশে খুব নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সারবাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে

৪. ছিন্নপত্রাবলী।

লাগল — বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব ভাবের আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারে আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নীচে নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য — মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত! বৃহৎজনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে বোধ হয় এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখপরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে এবং চলবে — নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তখন মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য সেই অবিচ্ছিন্ন সুরের সঙ্গে মিলিয়ে যায় — সব-সুদ্ধ খুব একটা বৃহৎ বিস্তৃত বিষাদপূর্ণ রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার মনের ভিতরে যেরকম করছিল সে বোধ হয় বর্ণনাদ্বারা ঠিক বোঝাতে পারব না। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তার যে-একটা ধ্বনি হতে থাকে সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।"[৫]

শৈশব সন্ধ্যার পরের কবিতা রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে। বিম্ববতীর মত এটিও রূপকথা-আশ্রিত। বঙ্গদেশের একটি সুপরিচিত রূপকথা অবলম্বনে কবিতাটি রচিত। প্রচলিত রূপকথার সর্বাংশ কবি গ্রহণ করেন নি। কিছু আবার পরিবর্তনও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে-কাহিনী অবলম্বনে কবিতাটি রচনা করেছেন সেটি পুষ্পমালার রূপকথা নামে পরিচিত। মূল কাহিনীটি এইরূপ —

এক ছিল নিঃসন্তান রাজা, আর এক আঁটকুড়ে কোটাল। রাজার মনে সুখ নেই, কোটালের মনেও না। এমনি করে দিন যায়। কাউকে কিছু না বলে

৫. ছিন্নপত্রাবলী।

রানী গেলেন পুত্র-সরোবরে নাইতে। গিয়ে দেখেন অপর পারে কোটালনীও এসেছেন। রানী কোটালনীকে জিজ্ঞেস করেন, বাসনা পূর্ণ হলে কার ঘরে বাজনা বাজবে। কোটালনী বলেন, 'আমরা হলাম ক্ষুদ্র মানুষ, রানীদিদির ঘরেই বাজনা বাজবে।' রানী ভারী খুসি হলেন। আনন্দে তিনি বললেন, 'না দিদি, তা নয়, আয় আমরা সত্যি করি। সত্যি এই—যদি আমার ঘরে ছেলে হয়, তোর ঘরে মেয়ে হয়, বিয়ে দেব; আমার ঘরে ছেলে হয়, তোর ঘরে ছেলে হয়, বন্ধু পাতিয়ে দেব; আর যদি আমার ঘরে মেয়ে হয়, তোর ঘরে ছেলে হয়, তা হলেও বিয়ে দেব।' কোটালনী ভয় পেলো, বললো, 'এমন সত্যি করতে আমি পারব না।' রানী নাছোড়বান্দা, কোটালনী রানীর কথায় রাজি হল। দুজনে স্নান সেরে দু'ঘাটের দুই পদ্ম ফুল ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিলেন। ঢেউ-এ দুই পদ্ম এক হল। দুজনে উলু দিলেন। তারপর দু'জনে যে যার বাড়ি গেলেন। একথা কেউ জানল না।

রাজা গেছেন মৃগয়ায়। কোটাল গেছেন তাঁর সঙ্গে। সেখানে দুজনে বট-গাছের তলায় বসে আছেন, রাজা তীরের ফলা দিয়ে বটপাতায় লিখলেন। 'কোটালের ছেলে যদি হয়, আর আমার মেয়ে হয়, বিয়ে দেব; কোটালের মেয়ে হয়, আমার ছেলে হয়, কোটালের গর্দান নেব; কোটালের ছেলে আর আমার ছেলে হলে কোটালকে আদ্দেক রাজত্ব দেব।' বটের পাতা কোটালের হাতে দিয়ে রাজা ঘোড়া ছোটালেন।

দিন গেল। রানীর হল ক্ষীরের পুতুলের মত কন্যা, আর কোটালের হল সোনার ছেলে। রাজা মুখ নীচু করে রাজসভায় গেলেন। বাদ্যি বাজনা বাজলো কোটালের ঘরে।

কোটালের ঘরে কোটালের ছেলে যেন চন্দনের পুতুল, রাজার ঘরে রাজকন্যা যেন পুষ্প প্রতিমা।

কোটালপুত্রের নাম চন্দন, রাজকন্যার নাম পুষ্পমালা। এদের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন গুরুমশায়ের পাঠশালে এরা পড়তে গেল। রাজকন্যা সেখানে বসেন সিংহাসনে, কোটালপুত্র বসেন মাটিতে। বার বছর পরে একদিন লিখতে লিখতে রাজকন্যার হাতের কলম খসে কোটালপুত্রের আসনের কাছে পড়ে গেল। কোটালপুত্র তুলে দিলেন কলম। এখন থেকে রাজকন্যার কলম রোজ পড়ে যায়, কোটালপুত্র তুলে দেন। আটদিন পর যখন আবার কলম পড়লো এবার আর কলম তুললেন না কোটালপুত্র। উল্টে বললেন, 'কলম তুলতে পারি, যদি

মালা বদল হয়।' শুনে রাজকন্যা শিউরে উঠলেন। বললেন, 'আমার বাপের রাজ্যে বাস করে এমন কথা বলো।' কোটালপুত্র বললেন, 'আমাদের জন্যেই তো তোমার বাপের রাজ্য টিকে আছে।' কন্যা বললেন, 'তাইতো।' এমনি করে দুজনে দুজনের মনের কাছে আরো এসে গেলেন।

একদিন রানী দেখেন পুত্র-সরোবরের কোলে কোটালনী দাঁড়িয়ে কাঁদছে, আর বলছে — এই সরোবরে যে সত্য তাঁরা করেছিলেন, কেন তা মিথ্যা হয়ে গেল। রানী কোটালনীকে তিরস্কার করলেন। রাজকন্যা সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোটালমাসী কিসের সত্য করেছিলেন।' রানী তাড়াতাড়ি মেয়েকে আর দাসী বাঁদী নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

এদিকে কোটালপুত্র কোটালের কাছে সে বটপাতাটি দেখে সব জানতে পেরে হাতে তলোয়ার আর বটপাতা নিয়ে রাজার দরবারে হাজির। রাজাকে সব কথা বলাতে রাজা উত্তর দিলেন, 'তোমার যোগ্যতা দেখাও।' কোটালপুত্র রাজসভা ছেড়ে শন্‌শন করে সরোবরের জলে গিয়ে নামলেন। তিনটি পদ্মপাতা তিনটি সত্যের বটপাতা, আর তলোয়ার নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন। রাজকন্যা নাইতে এসে দেখলেন, পায়ের কাছে পদ্মের পাতে এক তলোয়ার তিন পদ্ম। রাজকন্যা ভাবলেন, মা'র প্রথম সন্তান মা পুত্র-সরোবরে সঁপে দিয়েছেন। মা'র সত্য যেন পূর্ণ হয়; ব'লে তলোয়ার তুলে নিলেন। অমনি চন্দন বটপাতা হাতে হাত ধরল। রাজকন্যা মূর্ছা খেয়ে পড়ে গেলেন। সত্যের বটপাতা রাজকন্যার আঁচলে বেঁধে দিয়ে কোটালপুত্র বাতাসে মিশে গেল। রাজকন্যার দ্বারে পাইক পাহারা দুয়ারী দাসী রানী রাজা সব ছুটে এলেন।

রাজকন্যা সব জানতে পেরে মনে মনে ঠিক করল, কোটালের ঘরই তার ঘর। গুরুমশাইকে তারা সব বললো। গুরু বললেন, 'সত্য রাখলে স্বর্গ, না রাখলে পাতাল।' তাই রাজার মান, রাজ্যের মান রাখতে তারা দুই পক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে রাজ্যের বাইরে চলে গেল।

দুদিন তিনদিন চারদিন ঘোড়া ছুটেছে। মাঠ আর শেষ হয় না। তারপর মাঠের পর এক গ্রাম মিললো। একটি বাড়ি, সেখানে এক বুড়ি থাকে। সে আসলে সাত ডাকাতের মা। এদের গায়ে হীরে জহরৎ দেখে ভাবতে লাগলো, কতক্ষণে তার ছেলেরা এসে সব লুটপাট করে নেবে। যাই হোক চন্দন আর পুষ্প সিপাইয়ের ছদ্মবেশে রইল। পুষ্প রাঁধতে গেল। চন্দন নাইতে গিয়ে বুঝলো, তাঁরা ডাকাতের হাতে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি খিচুড়ী রান্না করে পক্ষীরাজে

তাঁরা চাবুক দিলেন। বুড়ি এসে দেখে লোক নেই। বুড়ি আছাড়ি পিছাড়ি খেতে থাকে। এর আগে বুড়ি খেত সরষে প'ড়ে, দুই পুঁটলি করে দুই পক্ষীরাজের পিছন পায়ে বেঁধে, ছুঁচের ফুটো করে রেখেছিল। সিপাইরা তা জানতো না। সিপাইরা ছোটে আর পথে পথে সরষে পড়ে, আর খেতফুল হয়ে যায়। এমন সময় সাত ডাকাত বাড়ি এসেই তাদের অনুসরণ করলে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি তাদের ডাকাতেরা ধরে ফেললে। চন্দনের তলোয়ারের ঘায়ে সাত ডাকাত কাটা পড়লো। কিন্তু কাটা মুণ্ডুর মাঝে লুকিয়ে ছিল এক ডাকাত। সে দয়া ভিক্ষে করে এদের সঙ্গে সঙ্গে চললো, বললো, 'আমায় প্রাণে মেরো না, আমি ঘোড়ার ঘেসেড়া হব।' পুষ্পর প্রাণ গললো। ডাকাত তাদের সঙ্গে চললো। অসতর্ক মুহূর্তে চন্দনের মাথা কেটে নিল ডাকাত। আর পুষ্পকে ঘোড়ায় করে নিয়ে চললো। পুষ্প কৌশলে ডাকাতের মাথা কেটে নিল।

পুষ্পমালার দুঃখের শেষ নেই। বনের মধ্যে তাঁর চোখের জলে নদী হয়ে গেল। এমন সময় হর-পার্বতী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুষ্পের দুঃখ দেখে পার্বতী শিবকে অনুরোধ করলেন, চন্দনের প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে। চন্দন বেঁচে উঠলেন। পুষ্পমালা আর চন্দন আবার চলতে লাগলেন।

নিশি প্রভাতে কন্যা আর কুমার এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর এক রাজ্যে গিয়ে পড়লেন। সেখানে নদীর তীবে বাগান। ফুলে ফুলে ভর্তি। চন্দন পুষ্পের কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে লাগলেন। সেই সময় ফুলের সাজি আর ফুলের মালা নিয়ে মালি আব মালিনী বাগানে এসেছে। কন্যা আর কুমারের ওপর মালিনীর চোখ পড়ল। মালিনী এক যাদুকরী। মালিনীর যাদুতে মানুষ ছাগল ভেড়া হয়ে যায়। পুষ্পের কিছু হল না। মালিনীর যাদুতে চন্দন ছাগল হয়ে মালিনীর পিছু নিলেন।

পুষ্প কাঁদেন। তারপব চোখের জলে চোখ মুছে দুই পক্ষীরাজ হাতে ধরে রাজপুরীর দিকে গেলেন। রাজা সিপাইকে (পুষ্পকে) আট দুয়ারে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে বললেন। সেই রাজ্যে এক শঙ্খিনী অজগর ছিল। তার শঙ্খের ডাকে সমস্ত রাজ্য মূর্ছা যায়। রাজা বললেন, 'এই শঙ্খিনীকে মারতে হবে।' দু' তিন দিন কেটে গেল, রাজাকে বলে অন্য উপায় বের করলেন কন্যা। এক সরোবরে জলের তিয়াসে যখন শঙ্খিনী এল, তখন শান তলোয়ার শঙ্খিনীর ফণাচক্রে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু কন্যা দেখেন অর্ধেক সাপ, অর্ধেক সেই মালিনী। মালিনী সাপ থেকে মুক্তি পেল। এই মালিনী আর কেউ নয়, পুষ্পমালার মা;

সেই রানী যিনি তিন সত্যি ভেঙেছিলেন, সাপ হয়ে রাজ্য খাচ্ছেন, আজ তাঁর মুক্তি হল। কথা শঙ্খ রাজাকে দেখাতে বলে মালিনী সেখানে পড়ে গেল, তখন এক বনফুলের গাছ সৃষ্টি হল। রাজা তো ভারি খুশি, কন্যাকে অর্ধেক রাজত্ব দিতে চাইলেন। কন্যাকে দেখে রাজা বিস্মিত হলেন। তারপর কন্যা রাজাকে বললেন, 'মালীর কাছে এক ছাগল আছে, হাজার পাঁচেক ছাগলের হাড় আছে, তা পেলেই সব বলবো।' মালী বললো, 'সব মিথ্যে কথা।' পাইক বেয়ারারা ছুটল, কার কথা মিথ্যা জানবার জন্যে। কন্যার কথা সত্যি হল। কন্যা সব কাহিনী বললো। মালী যে সেই পূর্বের সত্য ভঙ্গকারী রাজা, তাও প্রমাণ হল। মালী কন্যার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর সেই ছাগল অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে চন্দন বেরিয়ে এল। চন্দন আর পুষ্পমালার বিয়ে হল। কিন্তু এক শর্তে দুজনে দুখানি খড়্গ নিলেন। যদি কন্যার খড়্গকে কুমার কাটাতে পারে, তবে কন্যা কুমারের হবে। কুমারের জয় হল। চন্দন পুষ্পমালা আর রাজা রানী শাপ থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন। রাজ্যে ধুমধাম পড়ে গেল। যার যার সত্য পূর্ণ হল। রাজা, কোটাল, রানী, কোটালনী পুষ্প চন্দনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর বহু দিন কেটে গেছে, এখনও পুত্র-সরোবরের জল মানুষ কলসে কলসে খায়।[৬]

উপরিউক্ত কাহিনীর কেবল প্রথম অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় গ্রহণ করেছেন, কাহিনীর শেষাংশ কবি পরিত্যাগ করেছেন। মূল কাহিনীতে দেখি গুরুমশায়ের কথা শুনে তারা দুজনে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে রাজ্যের বাইরে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঘোড়ায়-চড়ার কাহিনী অনুপস্থিত। রূপকথায় কোটালের ছেলে ও রাজার মেয়ে, রবীন্দ্রনাথের রূপকাব্যে তা রাজার ছেলে ও রাজার মেয়েতে পরিণত হয়েছে।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হল হিং টিং ছট্। এই কবিতাটিও রূপকথার পটভূমিতে রচিত। কবিতার সাব্ টাইটেল স্বপ্নমঙ্গল। রচনাকাল ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯, শান্তিনিকেতন। এই কবিতাটি কি চন্দ্রনাথ বসুকে উপলক্ষ্য করে রচিত? কবিতাটি প্রকাশের পর অনেকের মনেই সেইরূপ ধারণা হয়েছিল।

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত বাংলার লোক-সাহিত্য চতুর্থ খণ্ড—কথা গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। পূর্বোক্ত লেখকের রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "তৎকালীন লেখকদের ধারণা হইয়াছিল যে কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করিয়া রচিত; কারণ যে-মাসের সাধনায় 'হিং টিং ছট্' বাহির হয়, সেই সংখ্যায় 'চন্দ্রনাথ বসুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।"[৭] এই উদ্ধৃতির মধ্য থেকে দু-একটি তথ্য কিঞ্চিৎ সংশোধন করে নেওয়া দরকার, যদিও গুরুতর কিছু নয়। প্রথমত, হিং টিং ছট্ যে-সংখ্যায় বেরোয়, লয়তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ তার পূর্বের সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। অর্থাৎ আষাঢ় ১২৯৯এ, শ্রাবণ সংখ্যায় নয়। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধের নাম – চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ যে চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে হিং টিং ছট্ লিখেছিলেন, সমকালীন কোন্ সাক্ষে সে সংবাদ পাই?

১২৯৯ ফাল্গুনে সাহিত্য পত্রিকায় তর্কবৈচিত্র্য শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি লেখেন –

"কয়েক বৎসর অতীত হইল, বাবু চন্দ্রনাথ বসু কোনো বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বিরুদ্ধে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। চন্দ্রনাথবাবু তাহার প্রত্যুত্তর দেন। সেই অবধি চন্দ্রনাথবাবু যে কোনো বিষয়ে কোনো মত প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথবাবু সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতিবারেই তর্কের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথবাবু করিয়াছেন।...এ পর্যন্ত বাদপ্রতিবাদ গদ্যে চলিতেছিল। শ্রাবণ মাসের সাধনায় 'হিং টিং ছট্' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা বাবু রবীন্দ্রনাথের রচনা। কবিতার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে –
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব দেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগি বিষম বিস্ময়।

৭. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ।

না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।

এই ব্যঙ্গপূর্ণ রচনার লক্ষ্য কে? পাছে কোনো সন্দেহ থাকে, এই জন্য কবিতার শেষ আরও স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে :

বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্জ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।

রবীন্দ্রনাথবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথবাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু।"

চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের বিরোধের গোড়ার ইতিহাসটা জানা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিরোধের ইতিবৃত্ত পাই বঙ্কিমচন্দ্রের একটি রচনা থেকে। ১২৯১ অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রচারে বঙ্কিম আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায় শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন—

"গত শ্রাবণ মাসে [১২৯১ বঙ্গাব্দ], 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশি ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল।

তারপর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয়বাবু এ প্রত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর একজন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন

না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন ; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামী পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল, —'র'। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্রবাবুর লেখা। রবীন্দ্রবাবু ইতর শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পাণ্টাইয়া বলিলেন।"[৮]

বিরোধের এই সূত্রপাত। এর পরেই রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক সঞ্জীবনীতে। সঞ্জীবনী হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কাগজ—যা-কিছু পুরাতন তাকেই ভাঙ্‌বার জন্য এ কাগজ উদ্যত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার নাম শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু। কবিতাটি ১২৯১-৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।[৯] ১২৯৩ বঙ্গাব্দে কড়ি ও কোমল গ্রন্থে সংকলিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই দামু ও চামু কে, তদ্‌বিষয়ে সমসাময়িক সাহিত্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। আমাদের সন্দেহ হয় চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এই কবিতার আক্রমণস্থল।"[১০] যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গবাসী ছিল সনাতনীদের কাগজ—বাংলার হিন্দু গোঁড়ামির প্রশ্রয়দাতা ও প্রচারক। সঞ্জীবনীর ঠিক বিপরীতধর্মী। কড়ি ও কোমলের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই কবিতা আর রবীন্দ্রগ্রন্থভুক্ত হয়নি। এখানে সেই বর্জিত কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল।

পত্র।

শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু
* * * . সম্পাদক সমীপেষু।

দামু বোস্ আর চামু বোসে কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্দে খানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)

৮. দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ।

৯. সঞ্জীবনীর তারিখ আনুমানিক। দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ মাঘ।

১০. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

কোথায় গেল বাবা তোমার মা জননী কই !
সাত-রাজার-ধন মাণিক ছেলের মুখে ফুটচে খই !
(আমার দামু আমার চামু !)
দামু ছিল এক-রত্তি চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে এতই খচমচ !
(আমার দামু আমার চামু !)
দামু বলেন "দাদা আমার" চামু বলেন "ভাই,"
আমাদের দোঁহাকার মত ত্রিভুবনে নাই !
(আমার দামু আমার চামু !)
গায়ে পড়ে গাল পাড়চে বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা হিঁদুর ধরম !
(দামু আমার চামু !)
দামুচন্দ্র অতি হিঁদু আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় হিঁদু রামু বামু শামু—
(দামু আমার চামু !)
রব উঠেছে ভারত ভূমে হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েচেন ভয় নেইক আর।
(ওরে দামু, ওরে চামু !)
নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে স'রে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে ক'রে !
(আহা দামু আহা চামু !)
লিখ্‌চে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বল্‌চে মিথ্যে কথা চামু দিচ্চে গাল।
(হায় দামু হায় চামু !)
এমন হিঁদু মিল্‌বে নারে সকল হিঁদুর সেরা,
বোস্‌ বংশ আর্য্যবংশ সেই বংশের এঁরা !
(বোস্‌ দামু বোস্‌ চামু !)
কলির শেষে প্রজাপতি তুলেছিলেন হাই,
সুড়্‌সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন আর্য্য দুটি ভাই ;
(আর্য্য দামু চামু !)

দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুল্‌চে হিঁদু শাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে বাজার হুলুস্থূল!
(দামু চামু অবতার!)
মনু বলেন "ম'নু আমি" বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে, রৈল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)
মেড়ার মত লড়াই করে লেজের দিক্‌টা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর হিঁদুয়ানির খোঁটা!
(আমার হিঁদু দামু চামু!)
দামু চামু কেঁদে আকুল কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাকে আছে, গোঁজ' যেথায় শিকি দুয়ানি।
(খোলের মধ্যে হিঁদুয়ানি!)
দামু চামু ফুলে উঠ্‌ল হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন বেড়ায় নেচে নেচে!
(ষেটের বাছা দামু চামু!)
আদর পেয়ে নাদুস্ নুদুস্ আহার করচে ক'সে,
তরিবৎটা শিখ্‌লেনাক বাপের শিক্ষা দোষে!
(ওরে দামু চামু!)
এস বাপু, কানটি নিয়ে, শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)
পড়াশুনো কর, ছাড়' শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘোষে তোল্‌রে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)
ভদ্রলোকের মান রেখে চল্ ভদ্র বল্‌বে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা জেনে ফেল্‌বে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু!)
পয়সা চাও ত পয়সা দেব থাক সাধু পথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু!)[১১]

১১. কড়ি ও কোমল, প্রথম সংস্করণ (১২৯৩) থেকে সংকলিত।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে চন্দ্রনাথ সাবিত্রী পত্রিকায় হিন্দুপত্নীর আদর্শ এবং হিন্দু-বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে লেখেন হিন্দুবিবাহ নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ (১২৯৪), এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে সায়েন্স এসোসিয়েসন হলে তিনি পাঠ করেন। প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু পরম ভাবুক জ্ঞানবান ও সহৃদয়। তাঁহার শকুন্তলা-সমালোচনা তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। আমি যতদূর জানি বাংলায় এরূপ গ্রন্থ আর নাই। বাংলার পাঠকসাধারণে চন্দ্রনাথবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এইজন্য কিছুকাল হইল তিনি 'হিন্দুপত্নী' এবং 'হিন্দু বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য' নামে যে-দুটি প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহা সাধারণ্যে অতিশয় আদৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুপত্নীর একীকরণতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আজকাল গুটিকতক কাগজে অবিশ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইনি উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে হিন্দুবিবাহ এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্বরূপে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যতটা বলিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তী আর কেহ ততটা বলেন নাই।… অতএব উক্ত সর্বজনমান্য প্রবন্ধদ্বয়কে মুখ্যত অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি, এবং এই উপলক্ষ্যে আমার মতামত যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়াছি।"

আমরা প্রথমেই দেখেছি হিং টিং ছট্ যে-সংখ্যায় ছাপা হয় তার পূর্বের সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আক্রমণাত্মক নিবন্ধ চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এরও পূর্বে সাধনায় চন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৯৮ পৌষে, অর্থাৎ প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায়। ১২৯৮ অগ্রহায়ণ মাসের সাহিত্যে চন্দ্রনাথ আহার নামক যে-প্রবন্ধ লেখেন, পৌষের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ তারই দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। পত্রিকার সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অগ্রহায়ণ সংখ্যার সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই লিখেছেন, "বর্তমান সংখ্যক সাহিত্যে 'আহার' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সমালোচনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।"

আহারতত্ত্বের সমালোচনা শেষ হতে না হতে শুরু হল লয়তত্ত্বের সমালোচনা। ১২৯৮ মাঘ সংখ্যার সাহিত্যে লয় শিরোনামে চন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ লেখেন, সাধনার ফাল্গুন সংখ্যার সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে

সমালোচনা করেন। অতঃপর সাধনায় ১২৯৯ আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব। এর পরের মাসেই ছাপা হয় হিং টিং ছট্। সাধনায় রবীন্দ্রনাথ-চন্দ্রনাথ বিরোধ আরও দূর এগোয়। চন্দ্রনাথ ১২৯৯ কার্তিক সংখ্যার সাহিত্যে লেখেন কড়াক্রান্তি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। এর সমালোচনায় কবি লেখেন কড়ায়-কড়া কাহনে-কানা; প্রকাশিত হল সাধনায় ১২৯৯ পৌষ সংখ্যায়।[১২]

যাই হোক্ আমাদের প্রশ্নটা ছিল হিং টিং ছট্ চন্দ্রনাথ বসুকে উপলক্ষ্য করে রচিত কি না? সাহিত্য পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথবাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকে বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু। এ কথা যদি রবীন্দ্রনাথবাবু অস্বীকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রুচির প্রশংসা করা যায় না। এরূপ লেখা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যে কেহ কাহাকে এরূপ বিদ্রূপ ও হতশ্রদ্ধা করিয়া থাকে! কবির লড়াই আর কতদূর বাকি রহিল।

সংযম ও সম্ভ্রমের শাসন একবার ভঙ্গ হইলে তাচ্ছিল্য ভাব সহজেই আসিয়া পড়ে। চন্দ্রনাথবাবু কড়াক্রান্তি-শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন, 'অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময় যাপনের একটা উপায় বটে।' স্বজাতিদ্রোহী কথাটা কঠিন হইল, আর এ কথাটা কঠিন হইল না! যদি সুশিক্ষিত উদারস্বভাব সুলেখকগণ মতভেদ প্রকাশ কালে বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিবেন, তাহা হইলে আর কে করিবে?"[১৩]

সাহিত্য পত্রিকার এই প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সম্পাদক সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেন। কবির সেই পত্র—

পুরী। ৬ই ফাল্গুন।

সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মান্যবরেষু, চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যেরূপ প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। কারণ, বিষয়টা আপনি

১২. এই সকল প্রবন্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে।

১৩. তর্কবৈচিত্র্য, সাহিত্য ১২৯৯ ফাল্গুন।

কেবল একদিক হইতে দেখিয়াছেন। আমার পক্ষ হইতে যে দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারিত তাহা আপনি একটিও বলেন নাই, সুতরাং আমাকেই বলিতে হইল।

বাল্যবিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ-প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই তিন পূর্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলি নাই।

আপনার অবিদিত নাই, প্রথম ভাগ সাধনায় মাসিক পত্রের সমালোচনা বাহির হইত। তাহাতে উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত। সাহিত্যে চন্দ্রনাথবাবু যে-কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাধনার সাময়িক সমালোচনায় তাহার দুইটি লেখার প্রতিবাদ বাহির হয়—দুই একটি প্রতিবাদ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রূপেও প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবু যখন তাহার পুনঃপ্রতিবাদ করেন তখন তদুত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আহার এবং লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বাদ প্রতিবাদ বাহির হয়। আপনি যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার মতান্তর হওয়াতেই আমি সাধনায় সমালোচনার উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্বক আমার বিদ্বেষবুদ্ধির চরিতার্থতা সাধন করিতেছিলাম তবে তাহা আপনার ভ্রম—ইহার অধিক আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না। 'কড়াক্রান্তি' প্রবন্ধে এমন দুই-একটি মত প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার কঠিন প্রতিবাদ করা আমার একটি কর্তব্যস্বরূপে গণ্য করিয়াছিলাম। আপনি যদি সে প্রবন্ধটি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গুরুতর আপত্তিযোগ্য কিছু না পাইয়া থাকেন তবে উক্ত প্রতিবাদটিকে বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মনে করা আপনার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।

'হিং টিং ছট্' নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোনো প্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন 'অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু—' এই পর্যন্ত বলিতে পারি যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই। অবশ্য আপনি অনেককে জানেন, এবং আমিও অনেককে জানি—আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি যে অনেককে জানি

তাঁহাদের মধ্যে একজনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আমি তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালেব বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ প্রতিবাদে আমাব কখনই রুচি হইত না। কিন্তু মানুষ কর্তব্য বুদ্ধি হইতে যে কোনো কাজ করিতে পারে এ কথা দেশ-কাল-পাত্র বিশেষের নিকট প্রমাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তাহার আবশ্যকও নাই।

আপনি লিখিয়াছেন 'মানিলাম চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিয়াই ত রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারম্বার বলিবার প্রয়োজন কি? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথবাবু নিজের ভ্রান্তমত সমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথবাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।' মার্জনা করিবেন, আপনার এই কথাগুলি নিতান্ত কলহের মত শুনিতে হইয়াছে, ইহার ভালরূপ অর্থ নাই। কলহের উত্তরে কলহ করিতে হয়, যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, অতএব নিরস্ত হইলাম।

উপসংহারে সবিনয় অনুরোধ এই যে, আপনি একটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, নিজের মত যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান না কবা যায় তবে পৃথিবীতে কেহ কোনো কথা বলিতে পারে না। অবশ্য, কেন সত্য জ্ঞান করি তাহার প্রমাণ দিবার ভার আমার উপর। যদি আমার মত প্রচার দ্বারা পৃথিবীর কোনো উপকার প্রত্যাশা করি, এবং বিরুদ্ধ মতের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায় তবে যতক্ষণ প্রমাণ দেখাইতে পারিব ততক্ষণ নিজের মত প্রচার করিব ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিব ইহা আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য। এ কার্য যদি বারম্বার করার আবশ্যক হয় তবে বারম্বারই করিতে হইবে। কবে পৃথিবীতে এক কথায় সমস্ত কার্য হইয়া গিয়াছে? কোন্ বদ্ধমূল ভ্রমের মূলে সহস্রবার কুঠারাঘাত করিতে হয় নাই? আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা বারম্বার প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে কৃতকার্য না হইতে পারি, আত্মক্ষমতার প্রতি এ সংশয় আমার যথেষ্ট আছে, তবু কর্তব্য যাহা তাহা পালন করিতে হইবে এবং যদি

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার পুনর্বার মতের অনৈক্য হয় এবং তাঁহার কথার যদি কোনো গৌরব থাকে তবে আপনারা যিনি যেরূপ অর্থ বাহির করুন আমাকে পুনর্বার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঃ—অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবেন। —শ্রীরঃ

এই চিঠি কিন্তু সাহিত্যে যথাসময়ের মধ্যে প্রকাশিত না হলে কবি সাধনায় সাহিত্য পাঠকদের প্রতি নিম্নোদ্ধৃত অংশ লেখেন—

"কিয়ৎকাল পূর্বে 'হিং টিং ছট্' নামক একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথবাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় 'সাহিত্য' পত্রের কোনো লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশয় জন্মাইয়া দেন। আমি তাহার প্রতিবাদ 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই, তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই। এই কারণে, সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

এতৎ প্রসঙ্গে এই স্থলে জানাইতেছি যে, চন্দ্রনাথবাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে, নিতান্ত কর্তব্য জ্ঞান না করিলে ও তাঁহাকে বর্তমান কালের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোনো প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথবাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্তব্য পালন করিয়াছি।"[১৪]

সাধনায় এই অংশ ছাপা হলে পরের মাসের সাহিত্যে[১৫] রবীন্দ্রবাবুর পত্র শিরোনামে কবির প্রেরিত চিঠিটি মুদ্রিত হয় সাহিত্য সম্পাদকের মন্তব্য সংবলিত হয়ে। সাহিত্যের সম্পাদক পত্রের পাদটীকায় লেখেন—

"গত বর্ষের একাদশঃ সংখ্যক সাহিত্যে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের

১৪. 'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি, সাধনা ১২৯৯ চৈত্র।

১৫. সাহিত্য ১৩০০ বৈশাখ।

এই পত্র। কিন্তু এই পত্র, সাহিত্য সম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথা তিনি কিছুই বুঝাইয়া বলেন নাই। রবীন্দ্রবাবু কোন্ বনিয়াদে আমাদিগকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক স্থির করিলেন? ইহা তাঁহার কবিজনোচিত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কবিত্ব কিছুই নাই। সুতরাং, পুরাতন বা তাঁহার নিজের নবাবিষ্কৃত সত্যও নাই। তর্কবৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব, তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ি নহি। সে বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রবন্ধাকারে ও প্রাসঙ্গিকভাবে লিখিয়া পাঠানোই রবীন্দ্রবাবুর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমাদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া এই পত্র লেখেন ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। পরের কথা যাহাই হউক, প্রথমেই রবীন্দ্রবাবুর এই বিষম ভ্রম। পত্র প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার এই ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের ইচ্ছা ছিল না; আর সেই জন্যই তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশিত না করিয়া, পত্রের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। উপস্থিত বিষয়ে যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। কাজেই অগত্যা আমরা, তাঁহার পত্র, প্রকাশের উপযুক্ত না হইলেও, প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিলাম কেবল তাঁহারও অনুরোধে এবং সাধনায় অযথা দোষারোপের জন্য। নহিলে, বহুদিনাবধি সাময়িকপত্রের লেখক ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিচালক হইয়া রবীন্দ্রবাবু এরূপ বেতালা পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা তাঁহার সম্মানের পরিচায়ক নহে।"

হিং টিং ছট্ নিয়ে তর্কে বৈচিত্র্য যেমন ঘটে ঘটুক, কিন্তু আমরা দেখছি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথের মধ্যে কোনোরকম মালিন্য ঘটেনি। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২ ফাল্গুন তারিখের চিঠিতে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—"খোকাবাবু বুঝিয়া দেখিবার জিনিস, দালিয়া ভোগ করিবার জিনিস—কিন্তু দুইয়েতেই আনন্দ অপার।"[১৬]

আর ২ পৌষ ১৩০৬ তারিখের চিঠিতে লিখছেন—"কণিকার সবই ভাল হইয়াছে—কেবল উহার নামকরণ ঠিক হয় নাই। 'হীরক কণিকা' বলিলে ঠিক নামকরণ হইত।"[১৭]

১৬-১৭. বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১।

অপর দিকে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গেও কবির সম্পর্ক খারাপ হয়নি। কবিকে লেখা সুরেশচন্দ্রের দুটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করি—

"আপনার প্রীতিপূর্ণ সুমিষ্ট পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পড়িয়া বলা বাহুল্য যে, তৃপ্ত হইয়াছি।...সাহিত্য আপনার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত এবং বিস্মিত হইলাম। নিজকৃত কার্যের সফলতা অন্য কাহারও কাছে শুনিলে স্বভাবতঃ আনন্দ হয়। কিন্তু সেটা লুকাইয়া রাখাই সভ্যতার রীতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না,—আপনার মত আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্য-রাজের মুখে শ্রাবণের সাহিত্যের প্রশংসা শুনিয়া বাস্তবিক আমি আনন্দিত এবং অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছি।...কেমন আছেন? পদ্মা কেমন? নাটকখানির কতদূর। এখন নূতন কি লিখিতেছেন। আপনার পত্র বার বার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না,—এবার একটা বিস্তৃত পত্রের আশা করিয়া বিদায় হই। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩০১। স্নেহার্থী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।"[১৮]

" 'সাধনায়' 'জ্যোৎস্নারাত্রে' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। আপনার মায়াময়ী লেখনী অমর হইয়া এইরূপ রহস্যমধুর উদার উন্মুক্ত কবিতার সৃষ্টি করুক। আপনার এখনকার কবিতায় যে উন্নত বাসনা, উদার উন্মুক্ত বিশ্বজনীন ভাব ও যে পূত বিকশিত সৌন্দর্যরহস্যের একাগ্র উপাসনা দেখা যায়, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।[১৯] আপনি আবার কবে কলিকাতায় আসিতেছেন? আপনার বোধহয় মনে আছে, আমি আপনার কবিতার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলাম, এবং আপনি তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। আমার আর একটি প্রার্থনা ছিল,—আপনার কোন্ কবিতাগুলি আপনি সংগ্রহে নিবদ্ধ হইবার উপযোগী মনে করেন,—আপনি পুস্তকে সেইগুলি চিহ্নিত করিয়া দেন। যদি আপনার সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে এবার মফঃস্বলে গিয়া অবকাশমতে যদি আপনার গ্রন্থাবলী একবার পড়িয়া সংগৃহীত হইবার যোগ্য কবিতাগুলি চিহ্নিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড় উপকৃত হই।"[২০]

১৮. শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল চিঠি থেকে।

১৯. সাহিত্য ১৩০২ আষাঢ় সংখ্যায় সাধনার জ্যোৎস্নারাত্রে কবিতার সমালোচনায় বলা হয়েছে—'জ্যোৎস্নারাত্রে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা।'

২০. চিঠির তারিখ ১ জুন ১৮৯৫। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল চিঠি থেকে।

হিং টিং ছট্‌ রচনার পরের দিন পরশপাথর রচিত। রচনাস্থল শান্তিনিকেতন; সাধনায় ১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত। এই কবিতাটি রচনার আগ্রহ কবির মনে কিভাবে জেগেছিল তা তাঁর বাল্যস্মৃতির ভিতর থেকে পাওয়া যেতে পারে। ছেলেবেলায় কবি পিতার সঙ্গে প্রথম ভ্রমণে বেরিয়ে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সেখানকার স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে কবির উক্তি—

"যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মত, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসী সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল,...একটা ছোট হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ের দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়গোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল,... আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই।"[২১] পরশপাথরের মধ্যে উপমাচ্ছলে কবি লিখেছেন—

> বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারা নিশি তরুশাখে
> যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।
> তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,
> একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।

এই চিত্রটি সেদিনের পত্রধারার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। পরশপাথর ১২৯৯এর ১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখে রচিত। সেই তারিখেই প্রত্যূষে একটি পত্রে কবি লেখেন—

"এখনো পাঁচটা বাজেনি—কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল—সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না—অবশ্য, আমাদের শ্রুতি-বিনোদনের জন্যে নয়, বিরহিনীকে পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়—তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু

২১. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা।

হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না।...বাস্তবিক, বুঝতে পারিনে ওদের এত ডাকবার কী আবশ্যক।"[২২]

পরশপাথর কবিতাটির সঙ্গে সমকালে রচিত কবির একটি গান তুলনীয়।[২৩] গানটি ভারতী ও বালক পত্রিকায় ১২৯৯ কার্তিক সংখ্যায় ক্ষ্যাপার প্রতি শিরোনামে মুদ্রিত। অর্থাৎ পরশপাথর মুদ্রিত হবার দুমাস পরে গানটি ছাপা হয়। ভারতী ও বালক থেকে গানটি এখানে উদ্ধৃত হল—

ক্ষ্যাপা তুই
আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে!
যে আসে তোমার পাশে
সবাই হাসে দেখে তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন কাজে
দিবানিশি
তারা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে
ক্ষেপে বেড়াস জনম ভোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে!

তোর নাই অবসর নাইকো দোসর
ভবের মাঝে
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই
নানান্ কাজে!
ওরে তুই, কি শুনাতে এত প্রাতে
মরিস্ ডেকে!
এ যে বিষম জ্বালা, ঝালাফালা
দিবি সবায় পাগল ক'রে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।

ওরে তুই কি এনেছিস্ কি টেনেছিস্
ভাবের জালে।

২২. ছিন্নপত্রাবলী।

২৩. দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী।

তার কি মূল্য আছে কারো কাছে
কোন কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে
ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া,
রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।

এ জগৎ আপন মতে আপন পথে
চলে যাবে
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে
নিজের ভাবে।
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন
হবে কবে!
মিছে তুই আছিস্ জাগি তারি লাগি
না জানি কোন্ আশার জোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হল যেতে নাহি দিব। কবিতাটির রচনাকাল ১৪ কার্তিক ১২৯৯ (২৯ অক্টোবর ১৮৯২), রচনাস্থান জোড়াসাঁকো কলকাতা। এর পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ত্যাগ করেন। বোয়ালিয়া থেকে লেখা চিঠির তারিখ ১৮ নভেম্বর ১৮৯২।[২৪] মনে করা যেতে পারে কবির কলকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর শিশু পুত্রকন্যারা তাঁকে হয়তো বাধা দিয়ে আবদার করে বলেছিল—যেতে আমি দিব না তোমায়। কবির স্পর্শচেতন মনে সেই অভিঘাতে যে ভাবোদয় হয়, মনে হয় তা-ই ব্যক্ত হয়েছে যেতে নাহি দিব কবিতায়। কবিতার মধ্যে আছে 'কন্যা মোর চারি বছরের'। অপর দিকে কবির পুত্রকন্যাদের বয়স তখন কত? মাধুরীলতার বয়স ছয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ 'চারি বছরের', আর কন্যা রেণুকা তখন দুই বৎসরের শিশু।

২৪. ছিন্নপত্রাবলী।

তোমরা এবং আমরা[২৫] কবিতাটি শান্তিনিকেতনে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৬ জ্যৈষ্ঠ রচিত। সাধনায় প্রকাশিত হয় পৌষ মাসে। এই কবিতাটি রচনা করে কবি যে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলেন তা ১৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখে লেখা কবির একটি চিঠি থেকে জানতে পাই। কবিতাটি লেখার বিবরণও চিঠির মধ্যে আছে।

"আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বুকের উপর স্লেট রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল—মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্ গুন্ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল—এমন সময় তোর একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। তোর চিঠিখানি পড়লুম এবং সাধনার পাতাগুলোর মধ্যে চোখ দুটোকে একবার সবেগে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে এলুম। তার পরে পুনশ্চ শিরশ্চালন করে অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্ত হলুম। শেষ করে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো।…রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়।"[২৬]

তোমরা এবং আমরা কবিতায় আছে—

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

২৫. সোনার তরী কাব্যে কবিতাটির নাম তোমরা ও আমরা।
২৬. ছিন্নপত্রাবলী।

তোমরা এবং আমরা কবিতাটি যে মাসে রচিত, আর তার ঠিক পূর্বের মাসে[২৭] শিলাইদহ থেকে কবি একটি পত্রে লিখেছেন –

"ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে – যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না – একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে আবার ঝুপ্ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে – তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীরভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে চলে যায় – কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে – জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্‌ছল্ জল্‌জল্ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ এবং সংগীত আছে – ।"[২৮]

সাধনার ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় তোমরা এবং আমরা কবিতার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-কৃত আমরা ও তোমরা শিরোনামে একটি অনুকৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক উদ্ধৃত করি।

প্রথম স্তবক –

'আমরা' খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই গো,
আর, 'তোমরা' বসিয়া খাও ;
আমরা দুপ'রে আপিসে লিখিয়া মরি গো,
আর, তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে 'আমরা'ই পড়ে' লড়ি গো,
'তোমরা' গহনাপত্র ও টাকাকড়ি গো
অমায়িকভাবে গুছায়ে, পাল্কি চড়ি' গো,
ধীরে চম্পট দাও।

শেষ স্তবক –

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে গো –
রোজ, জ্বালাতন হয়ে' মরি',
তোমরা – সে ভোগ ভুগিতে হয় না – থাক গো
খাসা, বেশবিন্যাস করি ;

২৭. ৭ এপ্রিল ১৮৯২।

২৮. ছিন্নপত্রাবলী।

আমরা ছুটাকা জোড়ার কাপড় পরি গো—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি গো—
'বোম্বাই' 'বারাণসী' বছর বছরই গো—
তবু মন উঠে নাও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই অনুকৃতি ইন্দিরা দেবীর পছন্দ হয় নি। কবির একটি পত্র থেকে তা জানা যায়। শিলাইদহ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে আছে -

"তুই 'আমরা ও তোমরা'—লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলুম। লোকটা কিন্তু 'খুব মজা করেছি' মনে করে বসে আছে। মুশকিল এই-যে, রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না ; কারণ, রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ।"[২৯]

বৈষ্ণব কবিতা শাহাজাদপুরে ১৮ আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে রচিত, সাধনায় ১২৯৯ ফাল্গুনে মুদ্রিত। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অভিমত—বৈষ্ণব কবিগণ এই মর্ত্যের প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র দেখেই স্বর্গের প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র আঁকতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলতে চান মানুষের রূপে দেবতারা সৃষ্ট। অন্তরের মধ্যে যে প্রেমলীলা চলেছে তার আধার মূলত মানুষ—

সত্য করে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
… … …
আমাদেরি কুটির-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ! এই প্রেম-গীত-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়!

২৯ ছিন্নপত্রাবলী।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাধনায় ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় পঞ্চভূতের ডায়ারিতে। সেখানে আছে—

"যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।"

অন্যত্র বলেছেন—

"বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে—প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে মানব ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্তবৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"[৩০]

সভাভঙ্গ[৩১] রচিত হয় শিলাইদহের বোটে ১২৯৯এর ২৪ আষাঢ়। প্রকাশিত হয় ১২৯৯ চৈত্র মাসে। এই কবিতার আখ্যান কবির স্বপ্নলব্ধ। স্বপ্ন দেখেন ২০ আষাঢ় তারিখে, আর ঠিক চার দিন পরেই রচনা করেন এই কবিতা। কবি রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, পরের দিন সকালে উঠেই ইন্দিরা দেবীকে পত্র দেন। সাজাদপুর থেকে লেখা এই চিঠির তারিখ ৩ জুলাই ১৮৯২।

"কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা-উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বুর ভিতরে বসে নেই, কিন্তু বাইরে থেকে

৩০. ছিন্নপত্রাবলী, ২৪ আগষ্ট ১৮৯৪।

৩১. নামান্তর—গানভঙ্গ।

সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গান গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তারপর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল স্বরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার স্বরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল—সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা' করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন—বাইরে থেকে তার সেই আন্তরিক শোকের স্বর শুনে আমারও ভারী কষ্ট হতে লাগল—পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আড়াল করে রাখতে। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর যে কোথায় উড়ে গেল তার কিছুই মনে নেই।"[৩২]

সমুদ্রের প্রতি কবিতাটি 'পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া' রচিত। তবে রচনাস্থল পুরী নয়, রাজশাহী। কবি উড়িষ্যায় মাস দেড়েক কাটিয়ে কলকাতায় ফেরেন ১২৯৯ চৈত্র মাসের গোড়ায়। তারপর কলকাতায় ফিরেই দিন সাতেক পরে রাজশাহী যাত্রা। সমুদ্রের প্রতি কবিতার রচনাকাল ১৭ চৈত্র ১২৯৯, প্রকাশ বৈশাখ ১৩০০। অর্থাৎ পুরীর সমুদ্র দর্শনের দেড় মাস পরে এই কবিতা রচিত। পুরী থেকে ১৪ ফেব্রুআরি ১৮৯৩ তারিখে লিখছেন, "পুরীর সমুদ্র যে আমার কত ভাল লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বলতে পারবো না।"[৩৩] সমুদ্রের প্রতি কবিতায় কবির উক্তি—

> আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
> শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
> কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
> আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
> নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,

৩২-৩৩. ছিন্নপত্রাবলী।

আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের – অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

এই কবিতা রচনার চার মাস পূর্বে শিলাইদহে পদ্মার বোটে বসে কবি লিখেছেন –

"এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন-রাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"[৩৪]

৩৪. ছিন্নপত্রাবলী, ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২।

শিলাইদহ থেকে কলকাতায় ফিরে সমুদ্রের প্রতি কবিতাটি আগ্রায় ইন্দিরা দেবীকে পাঠিয়ে কবি যে পত্রখানি লেখেন তাতে আছে—

"তোদের ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল! এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহু-কালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী-একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে—কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের সৃষ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিংবা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই—আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস—তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাঁস্ ফাঁস্ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।"[৩৫]

আকাশের চাঁদ কবিতা বিরাহিমপুরের পথে বোটে বসে লেখা। রচনাকাল ২২ আষাঢ় ১২৯৯। প্রকাশ ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ। সাধনায় এর এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত[৩৬] গল্প এক রাত্রি এই কবিতার ভাবের সঙ্গে তুলনীয়। পরশপাথরের মধ্যেও সেই ভাবেরই ইঙ্গিত আছে।[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা সোনার তরী সাধনায় প্রকাশিত হয় ১৩০০

৩৫. ছিন্নপত্রাবলী, ১৬ এপ্রিল ১৮৯৩।

৩৬. সাধনা ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ।

৩৭. দ্রষ্টব্য, প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প।

আষাঢ় সংখ্যায়। কবিতাটির রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৮। রচনাস্থল বোট, শিলাইদহ। সোনার তরী কবিতা রচনার দুই বৎসর পূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে মেঘদূত সম্পর্কে লিখিত এক পত্রে কবি সোনার তরী শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। চিঠিতে আছে—

"সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিকসম্প্রদায় থাকত তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত—তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক. ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্‌, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি ক্রিটিকদের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না।"[৩৮] কবি কি তখন ভেবেছিলেন যে তাঁর নিজের লেখা একটি কাব্যকেও ক্রিটিকদের পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক ধাক্কা খেয়ে সহ্য করতে হবে।

সোনার তরী কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কবি একটি পত্রে লিখেছিলেন—

"সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ওই সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকেই দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখো, কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবনপাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত। আমাদের আহারবিহার, বসনভূষণ, ধর্মকর্ম, ভাষাভাব, সমস্তই পূর্ববর্তী অসংখ্য মানবের বিস্মৃত কর্ম বিস্মৃত চেষ্টার দ্বারাই বিধৃত। আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি, যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে? যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়? যাহারা যুগে যুগে নানা রূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নামধাম সুখদুঃখ লইয়া কোন্ বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল, 'আমার সমস্ত লও, তোমার জন্যই আমি খাটিতেছি, তোমাকে দিয়াই আমার সুখ। আমার সমস্তই লও। কিন্তু আমাকে ঠেলিয়ো না, আমাকে ভুলিয়ো না—আমার কাজের মধ্যে আমার চিহ্নটুকু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়ো।' কিন্তু, এত স্থান কোথায়? আমাদের জীবনের ফসল কোনো না কোনো আকারে থাকিয়া যায়, কিন্তু আমরা থাকি না।

৩৮. চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪।

মানুষের এই একটি ব্যাকুলতা, এই বেদনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই ব্যথা আছে; আমাদের সেবা, আমাদের প্রেম আমরা দিতে পারি, সেই সঙ্গে নিজেকে দিতে গেলেই সেটা বোঝা হইয়া পড়ে। আমরা প্রীতি দান করিব, কর্ম দান করিব, কিন্তু সেইসঙ্গে আমাকেও চালাইতে যাইব না, ইহাই জীবনের শিক্ষা; আমাকে চালাইতে গেলেই সেটা নিতান্ত অনাবশ্যক হয়, তাহাতে স্থান কুলায় না, সুতরাং যাহা দিলাম তাহার মূল্য কমিয়া যায়।

'এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা' – একলা নয় তো কী? আমরা প্রত্যেকেই যে একলা – আমাদের প্রত্যেকের চারিদিকে যে অতলস্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে তাহা কে অতিক্রম করিবে? এই ব্যবধানের মধ্যে, প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে, আপনার জীবনের ক্ষেত্রটুকু লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি – কাজ করিতে করিতে, ফসল জমা হইতে হইতে, এমন দিন আসিয়া পড়ে যখন বুঝিতে পারি, এ ফসল আমি কোথাও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। এ-সমস্তই আমাকে দিয়া যাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া যাইব? তাহাকে চিনি এবং চিনি না, সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে কিন্তু ধরা দেয় নাই। আমি তাহাকে বলি, 'ওগো, তুমি আমার সব লও, এবং আমাকেও লও।' সে আমার সব লয়, কিন্তু আমাকে লয় না। আমাদের সকলের কুড়াইয়া লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে তাহা কি আমরা জানি? সে যে অনির্দিষ্টের দিকে অহরহ যাইতেছে তাহার কূল কি আমরা দেখিয়াছি? কিন্তু, তবু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অপরিচিত অথচ পরিচিত মানবসংসারকেই, আমাদের যাহাকিছু সমস্ত দিয়া যাইতে হইবে; নিজে তো কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না, নিজেকেও দিয়া যাইতে পারিব না।

কিন্তু, এ সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক্। কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল। মনে করো-না কোনোই বিশেষ অর্থ নাই; কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের ভাব, একটা ছবি, একটা সংগীতমাত্রই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কী?"৩৯

সোনার তরী কবিতা প্রকাশিত হলে ১৩০০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় সাহিত্য লেখে –

"এবারকার সাধনার আর একটি মহামূল্য অলঙ্কার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

৩৯. বীরেশ্বর গোস্বামীকে লিখিত পত্র, ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৩।

ঠাকুরের সোনার তরী। আমরা বহু দিন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই।"

সোনার তরী কবিতা সম্পর্কে প্রথম বিরূপ আলোচনা করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।[৪০] এরপর বাংলা সাহিত্যে সোনার তরী অবলম্বনে নানা প্রবন্ধ রচনা শুরু হয়।[৪১]

১৩১৫ চৈত্র মাসের শান্তিনিকেতন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকে সোনার তরীর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—

"মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃত-কর্ম কীর্তি সমর্পণ করিতেছে এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্য কালে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন মানুষ মহাকালকে অনুরোধ করিল যে 'এখন আমারে লহো করুণা ক'রে' তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি!'

মহাকাল মানুষের কর্ম কীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না। হোমার বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস শেক্‌স্‌পীয়ার নেপোলিয়ান আলেক্‌জান্দার প্রতাপসিংহ প্রভৃতির কীর্তিকথা মহাকাল বহন করিয়া লইয়া চলিতেছে, কিন্তু সে সেই সব কীর্তিমানদের রক্ষা করে নাই। যিনি প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বস্ত্রবয়নের তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাস রক্ষা করে নাই, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।"[৪২]

শান্তিনিকেতন গ্রন্থের তরী বোঝাই শীর্ষক ভাষণে (৪ চৈত্র ১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ সোনার তরীর ব্যাখ্যা করেছেন—

"সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু

৪০. দ্রষ্টব্য, কাব্যের অভিব্যক্তি, প্রবাসী ১৩১৩ কার্তিক।

৪১. দ্রষ্টব্য, আদিত্য ওহদেদার—রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

৪২. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবিরশ্মি প্রথম খণ্ড।

দ্বীপের মতো, চারি দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেইজন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারি দিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু, যখন মানুষ বলে 'ওই সঙ্গে আমাকেও নাও', 'আমাকেও রাখো', তখন সংসার বলে, 'তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু, মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই-যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে (১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কবিতার প্রসঙ্গে বলেছেন—

"এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিংবা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।...যেমন 'সোনার তরী' কবিতাটি। ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা-ধানে-বোঝাই চাষীদের ডিঙিনৌকা হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান।...ভরা

'পদ্মার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।'[৪৩]

সোনার তরী কবিতার কল্পনা শ্রাবণে ও রচনা ফাল্গুনে, এ সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে কবি লেখেন—

"তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা কোরো। আমাদের জীবনে, সুতরাং সাহিত্যেও, হয় তো কোনো একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যে দিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এ পারে চলে আসছে, সে দিনটা সব তারিখ মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেই দিনেই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ, আমার মনে 'সোনার তরী'র যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক—সে দিনটা বিশেষ দিন নয়, সে দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায় নি। অতএব, আমার ইতিহাসে আর তোমাদের ইতিহাসে এইখানে বাদ-প্রতিবাদ হবেই; দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে, আমার হাতে নেই। আদালতে তোমাদেরই জিত রইল। আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে—'শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে'। তুমি বলবে এটা কাল্পনিক; আমি বলব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিস্‌টিক।"[৪৪]

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে আরও তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতা তিনটি হৃদয় যমুনা, ভরা ভাদরে ও সুখ। রচনাকাল যথাক্রমে ১২ আষাঢ় ১৩০০, ২৭ আষাঢ় ১৩০০ এবং ১৩ চৈত্র ১২৯৯। প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৩০০ শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন-কার্তিক। সুখ চিত্রা কাব্যের অন্তর্গত হয়। প্রথম দুটি সোনার তরী কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।

সুখ কবিতাটি সম্পর্কে সাহিত্যের মন্তব্য—

৪৩-৪৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবিরশ্মি প্রথম খণ্ড।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুখ' অতি সুন্দর মধুর কবিতা।"[৪৫]

তুলনায় সমালোচনা কবিতাটি সাধনার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩০০ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়। রচনাকাল ২৯ কার্তিক ১৩০০। সাধনার পর সোনার তরী (১৩০০ ও ১৩০১), কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩), কাব্যগ্রন্থ ৩ (১৯১৫) ও সোনার তরী (১৩৩৪)-তে তুলনায় সমালোচনা নাম আছে। কাব্যগ্রন্থ ৫ (১৩১০)-এ এই কবিতার নাম কণ্টক ও ফুল। সোনার তরী (১৯৩৯) থেকে এই কবিতা কণ্টকের কথা নামে প্রচলিত।

কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত হলে সাহিত্য (১৩০০ পৌষ) পত্রিকা সমালোচনায় লেখে—

"তুলনায় সমালোচনা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা। কবিতাটির ভাষা অত্যন্ত মধুর, ছন্দের ঝংকারও চমৎকার. মোটের উপর মন্দ হয় নাই, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না।"

নিরুদ্দেশ যাত্রা রচিত হয় ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০; সাধনায় প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যায়। এই কবিতাটি সম্পর্কে সাহিত্য (মাঘ ১৩০০) পত্রিকার মন্তব্য—

"নিরুদ্দেশ যাত্রা রবীন্দ্রবাবুর একটি কবিতা। কবিতাটি অতি চমৎকার, রবীন্দ্রনাথবাবুর পক্ষেই এরূপ কবিতাসৃষ্টি সম্ভবে। ভাব, ভাষা, ছন্দ ইহার সকলই সুন্দর। যে ভাষার ভাণ্ডারে এইরূপ কবিতারত্ন সঞ্চিত হইতেছে, সে ভাষার দৈন্য চিরদিন থাকিবে না, আমরা অনায়াসে এ আশা করিতে পারি।"

বিদায় অভিশাপের প্রকাশকাল মাঘ ১৩০০। এই রচনাটি সম্পর্কে সমকালীন সাহিত্য (ফাল্গুন ১৩০০) পত্রিকার অভিমত—

"বিদায় অভিশাপ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা, দুইটি মাত্র চরিত্র ও বিদায়ের দৃশ্য লইয়া নাটকীয় প্রথায় রচিত। কচ ও দেবযানী ইহার নায়ক নায়িকা। এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া দৃপ্ত হইয়াছি। বিস্তৃত সমালোচনার এ স্থান নহে,—দোষ ও গুণের সবিশেষ উল্লেখও এত অল্প পরিসর স্থানে

৪৫. সাহিত্য ১৩০০ অগ্রহায়ণ।

অসম্ভব। রবীন্দ্রবাবু কচের চরিত্র মহাভারত অপেক্ষা অনেক উন্নত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দ এমন অবলীলা কল্পিত, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। একেকটি বর্ণনা ও চিত্র যেন প্রকৃতির ফটোগ্রাফ। তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ শক্তিও প্রশংসনীয় এবং উপভোগের যোগ্য। রবীন্দ্রবাবু গীতিকবিতায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু তিনি চরিত্রসৃষ্টি করিয়া এখনও সফল হইতে পারেন নাই। আশা করি রবীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কাব্যজগতের চরিত্র হইতে আমরা শিক্ষা ও সুখ লাভ করিব।"

১৬ মাঘ তারিখে (১৩০০) নিত্যকৃষ্ণ বসু লিখেছেন—

"মাঘ মাসের 'সাধনা'য় রবিবাবুর 'বিদায় অভিশাপ' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কথোপকথনের আকারে লিখিত কচ ও দেবযানীর বিদায়দৃশ্য। রবিবাবু মিত্রাক্ষরের সহিত অমিত্রাক্ষরের পদ্ধতি মিশাইয়া আজ কাল যেরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বেশ প্রীতিপ্রদ। 'বসুন্ধরা'র পর ইহা বাহির হওয়াতে আমি রবীন্দ্রের ভাষা ও ছন্দের অবনতি মনে করিতেছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, ইহা বসুন্ধরার বহু পূর্বে রচিত। [৪৬] সুতরাং কবিতার ভাষা সম্বন্ধে তিনি যে দিন দিন উন্নতি করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমান কবিতায় 'ধর্ম জানে প্রতারণা করি নাই' ইত্যাদি গদ্যময় পংক্তি এবং যতি ও শব্দবিন্যাসের দোষ অনেক স্থলে দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর কবির স্বভাবসুলভ সুন্দর বর্ণনা ও সহজ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিতাটি পড়িতে বিরক্তবোধ হয় না। ব্রাহ্মণতনয় কচ স্বার্থময় প্রেমের উপর কর্তব্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং দেবযানীর কঠোর অভিশাপের বিনিময়ে যে উদার আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতার বর্ণনীয়। উদ্দেশ্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কবিতাটিকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। কচের চরিত্র মহাভারত হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছে।"[৪৭]

বিদায় অভিশাপের রচনাকাল সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

"ইহা পাবনা জেলার কালীগ্রামে কবির জমিদারী-কাছারীতে থাকার সময়ে লেখা, রচনার সময় ১২৯৯ সাল অথবা ১৩০০ সালের ২৬এ শ্রাবণ।"[৪৮]

৪৬. বসুন্ধরা, রচনাকাল ২৬ কার্তিক ১৩০০।

৪৭. নিত্যকৃষ্ণ বসু—সাহিত্য-সেবকের-ডায়েরি, সাহিত্য ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ।

৪৮. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবিরশ্মি প্রথম খণ্ড।

মূল আখ্যায়িকা থেকে কবির কাহিনীতে কিছু প্রভেদ আছে। মূল কাহিনীতে আছে, কচ কর্তব্যের অনুরোধে দেবযানীর প্রণয় ও নিজের স্বার্থসুখ উপেক্ষা করে স্বর্গে চলে যেতে উদ্যত হলে দেবযানী কচকে শাপ দিয়েছিলেন, কচ সেই শাপের বদলে দেবযানীকেও পাল্টা শাপ দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনীতে কচকে দিয়ে শাপের পরিবর্তে বর প্রদান করান।

বিদায় অভিশাপ প্রকাশিত হল ১৩০০ মাঘে, আর এই কবিতাটিকে অবলম্বন করে সাধনায় কাব্যের তাৎপর্য শীর্ষক প্রবন্ধ লিখলেন ১৩০১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। কাব্যের তাৎপর্য প্রবন্ধ পঞ্চভূতের অন্তর্গত। ব্যোমের জবানীতে কবি বিদায় অভিশাপের গল্পাংশ যেভাবে বিবৃত করেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সেখানে ব্যোমও মহাভারতের সঙ্গে অনৈক্যের উল্লেখটুকু করেছে। ব্যোমের কথা—

"শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ স্বর্গীয় নৃত্যগীতবাদ্যদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে কিন্তু সে সামান্য।"

পঞ্চভূতে মিলে এই কবিতার অর্থোদ্ঘাটনে নানা প্রকার চেষ্টা করে। শেষে কবি এসে বলেন—

"এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি-অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতশবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মত আওয়াজ করিতে

থাকে। তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না।...[৪৯] কোনো কাব্যের মধ্যে যদি বা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুমফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না, বিরোধে ফলও নাই।"

প্রেমের অভিষেক সাধনায় প্রকাশিত হয় ১৩০০ ফাল্গুন সংখ্যায়। কবিতাটি রচিত হয় জোড়াসাঁকোয়, তারিখ ১৪ মাঘ ১৩০০। সাধনায় প্রকাশের পর এই কবিতা চিত্রা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাধনার পাঠ ও চিত্রার পাঠ এক নয়। কবির চিঠি থেকে জানা যায় যে চিত্রার পাঠটিই কবি প্রথমে লিখেছিলেন। অর্থাৎ প্রথম রচিত পাঠটিই তিনি গ্রন্থে গ্রহণ করেন, পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠটি নয়। প্রেমের অভিষেক কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে লেখেন—

"প্রেমের অভিষেক কবিতাটি চিত্রা কাব্যে যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাকে সংশোধন বলা যায় না—কারণ, ইহাই উহার আদিম রূপ। সাধনায় যখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল তখন কাহারও কাহারও মনে এতই আঘাত করিয়াছিল যে, বন্ধুবিচ্ছেদ হইবার জো হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন, কোনো আপিস-বিশেষের কেরানি-বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসসহকারে ব্যক্ত করিলে

৪৯. স্রোতস্বিনীর উক্তি "কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।"

প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধভাবে দেখানো হয় — সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমানক্ষুব্ধ নিরুপায় কেরানির মুখে এ কথাগুলো যেন কিছু অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মতো শুনায়; উহার সহজ স্বতঃপ্রবাহিত সর্ববিস্মৃত কবিত্বরসটি থাকে না; মনে হয় সে মুখে যতই বড়াই করুক-না কেন, আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত আলোচনাদি শুনিয়া আমি গোড়ায় যেভাবে লিখিয়াছিলাম, সেইভাবেই প্রকাশ করিয়াছি।"[৫০]

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লেখেন প্রভাতকুমারের নিম্নোক্ত পত্রের উত্তরে —

"প্রেমের অভিষেক মাটি করিয়া দিয়াছেন মহাশয়? ইহার একটি উৎকৃষ্ট অংশ ছাঁটিয়া দিলেন কেন? আপনার এ ছাঁটা-রোগের জন্য কি তারকেশ্বরে হত্যা দিব? অপোগণ্ড সাহেব শাবক কি অপরাধ করিল? যাহারা এটি নূতন পড়িবে তাহাদের কেমন লাগিবে বলিতে পারি না, কিন্তু যাহারা সাধনায় পড়িয়াছিল, তাহারা হায় হায় করিবে। 'আমি' বলিয়া লিখিয়াছিলেন, চাকরি করিবার লজ্জার ভয়ে কি সেটুকু বাদ দিলেন?"[৫১]

আমরা সাধনার বর্জিত পাঠের পরিমাণ পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নির্দেশ করেছি।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রা কাব্যগ্রন্থের সূচনায় (শ্রাবণ ১৩৪৭) বলেছেন, "প্রেমের অভিষেক-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম।"

এই অংশ পাঠ করে মনে হয় সাধনার পাঠই প্রথম পাঠ। কিন্তু কবি এই কথাগুলি লেখেন কবিতা রচনা বা প্রকাশের সুদীর্ঘ কাল পরে। অপর দিকে প্রভাতকুমারকে কবি যে পত্র দেন তা কবিতা রচনার সমকালেই। সুতরাং প্রভাতকুমারকে কবি যে কথা বলেছেন তা-ই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য।

নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর সাহিত্য-সেবকের-ডায়েরিতে (২০ ফাল্গুন ১৩০০) লিখেছিলেন —

"ফাল্গুন মাসের সাধনায় রবীন্দ্রবাবুর 'প্রেমের অভিষেক' ইতি শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার আজকালকার প্রিয় সেই মিশ্রিত

৫০. শিলাইদহ, ৬ চৈত্র ১৩০২। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫।

৫১. দিলদারনগর, ৪ চৈত্র ১৩০২। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫।

পদ্ধতিতে লিখিত। কবিতাটিতে কঠোর কার্যময় জীবনের সহিত কাব্যের কল্পনাপূর্ণ আলস্যময় রাজ্যের একটুকু বেশ মধুর বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিরোধটা দুই এক স্থলে একটু হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন, বাহিরে (অর্থাৎ কলিকাতার কর্মক্ষেত্রে, ইংরাজের আফিসে) তিনি শত তাচ্ছিল্য বা অপমান সহ্য করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই;—মৃত্তিকার উপর আধিপত্য তিনি অকাতরে ইংরাজের করে ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে, তাঁহার উদার, প্রশান্ত প্রেমের প্রস্ফুটিত কুঞ্জে,—সেখানে তিনিই একমাত্র রাজা, তাঁহার প্রেমময়ী প্রণয়িনীর অসীম সোহাগ ও সৌন্দর্যগর্বে গৌরবান্বিত। সেখানে ইংরাজের আফিস, আদালত, চাকুরি, লাঞ্ছনা—কিছুই নাই। তথায় কেবল মহাশ্বেতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি হৃদয়ের গৃহ প্রেমের সৌরভে পূর্ণ করিয়া, বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন; আর কবি আপনাকে তাহাদেরই একজন নিতান্ত আত্মীয় ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছেন।"[৫২]

এবার ফিরাও মোরে ১৩০০ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত। রচনা স্থান ও কাল যথাক্রমে রামপুর-বোয়ালিয়া, ২৩ ফাল্গুন ১৩০০। এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

"যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ—

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়।...বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের...এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।...এ

৫২. নিত্যকৃষ্ণ বসু—সাহিত্য-সেবকের-ডায়েরি, সাহিত্য ১৩১০ ভাদ্র।

আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রস-সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।"[৫৩]

এবার ফিরাও মোরে কবিতায় কবির দৃপ্ত উচ্চারণ—

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

কিংবা,

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

এখন প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনে অকস্মাৎ কেন এই উত্তেজিত ভাব ধারণ করে, কেন নিপীড়িতদের জন্য তাঁর এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ বেদনা? সাধনায় যে সংখ্যায় এবার ফিরাও মোরে প্রকাশিত, সেই সংখ্যাতেই রাজনীতির দ্বিধা বলে কবির একটি প্রবন্ধও মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধের মধ্যে কবির তৎকালীন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে।···সভ্য খ্রীস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখ্রীস্টানের গালে খ্রীস্টানি চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।" আমাদের আলোচ্যপর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলিদের উপর ইংরেজ বণিকদের যে-অত্যাচার চলেছিল, তার কিছু কিছু সংবাদ বিলাতি কাগজ 'ট্রুথ' থেকে কবি জানতে পারেন। কবি বলেন, "ট্রুথ নামক বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।" কবি পরক্ষণেই বলেন, "পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন, সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেইসঙ্গে সেই অসভ্যতাকে বলিদান দিতে

৫৩. আত্মপরিচয়।

কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মত খসিয়া পড়ে; এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে। কিছু সসংকোচে বলিলাম—নিকৃষ্টতর নহে; নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে—অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্বর লবেঙ্গুলা[৫৪] ইংরাজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে, ইংরাজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "মাটাবিলিদের রাজা লবেঙ্গুলা ইংরেজ মিশনারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কিভাবে সর্বস্ব হারাইয়া অজ্ঞাত অখ্যাতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহার একমাত্র তুলনা হয় মীরকাশেমের সঙ্গে। 'ট্রুথ' নামক পত্রিকায় এই কাহিনী পাঠ করিয়া কবির মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে।"[৫৫]

এবার ফিরাও মোরে কবিতার কয়েক মাস পরে সাধনায় ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় মেঘ ও রৌদ্র গল্প মুদ্রিত হয়। এবার ফিরাও মোরে কবিতায় যে অপমানের বেদনা প্রকাশিত, মেঘ ও রৌদ্রের মধ্যে তা-ই গল্পাকারে ফুটে উঠেছে। আবার যে মনোভাব থেকে মেঘ ও রৌদ্রের ঘটনাগুলি অঙ্কিত, সেই মনোভাব থেকেই অপমানের প্রতিকার প্রবন্ধ (সাধনা ১৩০১ ভাদ্র) রচিত হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে অতিরিক্ত আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ ও সপ্তম অধ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে।

এবার ফিরাও মোরে সম্পর্কে সমকালীন সাহিত্য পত্রিকার মন্তব্য, "এবার ফিরাও মোরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিন্তাপূর্ণ মনোরম কবিতা।"[৫৬]

নববর্ষে কবিতাটি ১৩০১ নববর্ষে রচিত এবং বৈশাখের সাধনায় প্রকাশিত। রচনাস্থান জোড়াসাঁকো। কবিতাটি সম্পর্কে সাহিত্য পত্রিকার মন্তব্য, "নববর্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা—কিন্তু ইহাতে কিছু বিশেষত্ব নাই।"[৫৭]

৫৪. লবেঙ্গুলা (১৮৩৩-৯৪ খ্রী), ম্যাটাবিলির রাজা।

৫৫. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

৫৬. সাহিত্য ১৩০১ বৈশাখ।

৫৭. সাহিত্য ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ।

নববর্ষে কবিতার পরের মাসেই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠে (১৩০১) মৃত্যুর পরে শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালের দিক থেকে এক মাসের ব্যবধান হলেও রচনাকালের দিক থেকে সে ব্যবধান নেই। নববর্ষে ও মৃত্যুর পরে—উভয় কবিতাই ৫ বৈশাখ রচিত।

নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ তারিখের ডায়েরিতে লিখেছেন—

"জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথবাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতার নাম 'মৃত্যুর পরে'। বোধ হয় স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। আমাদের সম্পাদক সু-চন্দ্র ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এমন কি 'সাধনা' হইতে সেই কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া যত্নপূর্বক রাখিয়া দিবেন, এইরূপ ইচ্ছাও জানাইয়াছেন। আমি কিন্তু সমগ্র কবিতাটির তেমন সুখ্যাতি করিতে পারিতেছি না। আজকাল রবীন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান দোষ এই যে, উহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। বর্তমান কবিতাটির আধখানা বাদ দিলেও বোধ হয় কোনো ক্ষতি হয় না। বিষয়টির গাম্ভীর্যের সহিত তুলনা করিলে কবির নির্বাচিত ছন্দের গতি কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় দ্রুত বলিয়া অনুভূত হয়। অপেক্ষাকৃত ভালো শ্লোকগুলি রাখিয়া, অপরগুলি বাদ দিলে কবিতাটি বেশ সুন্দর হইতে পারিত।"[৫৮]

কয়েকদিন পরের ডায়রিতে (৫ আষাঢ় ১৩০১) নিত্যকৃষ্ণ বসু লিখেছেন—

"জ্যৈষ্ঠ মাসের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুর পরে' ইতি শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটি কাহার মৃত্যুর পরে লিখিত, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার যো নাই। অথচ সাধারণ ভাবে লইলে আদ্যোপান্ত অর্থ তত সঙ্গত হয় না। দু-একটা কথা বারংবার পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহা ব্যক্তিগত বলিয়াই বোধ হয়।"[৫৯]

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—

"মৃত্যুর পরে এমন-কি নববর্ষে কবিতার মধ্যে যে বিরহ-মৃত্যুর কথা আছে তাহা কাহার স্মরণে রচিত তাহা স্বল্প প্রচেষ্টায় আবিষ্কার করা যায়। পাঠকের স্মরণ আছে দশ বৎসর পূর্বে এই বৈশাখ মাসে (৮) শুক্লা নবমীর দিন তাঁহার বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকেই আজ স্মরণ হইতেছে, নূতন ভাবে তাঁহাকে আজ কবি দেখিতেছেন।"[৬০]

৫৮-৫৯. নিত্যকৃষ্ণ বসু—সাহিত্য-সেবকের-ডায়েরি, সাহিত্য ১৩১০ মাঘ।

৬০. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

সাহিত্য পত্রিকা এই কবিতাটি সম্পর্কে লেখে—

"এবারকার সাধনার প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা 'মৃত্যুর পরে'। এই সুন্দর, ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কবিতার নিগূঢ় রহস্যরস কেবল অনুভবগম্য।"[৬১]

১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হল দীর্ঘ কবিতা অন্তর্যামী। কবিতাটির রচনাকাল ১৩০১ ভাদ্র। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন "কবি যখন বোটে করিয়া পতিসর হইতে দীঘাপতিয়া দিয়া বোয়ালিয়াতে যাইতে-ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।"[৬২]

কবি বোয়ালিয়া থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখের পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, "এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার অন্তর-জীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।"[৬৩]

কবিতা রচনার কয়েক মাস পূর্বে পতিসর থেকে ২৮ মার্চ ১৮৯৪ তারিখের (১৫ চৈত্র ১৩০০) চিঠিতে কবি ইন্দিরা দেবীকে যে-কথা লিখেছিলেন তা বর্তমান কবিতাটি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—

"আজ মনে করলুম জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব—বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব। এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—কাল দেখি কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর-একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর কিছুতেই মনে হয় না এ দুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠতে পারব। এ-সব উৎপত্তি কোন্খানে? কোন্ শিরার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে কী একটা নড়্‌চড়্‌ হয়ে গেছে, মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয়—কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারি নে—মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই,

৬১. সাহিত্য ১৩০১ আষাঢ়।

৬২. রবিরশ্মি প্রথম খণ্ড।

৬৩. ছিন্নপত্রাবলী।

আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে—জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব—আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্যভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল! বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না, অথচ সব-সুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি! তুমি তো ভারী তুমি—তোমার নিজের কতটুকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানোযন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে; কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটেই জানি।"[৬৪]

অন্তর্যামী কবিতাটির কবিকৃত দীর্ঘ ব্যাখ্যা পাই তাঁর আত্মপরিচয় নামক গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন—

"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।

৬৪. ছিন্নপত্রাবলী।

অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন স্থরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয় যেন সে বন-লক্ষ্মীর সাধনার চরমধন। কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ মাত্র সে কথা গোপনে থাকে—বর্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত; কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনাসম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষমাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক-একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে,

কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ স্বর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না। সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্ত্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে—কিন্তু সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই-যে সুরটা, সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে যে-একটা রঙ ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন, 'বলো বলো, তোমার কথাটাই বলো। ঐ কথাটার জন্যই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।' এই

বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন ; স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন এবং আমার কথার ভিতর দিয়া কী-সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার—
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখ ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,

গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে—
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে।

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।"

চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সাধনা শিরোনামে একটি কবিতা প্রকাশিত হল। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যার অর্থ ১৩০১ অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বনামে সাধনার সম্পাদক হন। কবিতাটি অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। মনে হয় সাধনার জন্যই সাধনা রচিত। কবিতাটি ১৩০১এর ৩ কার্তিক রচিত হয়ে অগ্রহায়ণে ছাপা হয়।

সন্ধ্যা ১৩০১ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। কিন্তু রচিত হয় প্রকাশের প্রায় এক বৎসর পূর্বে, ১৩০০র ৯ ফাল্গুন সন্ধ্যায়। রচনাস্থল পতিসর। এই পতিসর থেকে ১৯ ফেব্রুআরি ১৮৯৪ তারিখে কবি লিখছেন, "যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন—গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধু ধু করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুকনো ঘাসের মতো আছে, সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে।"[৬৫] এই চিঠির পর দিন (৯ ফাল্গুন ১৩০০,

৬৫. ছিন্নপত্রাবলী।

২০ ফেব্রুআরি ১৮৯৪) লিখলেন সন্ধ্যা কবিতাটি। নির্জন পারিপার্শ্বিকের স্তব্ধ সন্ধ্যা কবিচিত্তে বিচিত্র সুর ধ্বনিত করে তুলেছে।

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না, শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই-তিন
কুটির অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বসুন্ধরার জীবনের ইতিহাস তাহার বাল্যকালে নীহারিকা-অবস্থা, যৌবন কালে উজ্জ্বল অবস্থা, এবং তাহার কোলে কালে কালে কত কত জীব জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আবার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কঙ্কালাবশেষ ভূপঞ্জরের স্তরে স্তরে প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, জীব-জগতে কত দ্বন্দ্ব ও কত যোগ্যজনের উদ্বর্তনের ও জীবের ক্রমপরিণতির কাহিনী তাহার অন্তরে অন্তরে লেখা রহিয়াছে—এই সব কথা যেন বিষাদিনী পৃথিবী দিনান্তের বেলাটি ধরিয়া চিন্তা করিতেছে। ভূতত্ত্বের এই বৈজ্ঞানিক তথ্য যে এমন সুন্দর কবিতায় পরিণত হইতে পারে, তাহা এই কবিতা না পড়িলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।"৬৬

১৩০১ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মণ। কবিতাটি রচিত হয় শিলাইদহে ওই মাসের ৭ তারিখে। ব্রাহ্মণ কবিতাটির মূল আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড থেকে গৃহীত।

এই কবিতা রচনার দীর্ঘকাল পর ১৯৩৯এর ২৯ আগষ্ট তারিখের একটি রচনায় কবির মন্তব্য—

"আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জাবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন করে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য বলে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যানমাত্র—কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো

৬৬. রবিরশ্মি প্রথম খণ্ড।

অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয় নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়।"৬৭

এখানে প্রথমে মূল আখ্যায়িকাটি উদ্ধার করা গেল।

"একদা সত্যকাম জাবাল জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে (গুরুগৃহে) বাস করিতে চাই ; (সুতরাং) জিজ্ঞাসা করি, আমি কোন্ গোত্রীয় ?' জবালা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। বহুকর্মব্যাপৃতা ও বহুপরিচর্যানিরতা (বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে। আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম, সুতরাং তুমি সত্যকাম জবালা বলিয়াই পরিচয় দিও।' তিনি হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমি ভবৎসমীপে ব্রহ্মচর্য-বাস করিব ; মহাশয়কে আচার্যরূপে পাইতে চাই।' গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সৌম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয় ?' তিনি বলিলেন, 'মহাশয়, আমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, বহুকর্মব্যাপৃতা ও পবিচারণশীলা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং মহাশয়, আমি সত্যকাম জবালা।' (আচার্য) সত্যকামকে বলিলেন, 'এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে বলিতে পারে না। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমায় উপনীত করিব ; কারণ তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।' "৬৮

ব্রাহ্মণ কবিতাটি সংস্কৃত ছন্দে রচিত নয় বলে 'কাব্যবিচারক' এই কবিতাকে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন—রবীন্দ্রনাথ এরূপ আশঙ্কা করেছিলেন। এখন দেখা যাক একজন প্রবীণ বিশিষ্ট কাব্যবিচারক এই কবিতাটি সম্পর্কে কি বলেন।

প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "ছন্দে রচিত ব্রাহ্মণ কবিতাটি কিছুমাত্র হাল্কা হয় নি বরংচ কোনো কোনো অংশে মূলের চেয়ে স্পৃহনীয়তর হয়ে উঠেছে। মূলে আছে সত্যকাম গোড়াতেই গোত্র রহস্য জেনে নিয়ে ঋষির আশ্রমে যাত্রা করেছে, ব্রাহ্মণ কবিতায় গোত্র-

৬৭. গদ্যকাব্য, সাহিত্যের স্বরূপ।

৬৮. উপনিষৎ গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়।

রহস্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারে সত্যকাম গোত্র বলতে পারে নি, ফিরে এসে জেনে নিয়েছে, দ্বিতীয়বারে গিয়ে জানিয়েছে। গোত্র না জেনে আসা যে উচিত হয় নি, এই গ্লানি নিয়ে ফিরে এল সত্যকাম, কিন্তু তখন জানত না যে গুরুতর গ্লানি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরদিন গিয়ে সত্যকাম প্রকৃত ঘটনা জানালো গৌতমকে। গোত্র সম্বন্ধে মাতা ও পুত্রের সত্যনিষ্ঠা কবিতাটির প্রাণ। কাজেই এই ঘটনাটি কিছু বিস্তারিত হওয়ায় তার উপরে কল্পনার আলো বেশি পড়বার সুযোগ পেয়েছে। আখ্যায়িকাকার এ ভাবে লিখবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, কেননা সে যুগে কোনো বালক গোত্র না জেনে নিয়ে গুরুগৃহে যাত্রা করবে না। এ যুগের কবি সে যুগের সংস্কারে বদ্ধ নন, বিশেষ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে মাতা, পুত্র এবং প্রসঙ্গতঃ ঋষির সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন, সেই জন্যেই গোত্ররহস্যের উপরে কিছু বেশি আলো নিক্ষেপ করতে হয়েছে।"[৬৯]

সত্যকাম-জবালার কবিকৃত গদ্যছন্দে রূপান্তর—

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললে,
"ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?"
তিনি বললেন, জানিনে তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,
তাই জানিনে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।"
সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।"
তিনি বললেন, "সৌম্য, কী গোত্র তুমি?"
সে বললে, "আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন, যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।"

৬৯. দ্রষ্টব্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

তিনি তখন বললেন, "এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাওনি তুমি।
সমিধ্‌ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।"[১০]

পুরাতন ভৃত্য কবিতা শিলাইদহে ১২ ফাল্গুন ১৩০১ রচিত এবং চৈত্র মাসে প্রকাশিত। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "এককালে যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই শুনা যাইত অধিক এবং যাঁহাদের নিন্দা করাই ছিল পেশা, তাঁহারাও রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটির প্রশংসা করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একদিন আমার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন – রবিবাবুর একশতটি কবিতা বাছিয়া ভালো বলা যাইতে পারে, আর তাহার মধ্যে 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতা দুইটি প্রধান।"[১১]

জ্যোৎস্নারাত্রে কবিতাটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৫-৬ মাঘ রাত্রে রচিত এবং সাধনায় ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত। লক্ষণীয় বিষয়, কবিতাটি রচনার ষোল মাস পর কবিতাটি প্রকাশিত। প্রেমের অভিষেকও ১৩০০র মাঘ মাসে লেখা, কিন্তু মুদ্রিত হয় রচনার পরের মাসেই, অর্থাৎ ১৩০০ ফাল্গুনে। জ্যোৎস্নারাত্রে কবিতাটি রচনার পর প্রায় দেড় বছর কেন মুদ্রিত হয় নি কৌতূহলের বিষয়। অথচ দেখি জ্যোৎস্নারাত্রে কবিতাটি রচিত হবার পর সাধনায় এমন কোনো কোনো সংখ্যা গেছে যাতে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও ছাপা হয় নি।

দুই বিঘা জমি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ রচিত এবং পরের মাস আষাঢ়েই প্রকাশিত। কবিতাটি শিলাইদহে লিখিত। "নানা দিক দিয়া কবিতাটি বাংলার কাব্যসাহিত্যে একটি নব যুগের সূচনা করিয়াছে। বাংলার শোষিত ও উৎপীড়িত কৃষক এই সর্বপ্রথম মুখর হইয়া বাংলা কাব্যে অবতীর্ণ হইলেন।"[১২]

সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতাটির নাম শীতে ও বসন্তে। রচনা ১৮ আষাঢ় ১৩০২, প্রকাশ শ্রাবণ ১৩০২।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ছন্দ, সম্পূরণ।
১১. রবিরশ্মি প্রথম খণ্ড।
১২. নেপাল মজুমদার – ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড।

প্রথম শীতের মাসে / শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে,
　　হি হি করে কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবিলাম মনে / এবার মাতিব রণে,
বৃথা কাজে অকারণে
　　কেটে গেছে দিনরাত্র।
লাগিব দেশের হিতে / গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে
　　করবি না অনাসৃষ্টি।
লেখা হবে সারবান / অতিশয় ধারবান,
খাড়া রব দ্বারবান
　　দশ দিকে রাখি দৃষ্টি।

কিন্তু,

এক দিন বসে বসে / লিখিয়া যেতেছি কষে
এ দেশেতে কার দোষে
　　ক্রমে কমে আসে শস্য,
কেনই বা অপঘাতে / মরে লোক দিবারাতে,
কেন ব্রাহ্মণের পাতে
　　নাহি পড়ে চর্ব্য চোষ্য।
হেন কালে দুদ্দাড় / খুলে গেল সব দ্বার—
চারি দিকে তোলপাড
　　বেধে গেছে মহাকাণ্ড।
নদীজলে বনে গাছে / কেহ গাহে কেহ নাচে,
উলটিয়া পড়িয়াছে
　　দেবতার সুধাভাণ্ড।
উতলা পাগল-বেশে / দক্ষিণে বাতাস এসে
কোথা হতে হাহা হেসে
　　প'ল যেন মদমত্ত।
লেখাপত্র কেড়েকুড়ে— / কোথা কী যে গেল উড়ে,

ওই রে আকাশ জুড়ে
ছড়ায় 'সমাজতত্ত্ব'।

এই কবিতাটিতে কবি যে কথা বলেছেন, তা কবিতাটি রচনার পরের দিনে লেখা একটি পত্রে গদ্যে প্রকাশ করেছেন। "কাল থেকে সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা মনে করেছিলুম তাই। বেশ লাগছে। মাথার উপরে ছাদটা অনেক উঁচুতে এবং দুই পাশে দুই খোলা বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে—এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে বসে ভাবতে ভারি মধুর লাগে। আর-একটি বেশ লাগে—কাজ করতে করতে কোনো-এক দিকে মুখ ফিরোলেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও হাজির। যেন প্রকৃতি কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো সর্বদাই আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে। আমার ঘরের এবং মনের—আমার কাজের এবং অবসরের চারি দিক প্রসন্ন প্রফুল্ল, সরস এবং সজীব, নবীন এবং সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা, একটা স্বর্গীয় কবিতায়—অ্যাপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি!"[৭৩]

সাধনার শেষ সংখ্যা ১৩০২ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক সম্মিলিত সংখ্যা। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা মুদ্রিত হয় নি।

৭৩. ছিন্নপত্রাবলী, ২ জুলাই ১৮৯৫ (১৯ আষাঢ় ১৩০২)।

রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ : সাধনার মূলপাঠ

বিম্ববতী

সাধনা। ১২৯৯ বৈশাখ, পৃষ্ঠা ৫৩৫।

সোনার তরী। রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ) প্রথম খণ্ড।

র র ১, পৃ ৩৪৪, ছত্র ১৯ (কবিতার প্রথম ছত্র) –

সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল করবী,

সাধনায় –

যতনে সাজিল রাণী, বাঁধিল করবী,

র র ১, পৃ ৩৪৬, ছত্র ১০ –

বালু দিয়ে – প্রতিবিম্ব না হইল দূর।

সাধনায় –

বালু দিয়ে – প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।

শৈশব সন্ধ্যা

সাধনা। ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭২।

সোনার তরী। র র ১, পৃ ৩৪৬।

কাব্যগ্রন্থে যেখান থেকে কবিতাটি শুরু (ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার) সাধনায় তার পূর্বে আরও ২২ ছত্র ছিল –

দুই ধারে চষা মাটি ; মাঝে আঁকাবাঁকা

... ...

শুনি' সকরুণ ডাক পরাণ উদাসে।

র র ১, পৃ ৩৪৭, ছত্র ৩ –

যেতে যেতে গৃহমুখে বালক-পথিক।

সাধনায় –

যেতে যেতে গৃহমুখী বালকপথিক।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

সাধনা। ১২৯৯ আষাঢ়, পৃ ১০৫।

সোনার তরী। র র ১।

র র ১, পৃ ৩৪৮, ছত্র ২১—

উপরে বসে রাজার মেয়ে,

সাধনায়—

উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,

হিং টিং ছট্

সাধনা। ১২৯৯ শ্রাবণ, পৃ ১৯৩।

সোনার তরী। র র ১।

র র ১, পৃ ৩৬১, ছত্র ৭—

পাখির মতন রাজা করে ছট্‌ফট্‌,

সাধনায়—

পাখীর মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌,—

র র ১, পৃ ৩৬১, ছত্র ১৭—

সারি সারি বসে গেছে কথা নাহি মুখে,

সাধনায়—

সারি সারি বসে' গেছে কথা নাই মুখে,

পরশপাথর

সাধনা। ১২৯৯ ভাদ্র, পৃ ৩০৪।

সোনার তরী। র র ১।

র র ১, পৃ ৩৬৫, ছত্র ৮—

উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।

সাধনায়—

উড়ে' উড়ে' খুঁজে কারে নিজের আলোকে।

তোমরা এবং আমরা

সাধনা। ১২৯৯ পৌষ, পৃ ১৩৬।

সোনার তরী। র র ১, পৃ ৩৫৫।

কাব্যগ্রন্থে কবিতার শিরোনাম—তোমরা ও আমরা।

সভাভঙ্গ

সাধনা। ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৩৯৪।

কাহিনী। র র ১, পৃ ৬৭৫।

কাব্যগ্রন্থে কবিতার শিরোনাম—গানভঙ্গ।

হৃদয়যমুনা

সাধনা। ১৩০০ শ্রাবণ, পৃ ২৮১।

সোনার তরী। র র ১।

র র ১, পৃ ৪১০, ছত্র ১১—

যদি গাহন কহিতে চাহ

সাধনায়—

যদি গাহন করিতে চাহ

র র-তে ছাপার ভুল।

তুলনায় সমালোচনা

সাধনা। ১৩০০ অগ্রহায়ণ, পৃ ৬২।

সোনার তরী। র র ১, পৃ ৪৪৬।

কাব্যগ্রন্থে কবিতার শিরোনাম—কণ্টকের কথা।

র র ১, পৃ ৪৪৭, ছত্র ১৩—

আসিবে তো শীত, বিহঙ্গগীত

সাধনায়—

আসিবেক শীত, বিহঙ্গগীত

প্রেমের অভিষেক

সাধনা। ১৩০০ ফাল্গুন, পৃ ৩৪৭।

চিত্রা। র র ১, পৃ ৪৬৯।

কাব্যগ্রন্থে এই কবিতার যেখানে সূচনা, সাধনায় তার পূর্বে আরও ৮২ ছত্র ছিল—

কি হবে শুনিয়া, সখি, বাহিরের কথা,
... ...
যত দৈন্য থাক মোর, দীন নহি তবু ;

র র ১, পৃ ৪৭০, ছত্র ৭-৯—

সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি ; অমরবীণায়

সাধনায়—

সে অন্তর অন্তঃপুরে! পূর্বে একদিন
বধির জীবন ছিল সঙ্গীত-বিহীন,
প্রেমের আহ্বানে আজি আমার সভায়
এসেছে বিশ্বের কবি, তারা গান গায়
মোদের দোঁহারে ঘিরি ;—অমরবীণায়

র র ১, পৃ ৪৭০, ছত্র ১৫—

উৎকণ্ঠিত তান।

সাধনায় এরপর ছিল—

আধুনিক রাজধানী,
আমি তারি আধুনিক ছেলে, ঘরে আনি
চাকুরীর কড়ি, ফিরে আসি দিনশেষে
কর্ম হতে ; জন্মিয়াছি যে কালে যে দেশে
না হেরি মাহাত্ম্য কিছু, কোন কীর্তি নাই,
তবু খ্যাতিহীন আমি কত সঙ্গী পাই
কত গৌরবের! তব প্রেমমন্ত্রবলে
ইতর জনতা হতে কোথা যাই চলে'
নব দেহ ধরি!

র র ১, পৃ ৪৭০, ছত্র ২৬ –

মহেশমন্দিরতলে বসি একাকিনী

সাধনায় –

শিবের মন্দিরতলে বসি একাকিনী

র র ১, পৃ ৪৭০, ছত্র ৩৬ –

করুণায়, বাঁশরির ব্যথাপূর্ণ তান

সাধনায় –

করুণায় বাঁশরীর ব্যথাঙ্কিত তান

র র ১, পৃ ৪৭১, ছত্র ১০-৩৫ –

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে এক জন – সদা বহি
... ...
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট।

সাধনায় –

হের সখি গৃহছাদে
জ্যোৎস্নার বিকাশ! এত জ্যোৎস্না এত সাধে
আর কোথা আছে! প্রভুত্বের সিংহাসন
রুদ্ধদ্বার অন্ধকারে করিছে যাপন
কর্মশালে কর্মহীন নিশি! এ কৌমুদী
আমাদের দুজনের! দুটি আঁখি মুদি'
বারেক শ্রবণ কর – সুগম্ভীর গান
ধ্বনিতেছে বিশ্বান্তর হতে, দুটি প্রাণ
বাঁধিছে একটি সুরে! স্তব্ধ রাজধানী
দাঁড়াইয়া নতশিরে, মুখে নাহি বাণী!

এবার ফিরাও মোরে

সাধনা। ১৩০০ চৈত্র, পৃ ৪২৬।
চিত্রা। র র ১।

র র ১, পৃ ৪৭৫, শেষ ছত্র —

চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন -

সাধনায় —

চিরজন্ম তারি লাগি জ্বালায়েছে হোম-হুতাশন ; -

নববর্ষে

সাধনা। ১৩০১ বৈশাখ, পৃ ৪৬৯

চিত্রা। র র ১।

র র ১, পৃ ৪৭৯, ছত্র ১৩ —

আজ চলে গেলে কাল কী হবে না-হবে

সাধনায় —

আজি চলে' গেলে' কাল কি হবে না হবে।

র র ১, পৃ ৪৭১, ছত্র ৩৫ —

এক দিন প্রিয়মুখ যত

সাধনায় —

আজি তবে সকলের মুখ.

অন্তর্যামী

সাধনা। ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ ৪০৯।

চিত্রা। র র ১।

র র ১, পৃ ৪৯৩, ছত্র ২১ —

যেন সচেতন বহ্নিসমান

সাধনায় —

চেতন অগ্নিশিখার সমান

র র ১, পৃ ৪৯৫, ছত্র ১৯-২১ —

এমনি টুটিয়া মর্মপাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু নির্ঝর,
জানি না খুঁজিয়া কী মহাসাগর

সাধনায় –

এমনি টুটিয়া মর্ম-দুয়ার
অশ্রু-নিঝর ছুটিবে আবার,
জানি না খুঁজিয়া কোন্ পারাবার

র র ১, পৃ ৪৯৫,

কাব্যগ্রন্থে এই কবিতা যেখানে শেষ হয়েছে, সাধনায় তারপর আরও ১২৬ ছত্র ছিল –

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি এ জীবনে ভুবনে ভবনে
হইবে নিখিলজয়ী,
... ...
ঝটিকার মাঝে যেতে চায় ছুটে, –
কারে মনে পড়ে বুঝি ?
কর্মের স্রোতে জন-তরঙ্গে
তোমারে বেড়ায় খুঁজি !

ব্রাহ্মণ

সাধনা। ১৩০১ ফাল্গুন, পৃ ৩৭৫।

কথা। র র ১।

র র ১, পৃ ৬১৯, ছত্র ২৫-২৬ –

শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে

সাধনায় –

শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়

জ্যোৎস্নারাত্রে

সাধনা। ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭২।

চিত্রা। র র ১, পৃ ৪৬৭।

কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত কবিতার প্রথম আট ছত্র সাধনায় নেই—

শান্ত করো, শান্ত করো এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমাযামিনী। অতিশয়
উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত
বারম্বার, তুমি এস স্নিগ্ধ অশ্রুপাত
দগ্ধ বেদনার 'পরে। শুভ্র সুকোমল
মোহভরা নিদ্রাভরা করপদ্মদল,
আমার সর্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া
বিভাবরী, সর্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোট ছোট
গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য
হলে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মোট গল্পের সংখ্যা ছত্রিশ। এখানে প্রথমে গল্পগুলির নাম ও প্রকাশ কাল দেওয়া গেল।

গল্পের নাম	পত্রিকা	প্রকাশ কাল
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	সাধনা	১২৯৮ অগ্রহায়ণ
সম্পত্তিসমর্পণ	"	পৌষ
দালিয়া	"	মাঘ
কঙ্কাল	"	ফাল্গুন
মুক্তির উপায়	"	চৈত্র
ত্যাগ	"	১২৯৯ বৈশাখ
একরাত্রি	"	জ্যৈষ্ঠ
একটা আষাঢ়ে গল্প	"	আষাঢ়
জীবিত ও মৃত	"	শ্রাবণ
স্বর্ণমৃগ	"	ভাদ্র-আশ্বিন
রীতিমত নভেল	"	ভাদ্র-আশ্বিন
জয়পরাজয়	"	কার্তিক
কাবুলিওয়ালা	"	অগ্রহায়ণ
ছুটি	"	পৌষ
সুভা	"	মাঘ
মহামায়া	"	ফাল্গুন
দানপ্রতিদান	"	চৈত্র
সম্পাদক	"	১৩০০ বৈশাখ

গল্পের নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল
মধ্যবর্তিনী	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ
অসম্ভব কথা	"	আষাঢ়
শাস্তি	"	শ্রাবণ
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	"	ভাদ্র
সমাপ্তি	"	আশ্বিন-কার্তিক
সমস্যাপূরণ	"	অগ্রহায়ণ
অনধিকার প্রবেশ	"	১৩০১ শ্রাবণ
মেঘ ও রৌদ্র	"	আশ্বিন-কার্তিক
প্রায়শ্চিত্ত	"	অগ্রহায়ণ
বিচারক	"	পৌষ
নিশীথে	"	মাঘ
আপদ	"	ফাল্গুন
দিদি	"	চৈত্র
মানভঞ্জন	"	১৩০২ বৈশাখ
ঠাকুরদা	"	জ্যৈষ্ঠ
প্রতিহিংসা	"	আষাঢ়
ক্ষুধিত পাষাণ	"	শ্রাবণ
অতিথি	"	ভাদ্র-কার্তিক

এখানে দেখা যাচ্ছে সাধনার প্রথম বর্ষে (১২৯৮ অগ্রহায়ণ-১২৯৯ কার্তিক) প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ১২, দ্বিতীয় বর্ষে ১১, তৃতীয় বর্ষে ৩ এবং চতুর্থ বর্ষে মুদ্রিত গল্পের সংখ্যা ১০। অর্থাৎ প্রথম বর্ষে মোট ১১ সংখ্যায় ১২টি, দ্বিতীয় বর্ষে ১১ সংখ্যায় ১১টি, তৃতীয় বর্ষে ১১ সংখ্যায় ৩টি এবং সর্বশেষ চতুর্থ বর্ষে মোট ১০টি সংখ্যায় ১০টি ছোটগল্প মুদ্রিত।

এই গল্পগুলির মধ্যে যেগুলির বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা গেছে তা প্রদত্ত হল।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ॥ সাধনার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন মুদ্রিত হয়। সাধনার তৃতীয় সংখ্যায় 'প্রশ্ন' বিভাগে কৃষ্ণনগর থেকে শরৎকুমারী দেবীর যে পত্র ছাপা হয় তা উদ্ধার করা যায়।

"গত অগ্রহায়ণ মাসের সাধনায় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' উপন্যাস পাঠ করিয়া রাইচরণের সংসার ত্যাগের কারণ স্থির করিতে পারিলাম না—রাইচরণ কি ফেল্‌নার ও অনুকূলবাবুর ব্যবহারে ভগ্ন-হৃদয় হইয়াছিল?"

'উত্তরে' সম্পাদক জানিয়েছেন—

"তাহাই বটে। পাঠিকা ভাবিয়া দেখিবেন, অনুকূলবাবু ফেল্‌নাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া রাইচরণকে দূর করিয়া দিলে পর পৃথিবীতে তাহার আর কোন বন্ধন রহিল না। এতদিন একান্ত মনে যে উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া রাইচরণ জীবন যাপন করিতেছিল ফেল্‌নাকে পরহস্তে সমর্পণ করিয়া রাইচরণ তাহা হইতেও বিচ্যুত হইল। অতঃপর তাহার জীবনের কোন বন্ধন অথবা উদ্দেশ্য রহিল না। বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবীতে নূতন সম্বন্ধ, জীবনের নূতন উদ্দেশ্য গ্রহণ করাও সহসা সম্ভব নহে।"

চন্দ্রনাথ বসু সাধনায় খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন পাঠ করে কবিকে যে-চিঠিটি দেন তা এই—

"খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন নামক গল্পটি আমাকে বড় সুন্দর বোধ হইয়াছে। কেমন করিয়া কি ঘটাইছ তাহা ঠিক ঠিক বুঝাইয়া দিতে পারি না, কিন্তু অস্বাভাবিকও কিছু দেখি না, যথার্থ প্রতিভাপ্রসূত পদার্থ—পরিমাণে যৎকিঞ্চিৎ, গুণে অপূর্ব। হিতবাদীতে বোধ হয় যেন এক পোষ্ট মাষ্টারের গল্প লিখিয়াছিলে—তাহাতে সচরাচর যাহাকে কবিত্ব বা sentiment বলে তাহা বেশি ছিল। কিন্তু সে গল্পটা আমাকে এত ভাল লাগে নাই। এটাতে মানবপ্রকৃতিজ্ঞান বড় সরল ও সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—সেটাতে তেমন কিছুই হয় নাই, যা হইয়াছে তা অদ্ভুত রকমের নয়। এটা যথার্থই একটা অপূর্ব জিনিস হইয়াছে। সে ছবির অনেকটা আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। এ ছবিটা মনে এমনি বসিয়া গিয়াছে, এমনি বসিয়া পড়িয়াছে যে কখনই মুছিয়া যাইবে না। এটা প্রতিভার তুলিতে আঁকা। তোমার তুলিতেও বোধহয় আর এমন ছবি উঠে নাই।"[১]

দালিয়া॥ দালিয়া পাঠ করে চন্দ্রনাথ বসু কবিকে পত্র দেন।

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ়।

"দালিয়াটুকু বীরে-মধুরে বড়ই মনোহর হইয়াছে। এটুকু কাব্য—উপন্যাস নামে। আর এই মনোহর কবিত্বটুকুর সর্বাপেক্ষা মনোহর স্থান—সেই শেষটুকু, ছুরিকার সেই ঝিকি ঝিকি হাসিটুকু। খোকাবাবুতে মানবপ্রকৃতির রহস্য অতি নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছ—দালিয়াতে কবিত্বের বড় কোমল একটি কলি ফুটাইয়া দিয়াছ। খোকাবাবু বুঝিয়া দেখিবার জিনিস, দালিয়া ভোগ করিবার জিনিস—কিন্তু দুইয়েতেই—আনন্দ অপার। দালিয়াতে প্রাচীনকালের—দস্যুতস্করদের সময়ের একটু ভাঁজ আছে—তাই দালিয়া কিছু romantic কাব্য ও romance-এর সুন্দর মিলন-মিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু কবিত্বই প্রবল।"[২]

দালিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যেটুকু আছে সে আছে বহিঃপ্রাঙ্গণে—অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই নিয়েছে ছুটি। আসল গল্পটা যোলো আনাই গল্প।"[৩]

কঙ্কাল॥ ছেলেবেলাকার পড়ার ঘরে টাঙানো নরকঙ্কালের স্মৃতি থেকে কঙ্কাল গল্পের উদ্ভব। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শুতুম, তাতে একটা মেয়ের skeleton ঝুলনো ছিল। আমাদের কিন্তু কিছু ভয়-টয় করত না। তারপর অনেক দিন কেটে গিয়েছে, আমার বিয়ে-টিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি তখন ভিতর-বাড়িতে শুই। একদিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তাঁরা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেক দিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধ হয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমার মনে হতে লাগল কে যেন মশারির চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে 'আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল, আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?' ক্রমে মনে হতে লাগল সে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই আমার মাথায় গল্প এসে গেল আর-কি।"[৪]

জীবিত ও মৃত॥ জীবিত ও মৃত গল্পটি লেখকের মনে কিভাবে উদয় হয়েছিল এ-সম্বন্ধে কবি নিজেই কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন।

২. বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ়।

৩. চিঠিপত্র ৯।

৪. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। সীতা দেবী—পুণ্যস্মৃতি।

"ছোট বৌ [মৃণালিনী দেবী] তখনও বেঁচে। আমার তখনকার দিনে ভোর রাত্রিতে উঠে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি অনেক রকম কবিত্ব ছিল। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়েছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত। অন্ধকার বারান্দার ভিতর দিয়ে, দালান পার হয়ে আমি grope করতে করতে চলতে লাগলুম। সব ঘরে দরজা বন্ধ, এ ঘরে ন'বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সে ঘরে অন্য কোনো বৌঠান ঘুমচ্ছেন, সব একেবারে নীরব, নিঝুম। খানিক দূরে আসতেই আপিস ঘরে না কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, ভাবলুম, তাই তো, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়িময় এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ মনে হল আমি যেন প্রেতাত্মা এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়, আমির রূপ ধরে বেড়াচ্ছি মাত্র। একটা খেয়াল মাথায় এল যে, আচ্ছা, আমি যদি এখন পা টিপে টিপে ঘরে গিয়ে মশারিটা তুলে খুব solemn ভাবে প্রশ্ন করি, 'তুমি জান আমি কে?' তাহলে কেমন হয়? অবশ্য আমি তা করিনি, করলে খুব একটা scene হত নিশ্চয়। হয়তো রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে সে ভাবতেও পারত, 'তাই তো, এ সত্যিই আর কিছু নয় তো?' কিন্তু ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্যসত্যই নিজেকে মৃত বলে মনে করছে।"[৫]

কবির অপর একটি উক্তি—

"অনেকদিন আগে কলকাতার বাড়িতে, ঠিক সময়টা মনে পড়ে না তবে ছোট বৌ তখন ছিলেন, একবার আত্মীয় স্বজন হঠাৎ এসে পড়ায় আমার বাইরের বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভিতরে ছিলুম, এক সময়ে যখন আমার নির্দিষ্ট শোবার জায়গায় যাব বলে চলেছি—ভিতর বাড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে চারিদিক, আলো-অন্ধকারে বড় বড় ছায়ায় মিলে সে এক গভীর রাত্রি। সত্যিকারের রাত বলা যায় তাকে। বারান্দায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে এল একটা কল্পনা, যেন এ-আমি আমি নই। যে-আমি ছিলুম সে আমি নয়, যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে কেমন হয়? মনে হল যদি পা টিপে টিপে ফিরে গিয়ে ছোট বৌকে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে বলি—

৫. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। সীতা দেবী—পুণ্যস্মৃতি।

দেখ এ-আমি কিন্তু আমি নয়, তোমার স্বামী নয়, তাহলে কি হয়।...যা হোক তা করিনি। চলে গেলুম শুতে, কিন্তু সেই রাত্রে এই গল্পটা আমার মাথায় এল, যেন একজন কেউ দিশাহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও মনে করছে অন্য সকলেও মনে করছে যে, সে সে নয়।"[৬]

১৩৫২ অগ্রহায়ণ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে 'রবীন্দ্রনাথের জীবিত ও মৃত' শীর্ষক প্রবন্ধে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী লেখেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পাবনার উকিল ও 'ঠাকুর-জমিদারবাবুদের ঘরের উকিল ও আমমোক্তার' তারকনাথ অধিকারীর নিকট বাল্যে শচীন্দ্রনাথ একটি সত্য ঘটনার বিবরণ শুনেছিলেন যার অনেক অংশ জীবিত ও মৃত কাহিনীর প্রথমাংশের অনুরূপ। ঘটনাটি তারকনাথ রবীন্দ্রনাথকেও বলেছিলেন। শচীন্দ্রনাথের ধারণা, তারকনাথের কাছ থেকে শোনা কাহিনীই জীবিত ও মৃত আখ্যানটির মুখ্য উপাদান।

কাবুলিওয়ালা ॥ "কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি কিছু পরিমাণে আমার বড় মেয়ের আদর্শে রচিত।"[৭]

"রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যা-তা গল্পই তো গল্প। আমার ভারী soothing লাগে। ছোট ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ের ওইখানে প্রভেদ। অভি [ভ্রাতুষ্পুত্রী] আমার পিছনে দাঁড়িয়ে সারাদিন ওইরকম বকে যেত।' আমি বলিলাম, 'কাবুলিওয়ালার মিনির মত ?' কবি বলিলেন, 'বেলাটা [জ্যেষ্ঠা কন্যা] ঠিক অমনি ছিল, মিনির কথা প্রায় তার কথাই সব তুলে দিয়েছি।"[৮]

ছুটি ॥ "বিকেলবেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপর বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলে মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেআদবি মনে করে...কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব

৬. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। মৈত্রেয়ী দেবী—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ।
৭. রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৯।
৮. সীতা দেবী—পুণ্যস্মৃতি।

সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ, 'সাবাস জোয়ান—হেঁইয়ো। মারো ঠেলা হেঁইয়ো।' মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য।...একটি ছোট মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুই-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো, তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলো। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্য স্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে-চড়ে আবাব বেশ গুছিয়ে বসল —তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল।"[৯]

"আর-একবার ওই রকম নৌকা ভিড়িয়েছি। নদীর তীরে গ্রামের অনেক ছেলে খেলা করতে এসেছে—প্রায় চৌদ্দ পনেরো জন। তার মধ্যে একটি ছেলেই সর্দার; আর সকলে নিরীহ বেচারির মত তার অনুকরণ করছে। বামুনের ছেলে, বছর তেরো বয়স, স্ফূর্তি ও সজীবতার অবতার। কোমরে পৈতে বেঁধে সকলের আগে আগে হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে 'তারে নারে না' বলে গান ধরছে। তার প্রধান আমোদ হচ্ছে এ-নৌকা ও-নৌকা ক'রে বেড়ানো, মাঝিদের কাজ দেখা, মাস্তুলের পাল গুটানো দেখা ইত্যাদি। তীরে অনেকগুলি গুঁড়িকাঠ গাদা-করা ছিল। মাঝে ছেলেটি তড়াক করে নৌকা থেকে নেমে এই কাঠগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে ফেলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তার আমোদের পথে একটা বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল। একটি ছোট মেয়ে এসে একটি গুঁড়ি চেপে বসল। ছেলেটি তাকে উঠাবার কত চেষ্টা করলে, কিন্তু মেয়েটি তা গ্রাহ্যও করলে না। সে বেশ ফিলজফারের মত গম্ভীর ভাবে গুঁড়ি দখল করে বসে আছে। তখন ছেলেটি তাকে-সুদ্ধই গুঁড়িটি উল্টে দিলে, মেয়েটি পড়ে গিয়ে বিকট কান্না জুড়ে দিলে, এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠেই ছেলেটিকে কষে এক চড় লাগালে। এই ঘটনা থেকেই 'ছুটি'র শুরু।"[১০]

৯. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২৪।

১০. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ. সুপ্রভাত ১৩১৬ ভাদ্র।

অসম্ভব কথা॥ এই গল্পের এক অংশের বর্ণনার সঙ্গে জীবনস্মৃতির এক অংশের বর্ণনার অত্যন্ত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে অসম্ভব কথা গল্পের অংশ উদ্ধৃত হল—

"বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয় তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি কোনমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও। ...বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাষ্প একমুহূর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল।"

এই অংশের সঙ্গে তুলনীয় জীবনস্মৃতির নিম্নোক্ত অংশ—

"সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে। বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে, বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।"[১১]

অসম্ভব কথা গল্পের এক অংশের সঙ্গে ছেলেবেলা গ্রন্থের এক অংশের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১১. জীবনস্মৃতি, নানা বিদ্যার আয়োজন।

অসম্ভব কথা গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশ –

"মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম, 'দিদিমা, একটা গল্প বলো।' দুই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, 'র'স্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।'

আমি কহিলাম, 'না, খেলা তুমি কাল শেষ ক'রো, আজ দিদিমাকে গল্প বলতে বলো না।'

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, 'যাও খুড়ি, উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।' মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, আমার তো কাল মাস্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে গিয়া উঠিলাম।...তখনও ঝুপ ঝুপ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল – দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন – এক যে ছিল রাজা।"

উপরে উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে ছেলেবেলা গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশ তুলনীয় –

"রাত হয়ে আসত, মাদুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শির-দাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চক্‌চকে, মস্ত তক্তাপোশের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে, তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, 'জ্বালাতন করলে! যাও খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।' আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা।"[১২]

সমাপ্তি। ছিন্নপত্রাবলীর 'অজ্ঞাত ছোট মেয়েটির ইতিহাস'ই যে সমাপ্তি গল্পের প্রেরণা তা অনুভব করা যায়।

"আমাদের ঘাটে একটি নৌকা লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে

১২. ছেলেবেলা, তৃতীয় অধ্যায়।

একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়েস বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মত চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। বাস্তবিক তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিংবা অসরলতা কিংবা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষত আধা ছেলে আধা মেয়ের মত হয়ে আরো একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মত আত্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যে এরকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকন্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটি মাত্র 'মায়্যা', অন্য 'ছাওয়াল নাই' — কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই — 'কারে কী কয় কারে কী হয় — আপন পর জ্ঞান নেই' — আরো অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হলো তখন দেখলুম আমার সেই চুলছাঁটা গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তোলবার অনেক চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না — অবশেষে বহুকষ্টে তাকে টেনেটুনে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধহয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই-একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগলো। একটি ছোট মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। যে গেল সে বোধহয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুলখেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে টিপিয়েও দিত। সকালবেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগলো। সকালবেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায়

পরিপূর্ণ! এই অজ্ঞাত ছোট মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল।"[১৩]

এই ঘটনাটির কথাই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

"আমি একবার জমিদারি দেখা উপলক্ষে একটি নদীর তীরে নৌকা লাগিয়েছি। নৌকায় বসে কোনো রকম কাজ করছি। এমন সময়ে দেখলুম একটি মেয়ে—বড়ো মেয়ে—হিন্দুর ঘবে অতো বডো মেয়ে অবিবাহিতা প্রায় দেখা যায় না—নদীর তীর থেকে আমার নৌকাব দিকে দেখছে। সে তখনই চলে গিয়ে আবার ফস্ করে একটি ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এল, এসে নৌকার এ-দিক ও-দিক দেখতে লাগলো। নৌকার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিতরে দেখতে লাগলো। তার সরল সতেজ দৃষ্টি, চলাফেরাব মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্তিব ভাব দেখে আমার বড়ো ভালো বোধ হল। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সে রকম ভাব আমি প্রায় দেখি নাই। আমার মেয়েটিকে ডেকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু আবার কী ভেবে পারলুম না। সেদিন তো গেল। তার পরের দিন দেখি আমার পাশের একটি নৌকায় চাল-ডাল বাসন-কোসন প্রভৃতি ঘরকন্নার জিনিস বোঝাই হচ্ছে; যেন কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। খানিক পরে দেখি ঠিক কালকের সেই মেয়েটিকে কনে সাজিয়ে অনেকে মিলে নৌকার দিকে নিয়ে আসছে। সে কিছুতে নৌকায় উঠবে না, আর তারাও জোর করে তাকে তুলে দেবে। সচরাচর মেয়েটেয়ে পাঠাবার সময় যে কান্নাকাটির ভাব দেখি, এ ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখলুম। কান্নাকাটির কথা দূরে থাকুক অনেকেই বেশ স্ফূর্তি ও আমোদ করছে। কেবল একটি মেয়ে, বড়ো মেয়ে, সে তার মায়েব কোলে চড়ে আছে, তার লম্বা লম্বা পা দুখানা ঝুলে পড়েছে—সেই মায়ের ঘাড়ে মুখ লুকিয়ে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তার পরে পাশের নৌকা ছেড়ে দিলে, তীরের স্ত্রীলোকেরাও চলে গেলেন। আমি কেবল দূর থেকে শুনলুম একটি মেয়েমানুষ আর একজনকে বলছেন—'ওকে তো জানো বোন, ও ওই রকমই। কত করে বললাম, পরের ঘর করতে যাচ্ছিস, বেশ সাবধানে থাকিস, ঘাড় হেঁট করে থাকিস, উঁচু করে কথা বলিস নে; কিন্তু সে কি তা পারবে!' ইত্যাদি—এই ঘটনাই আমার 'সমাপ্তি' রচনার ভিত্তি।"[১৪]

১৩. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২৬।

১৪. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রভাত ১৩১৬ ভাদ্র।

রবীন্দ্রনাথের আরও একটি উক্তি—

"দেখতুম কিনা বোট থেকে—মেয়েরা ঘাটে আসত, কেউ বা ছেলে কোলে, কেউ বা এক-পাঁজা বাসন নিয়ে, কেউ বা কলসী কাঁখে। ওই দশ-এগার বছরের মেয়েটা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, কাঁখে একটা ছেলে নিয়ে রোজ আসত। রোগা রোগা দেখতে, শামলা রঙ। বোটের উপরে আমাকে সবাই দেখত, কিন্তু ওর দেখাটা ছিল অন্যরকম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে কোলের ছেলেটাকে আমাকে দেখাত আঙুল দিয়ে - 'ওই দেখ্'। আমার ভারি মজা লাগত। এমন একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি চঞ্চলতা ছিল তার, যা ও-বয়সের জড়সড় বাঙালীর মেয়েদের বেশি দেখা যায় না। তারপর একদিন দেখলুম বধূবেশে শ্বশুরবাড়ি চলল সেই মেয়ে। সেই ঘাটে নৌকো বাঁধা। কি তার কান্না! অন্য মেয়েদের বলাবলি কানে এল—'যা দুরন্ত মেয়ে। কি হবে এর শ্বশুরবাড়িতে?' ভারি দুঃখ হল তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া দেখে। চঞ্চলা হরিণীকে বন্দিনী করবে। ওর কথা মনে করেই এই গল্পটা লিখেছিলুম। ওই বোটে বাংলাদেশের গ্রামের এমন একটা সজীব ছবি দেখেছি যা অনেকে দেখেনি।"[১৫]

অনধিকার প্রবেশ॥ সাধনার যে-সংখ্যায় এই গল্প প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যাতেই মুদ্রিত হয় বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য শীর্ষক প্রবন্ধ। যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে এই প্রবন্ধ রচিত, সেই ঘটনাই কবিকে অনধিকার প্রবেশ গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে বলে মনে করা যায়।

মেঘ ও রৌদ্র॥ ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে গিরিবালার সংবাদ আছে।

"আজ সকালবেলায়···গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচটি লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম

১৫. রবীন্দ্রনাথের উক্তির অনুলিপি। মৈত্রেয়ী দেবী—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ।

হল – তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে।"[১৬]

নিশীথে ॥ "মাঘ মাসের সাধনার সেই গল্পটা[১৭] সাধারণত অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল – সেই কারণে সাহিত্যের সমালোচনা[১৮] পড়ে অনেকে চটে গেছে।"[১৯]

ক্ষুধিত পাষাণ ॥ "ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্পলোক থেকে আমদানি।" – হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত কবির পত্র।[২০]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "গল্পটি ঠিক কবে লিখিত হয় বলা যায় না, তবে কবে ইহা তাঁহার মনের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায় ছিন্নপত্রাবলীর মধ্যে।"[২১]

সাজাদপুর থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখে লেখা সেই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ –

"কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে – অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্, সমরকন্দ্, বুখারা – আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ – মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে – পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো – জরির চটি ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি-পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো হাবশি পাহারা দিচ্ছে –

১৬. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১২৩।
১৭. নিশীথে, সাধনা ১৩০১ মাঘ।
১৮. সাহিত্য ১৩০১ ফাল্গুন।
১৯. ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২০৩।
২০. পত্রধারা, প্রবাসী ১৩৩৯ শ্রাবণ।
২১. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আশঙ্কা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।"[২২]

রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য, "আমার মনে হয় এইদিন ক্ষুধিত পাষাণের চিত্রটি জাগে, তার পর অবচেতনে তলাইয়া যায়—বৎসরকাল পরে গল্পে রূপ রইল।"

ছেলেবেলা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"সতেরো বছরে পড়লুম যখন··এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জজিয়াতি করছেন আমেদাবাদে···।

আমেদাবাদে একটা পুরোনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে, বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্চার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখিনি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবতখানায় বাজছে রসনচৌকি দিনরাত্রে অষ্টপ্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে

২২ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৪৯।

কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাপজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝনঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো, তার চারদিকে কোথাও নেই সেই রং, নেই সেই সব ধ্বনি – শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরোনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে, তার মাথার খুলিটা আছে মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোশ পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা।"

সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র –

"প্রবাসীতে যে শাহিবাগের ছবি[২৩] বাহির হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই ক্ষুধিত পাষাণের সেই বাড়ি। নদীতীরের দিকটা ইহাতে দেখানো হয় নাই – শীর্ণ স্বুবর্ণমতী নদী ইহার প্রাকারতল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে – ইহাকেই আমি গল্পে 'সুস্তা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি মনে হইতেছে। ছবিটি দেখিয়া আমার সেই ১৭ বৎসর বয়সের নির্জন মধ্যাহ্নের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাসকল মনে উদয় হইতেছে।"[২৪]

অতিথি॥ "বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি – একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা-প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে – আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে।...আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের

২৩. প্রবাসী, ১৩০৯ মাঘ-ফাল্গুন।

২৪. বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৫৫ মাঘ-চৈত্র।

স্নিগ্ধ রৌদ্র-রঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত !"[২৫]

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে তাঁর কোন্ গল্পের ইঙ্গিত করেছেন ? চিঠির তারিখ ২৮ জুন ১৮৯৫, অর্থাৎ ১৫ আষাঢ় ১৩০২। কবি প্রথমেই বলেছেন, 'সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি'। এই চিঠি লেখার পর সাধনার মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় –শ্রাবণ ১৩০২ এবং ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩০২। এই দুই সংখ্যায় যথাক্রমে ক্ষুধিত পাষাণ ও অতিথি মুদ্রিত হয়। পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যে তথ্যপঞ্জী রচনা করেন, সেখানে এই পত্রটি অতিথি প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। পরে কানাই সামন্তও গল্পগুচ্ছের চতুর্থ খণ্ডের শেষে গ্রন্থপরিচয় অংশে এই চিঠিটি অতিথি প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণে কবির এই পত্রখানি একই প্রসঙ্গে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে তিনি চিঠিটি ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। চিঠির প্রথম ছত্রে 'একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প' কথা কয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করলে মনে হয় ক্ষুধিত পাষাণ রচনা কালে এই পত্রটি লিখিত ; আর সমগ্র চিঠির বিষয়ের প্রতি যদি গুরুত্ব দেওয়া যায় তবে মনে হবে অতিথি গল্পখানি রচনাকালেই কবি এই পত্রটি লিখেছিলেন।

---

২৫ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২১৬।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পাঠভেদ : সাধনার মূলপাঠ

সম্পত্তি সমর্পণ

সাধনা। ১২৯৮ পৌষ, পৃ ৯৪।

গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ) সপ্তম খণ্ড।

র র ৭, পৃ ৬৩, ছত্র ১১, "তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না।" এর পর সাধনায় ছিল—

বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

মুক্তির উপায়

সাধনা। ১২৯৮ চৈত্র, পৃ ৩৮৮।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ৮৬, ছত্র ৮, "মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।" এর পর সাধনায় ছিল—

৭

গল্পগুচ্ছে সপ্তম পরিচ্ছেদটিকে স্বতন্ত্র করা হয়নি।

র র ৭, পৃ ৮৭, ছত্র ১২, "মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।" এর পর সাধনায় ছিল—

পরিশিষ্ট।

গল্পগুচ্ছে 'পরিশিষ্ট' শব্দ পরিত্যক্ত হয়েছে।

জীবিত ও মৃত

সাধনা। ১২৯৯ শ্রাবণ, পৃ ২২৮।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, ছত্র ২৮-৩৫, নিম্নোদ্ধৃত অংশ সাধনায় নেই—

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনও যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়। শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহুদূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী ; আমি আমার প্রেতাত্মা।

স্বর্ণমৃগ

সাধনা। ১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ ২৮৯।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ১১৬, ছত্র ১৬, "পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া··" , সাধনায় 'পরদিন' শব্দটি নেই।

র র ৭, পৃ ১২২, ছত্র ৩৬, "কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল।" স্থলে সাধনায় ছিল—

কিন্তু বৈদ্যনাথকে দেখিতে পাইল না।

জয় পরাজয়

সাধনা। ১২৯৯ কার্তিক, পৃ ৪৪৯।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ১৩০, ছত্র ১৭, "সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।" স্থলে সাধনায় ছিল—

সমস্ত প্রাণ যেন উতলা হইয়া উঠিল।

র র ৭, পৃ ১৩১, ছত্র ৩৩, "তখন পুণ্ডরীক সশব্দে হাস্য করিলেন," স্থলে সাধনায় ছিল—

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—

মহামায়া

সাধনা। ১২৯৯ ফাল্গুন, পৃ ২৭৭।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ১৫১, ছত্র ২০, "তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন।" এরপর সাধনায় ছিল –
আমি যে প্রাচীনকালের কথা বলিতেছি তখনকার সাহেবদের মধ্যে এরূপ সহৃদয়তা প্রায় দেখা যাইত।

র র ৭, পৃ ১৫১, ছত্র ৩৯, "ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।" স্থলে সাধনায় ছিল –
ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়।

র র ৭, পৃ ১৫৩, ছত্র ১৭-১৮, "মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।" স্থলে সাধনায় ছিল –
মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

দান প্রতিদান

সাধনা। ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৩৬১।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ১৫৬-১৬১, রাসমণির স্বামীর নাম সর্বত্র রাধামুকুন্দ আছে। কিন্তু এঁর লেখক-প্রদত্ত নামটি আদিতে কি ছিল? রাধামুকুন্দ না রাধাগোবিন্দ? সাধনায় রাসমণির স্বামীর নাম রাধাগোবিন্দ, কেবল একবার এবং সেটি প্রথমবার রাধামুকুন্দ বলা হয়েছে, পরে যতবার নামটি এসেছে প্রতিবারই রাধাগোবিন্দ ছাপা হয়েছে।

র র ৭, পৃ ১৫৮, ছত্র ২৭, "যে-সময়ের কথা বলিতেছি" এর পর সাধনায় ছিল –
সে আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কথা।

মধ্যবর্তিনী

সাধনা। ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৩৯।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ১৬৯, ছত্র ৬, "ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের" স্থলে সাধনায় ছিল –

ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু নিবারণচন্দ্রের

অসম্ভব কথা

সাধনা। ১৩০০ আষাঢ়, পৃ ১০৩।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ১৭৭, ছত্র ৩৫ ও ৩৬, "ব্যাকুল হইয়া আছেন" এবং "বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন", এই স্থলে সাধনায় যথাক্রমে ছিল—

ব্যাকুল হইয়া আছে

বনগমনে উদ্যত হইয়াছে

র র ৭, পৃ ১৭৭, ছত্র ৩৭-৩৯, "পুত্রসন্তান না হইলে যে দুঃখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্য বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাস্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।" এই স্থলে সাধনায় ছিল—

পুত্রসন্তান না হইলে আমি ত দুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখি না এবং যদি কিছুর জন্যে বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাষ্টারের কাছ হইতে পালাইবার জন্য।

র র ৭, পৃ ১৭৯, ছত্র ২০-২১, "যেন লেখক না হইতে হয়।" স্থলে সাধনায় ছিল—

যেন লেখক হইতে না হয়।

শাস্তি

সাধনা। ১৩০০ শ্রাবণ, পৃ ২০১।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ১৮৬, ছত্র ১১-১২, "বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।" স্থলে সাধনায় ছিল—

বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

র র ৭, পৃ ১৮৭, ছত্র ২৬-২৮, "এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—" স্থলে সাধনায় ছিল—

এ কি নিদারুণ অভিমান মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, তুমি আমাকে বাঁচাইতে চাও? আমি বাঁচিব না। তুমি আমাকে আজ খুনি বলিয়া ফেলিয়া

দিয়া আবার কাল ফিরাইয়া পাইতে চাও ? আমি ফিরিব না ! আমার পরে তোমার কানাকড়ির শ্রদ্ধা নাই অথচ লোভ আছে ? আমি কোন মতেই আমাকে তোমার হাতে দিব না ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসি কাঠকে বরণ করিলাম—

র র ৭, পৃ ১৮৭, ছত্র ৩১, "রথতলা দিয়া" স্থলে সাধনায় ছিল—
রথের তলা দিয়া

র র ৭, পৃ ১৮৭, ছত্র ৩৬-৩৭, "চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে" স্থলে সাধনায় ছিল—

চন্দরাকে দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে

র র ৭, পৃ ১৮৭, ছত্র ৩৯, "অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।" স্থলে সাধনায় ছিল—

অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথায় তাহা প্রকাশ হইল না।

র র ৭, পৃ ১৮৯, ছত্র ১৭, "কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।" এর পর সাধনায় ছিল—

ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া ত ঐ স্বামীর কাছে ফিরিতে হইবে ? আবার আমৃত্যুকাল উহাকেই ত দেহ মন জীবন যৌবন সমর্পণ করিতে হইবে ! স্ত্রীলোকের আর ত কোন গতি নাই ? জগতে আর কোথাও ত ঠাঁই নাই ? আমার ফাঁসি ভাল !

সমাপ্তি

সাধনা। ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ ৪০৮।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭। পৃ ২০২, ছত্র ৪০, "নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।" স্থলে সাধনায় ছিল—

নিজের হাত দিয়া কিছুই তুলিয়া লইবে না। অত্যধিক হৃদয়-রস-লালসায় হৃদয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন সামগ্রীই তাহার মুখে রুচে না।

অনধিকার প্রবেশ

সাধনা। ১৩০১ শ্রাবণ, পৃ ২৬০।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ২১৯, ছত্র ৩২-৪১,

"সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, "নলিন!"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।"

এই স্থলে সাধনায় ছিল—

জয়কালী পশ্চাতে প্রবল পদশব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া ফিরিলেন—দেখিলেন হঠাৎ একটা অত্যন্ত মলিন শূকর দ্বার ঠেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ পূর্বক ভূপর্যস্ত পর্যাপ্ত পল্লব মাধবীলতার মধ্যে প্রাণভয়ে লুকায়িত হইল।

র র ৭, পৃ ২২০, ছত্র ৬, "পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।" স্থলে সাধনায় ছিল—

পূজারি ব্রাহ্মণ অদূরে উপস্থিত ছিল। সে মহাশশব্যস্ত হইয়া লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

মেঘ ও রৌদ্র

সাধনা। ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ ৩৫৫।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ২২৬, ছত্র ৩৮-৩৯, "মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দিকে লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।" এর পর সাধনায় তারকা-চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ছিল—

খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক মহুরী মারার বহু পূর্বে এই গল্প রচিত হইয়াছে। বেল্ সাহেবের সহৃদয় বদান্যতার বৃত্তান্ত আমরা অনেক অবগত আছি, তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

আপদ

সাধনা। ১৩০১ ফাল্গুন, পৃ ৩১৭।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ২৭৩, ছত্র ২৪-২৮,

তখন শরৎ বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।"

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

—উপরের এই অংশ সাধনায় নেই।

প্রতিহিংসা

সাধনা। ১৩০২ আষাঢ়, পৃ ১৩৯।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ৩০৩, ছত্র ১৫, "তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য মাসিক কিছু বেতন পাইতেন।" এই স্থলে সাধনায় ছিল—

তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কত টাকা করিয়া বেতন পাইতেন।

অতিথি

সাধনা। ১৩০২ ভাদ্র-কার্তিক, পৃ ৪৩০।

গল্পগুচ্ছ। র র ৭।

র র ৭, পৃ ৩১৮, ছত্র ১-২, "বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে···" স্থলে সাধনায় ছিল—

বড় বড় চক্ষু এবং প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধরে···।

সপ্তম অধ্যায়

"সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে
লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার প্রথম বর্ষ

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে অজস্র রকমের প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায় নিয়োজিত হতে হয়েছিল। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, জীবনী, কৌতুকনিবন্ধ ইত্যাদি। এই সঙ্গে আছে প্রতি মাসের 'সাময়িক সারসংগ্রহ', 'সাময়িক সাহিত্য-সমালোচনা' ইত্যাদি নিয়মিত বিভাগ। শুধু বিষয় নয়, রচনারীতির দিক থেকেও বৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভার লক্ষ্য করা যায়। কোনো রচনা ডায়রিধর্মী, কোনো রচনা পত্রালাপধর্মী, কোনো রচনা বাক্যালাপ-ধর্মী বা কথোপকথন-নির্ভর, কোনোটি বা হাস্যকৌতুকমূলক। আবার কোথাও বা তিনি 'খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে' বলেন। সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীকে আমরা এখানে চারটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো। প্রথমে সাধনার প্রথম বৎসরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধের কথা আলোচিত হল।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন ১৮৯০এর ২২ আগষ্ট এবং ফেরেন ওই বৎসর ৩ নভেম্বর। প্রত্যাবর্তনের ঠিক এক বৎসরের মধ্যে সাধনা প্রকাশিত হয়। সাধনার প্রথম সংখ্যা থেকে ঠিক এক বৎসর ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি।

য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারির ভূমিকা রূপে যে প্রবন্ধটি কবি রচনা করেছিলেন সেটি সাধনা প্রকাশের পূর্বেই চৈতন্য লাইব্রেরিতে পঠিত (২৮ এপ্রিল ১৮৯১) ও য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি প্রথম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখেছেন, "আমার ইংলণ্ড যাত্রার ডায়ারির ভূমিকা-স্বরূপে ইহা রচিত হয়—কোনো কারণবশতঃ ইহাকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। ডায়ারি-অংশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।" বিজ্ঞাপনের তারিখ ১৬ বৈশাখ ১২৯৮। এর ঠিক সাত মাস পর অগ্রহায়ণে, সাধনার প্রথম

বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ডায়রি অংশ প্রকাশিত হতে শুরু হয়। সাধনায় প্রকাশিত অংশ য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (দ্বিতীয় খণ্ড) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ৮ আশ্বিন ১৩০০ (১৮৯৩)। সাধনায় মোট এগারো সংখ্যায় এই ডায়রি অংশ মুদ্রিত হয়। প্রতি সংখ্যায় য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি নামের সঙ্গে এক-একটি উপনাম ব্যবহৃত হয়। এই উপনাম পরে গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়। সাধনায় নিম্নমুদ্রিত ক্রমে ও শিরোনামে য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি প্রকাশিত হয়।

রচনার নাম	দিনলিপির তারিখ	প্রকাশকাল
যাত্রা আরম্ভ	২২-২৩ আগস্ট ১৮৯০	১২৯৮ অগ্রহায়ণ
আমার সহযাত্রী	২৬ আগস্ট	পৌষ
তরী পরিবর্তন	২৭-২৯ আগস্ট	মাঘ
লোহিত সমুদ্রে	৩০ আগস্ট	ফাল্গুন
ভূমধ্যসাগরে	৩১ আগস্ট-৬ সেপ্টেম্বর	চৈত্র
রেলপথের দুই পার্শ্বে	৭-৮ সেপ্টেম্বর	১২৯৯ বৈশাখ
প্যারিস্‌ হইতে লণ্ডনে	৮-১১ সেপ্টেম্বর	জ্যৈষ্ঠ
লণ্ডনে	১২ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর	আষাঢ়
ভাসমান	৬-১০ অক্টোবর	শ্রাবণ
জাহাজের কাহিনী	১৪-২৪ অক্টোবর	ভাদ্র-আশ্বিন
যাত্রা-সমাপন	২৬ অক্টোবর-৪ নভেম্বর	কার্তিক

রবীন্দ্রনাথ বিলাত ভ্রমণ পর্বেই য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারির একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। উক্ত খসড়া পরবর্তীকালে ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় বিশ্বভারতী পত্রিকায় অষ্টম ও নবম বর্ষের পাঁচটি সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৫৬-পৌষ ১৩৫৭)। যাত্রাপথে যেটি খসড়া আকারে রচনা করেন, সেটিই সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে নবরূপে প্রকাশিত হয় সাধনা পত্রিকায়। ডায়রি শুরু হয় ২২ আগষ্ট শুক্রবার ১৮৯০। খসড়াতেও যে তারিখ, সাধনাতেও সেই তারিখ। মুদ্রিত গ্রন্থেও তৎরূপ। কিন্তু এখানে পাঠ মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে—সাধনার পাঠই শেষ পাঠ নয়। ১৩০০ বঙ্গাব্দে যখন গ্রন্থাকারে এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি প্রকাশিত হল তখন কবি ২২ আগস্ট তারিখের ডায়রিতে অতিরিক্ত বেশ কিছুটা অংশ সংযুক্ত করে দিলেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডে কোনো নিবেদন বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা ছিল না। ২২ আগস্ট তারিখের ডায়রিতে কবি কর্তৃক যা সংযোজিত হল তা-ই কি উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধ? বস্তুত পক্ষে সেইরূপই বোধ হয়।

সাধনায় ডায়রির সূচনা এইরূপ—

"জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাসল তরী সন্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।—

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করে দিলে তখন দেখলুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।"

পুস্তকে ডায়রির সূচনা নিম্নরূপ—

"দেশকালের মধ্যে যে-একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে, বাষ্পযানে সেটা লোপ করে দেবার চেষ্টা করছে। পূর্বে, সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাপ হত; লোকে বলত এক প্রহরের রাস্তা, দু দিনের রাস্তা। এখন কেবল গজের মাপটাই অবশিষ্ট। দেশকালের চিরদাম্পত্যের মাঝখান দিয়ে অবাধে বড়ো বড়ো কলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ চলে যাচ্ছে।···

সামান্য এই কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে চলেছি, কিন্তু ভারতবর্ষ একান্ত করুণ-স্বরে আহ্বান করছে।

বলছে—বৎস, কোথায় যাস! কোন্ দূর সমুদ্রের তীরে? কোন্ যক্ষগন্ধর্বদের স্বর্ণপুরীতে? সেখানে আমার আহ্বানস্বর কি আর শুনতে পাবি?—আর যাই করিস, অবজ্ঞার ভাবে চলে যাস নে আর অবজ্ঞার ভাবে ফিরে আসিস নে। আমার দরিদ্রের ঘর, আমার কিছুই নেই, তোরা যা চাস তা সময়ে পাস নে—কিন্তু আমার ঘরে কেউ কি তোদের ভালোবাসে নি? শৈশবে কোনো নতনেত্র তোদের মুখের উপরে জাগ্রত স্নেহালোক বর্ষণ করে নি? রোগের সময় কোনো কোমল করতল তোদের তপ্ত ললাটে স্পর্শসুধা বিতরণ করে নি? ওরে অসন্তুষ্ট চঞ্চলহৃদয়, আমাকে ছেড়ে যাবার সময় কি কেবল দারিদ্র্যদুঃখই ছেড়ে গেলি, জগতের দুর্লভধন ভালোবাসা ছেড়ে গেলি নে? সেই অলকাপুরীতে কোনো দুঃস্বপ্নে যখন আমাকে মনে পড়বে তখন কি আমার স্নেহের কোল মনে পড়বে না, কেবল তার জীর্ণ চীরখানাই মনে পড়বে?"

ঠিক যাত্রাকালের মুহূর্তে কবির মনের মধ্যে কি এইরূপ অবস্থা ঘটেছিল? বোধ হয় না। কবি বিলাত যাত্রার ঠিক দুই মাস পূর্বে শিলাইদহ থেকে

জমিদারি কাজের ফাঁকে একটি পত্রে লিখছেন, "ক্ষণিক অবসরে একরকম শ্রান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই।"[১]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কবির দ্বিতীয় যাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "দেশ হইতে বাহির হইবার সময় মনে হইয়াছিল দূরে-সুদূরে—বহুদূরে যাইতে পারিলেই বুঝি মনে শান্তি আসিবে।"[২] কিন্তু এবার দেখা গেল, বিদেশে এসে দেশের জন্যই কবির মন ব্যাকুল। লণ্ডন থেকে ৩ অক্টোবর ১৮৯০ তারিখের পত্রে লিখছেন, "এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে।"[৩]

য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারির খসড়াতে দেখতে পাই কবি ৬ অক্টোবর তারিখে লিখেছেন, "আমি ঠিক করেছি বাড়ি ফিরব—আর নয়।"

সাধনায় ৬ অক্টোবরের ডায়রিতে লিখছেন, "আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি।…অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।"

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাওয়া-আসার পথে যে ডায়রি রচনা করেছিলেন তা সাধনায় সেইভাবে ছাপান নি। পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপার সময় তা অনেক রূপান্তরিত হয়। কিন্তু পুস্তকে ২২ আগস্টের ডায়রির মধ্যে যে দীর্ঘ অংশ সংযোজিত করেন তা সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। সংযোজিত অংশের মধ্যে কবির মনের যে-চিত্রটি পাওয়া যায় সেটি যথার্থ ২২ আগস্টের কবির মনের চিত্র নয়। সে দিক থেকে সাধনার পাঠই অধিক গ্রহণযোগ্য। পুস্তকে ২২ আগস্টের ডায়রিতে কবি যা সংযুক্ত করেছেন, সেটি স্বতন্ত্রভাবে যদি য়ুরোপ

১. চিঠিপত্র ৫, ২১ জুন ১৮৯০।
২. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।
৩. ছিন্নপত্রাবলী।

যাত্রীর ডায়ারি দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা বা বিজ্ঞাপন রূপে ব্যবহৃত হত, তবে আপত্তির কারণ থাকত না।

যাই হোক, সাধনায় প্রকাশিত য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি নানা কারণে মূল্যবান। শুধু নামেই ডায়রি নয় এই রচনাগুলি সত্য সত্যই কবির বিলাত ভ্রমণ পর্বের প্রত্যক্ষ দিনলিপি। খসড়া ও সাধনার পাঠের মধ্যে ভাবের দিক থেকে বিশেষ কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কবি প্রথম বার বিলাতে গিয়ে যে পত্রধারা রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে এই ডায়রির মিল নেই। কবি যা দেখেছেন, যা ভেবেছেন, এই দিনপঞ্জীতে তাই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখানে কৃত্রিমতা নেই, অন্যকে তাক্ লাগাবার কোনো সক্রিয় প্রচেষ্টা নেই ; কেবল কথার তুলিতে ছবির পর ছবি আঁকাই যেন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই জলপথে বিচিত্র নৈসর্গিক চিত্র যেমন পাই, তেমনি দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নরনারীর বিচিত্র মনোভাব ইত্যাদি বিধৃত হয়েছে এই ডায়রির পাতায় পাতায়।

১২৯৮ অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হল বিভাগীয় রচনা সাময়িক সারসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ; তা ছাড়া মুদ্রিত হল বাগান শীর্ষক একটি ছোট প্রবন্ধ। এ ছাড়া প্রবন্ধশ্রেণীর মধ্যে য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি তো আছেই। সাময়িক সারসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা—এই বিভাগের প্রায় সকল রচনাই অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। আমরা বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান রচনাগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করেছি।

সাধনায় বৈজ্ঞানিক সংবাদ বিভাগটি প্রথম দুটি মাত্র সংখ্যায় ছিল। পরে এই বিভাগ লুপ্ত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আকারেও বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লিখেছেন। সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগেও রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হয়।

বাগান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঘরের বাইরের অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে বলেছেন, আগাছা কেটে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে বলেছেন। আসলে বাইরের অপরিচ্ছন্নতা দূর করার শিক্ষা পেলে মনের মালিন্যই দূর হবে সহজে।

"চারিদিকে অবহেলা, অমনোযোগ আলস্য এবং যথেচ্ছ কদর্যতার মত কুশিক্ষা আর কি আছে বলতে পারি না। বাহিরের ভূখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়ত-জাগ্রত চেষ্টা এবং উন্নতি-ইচ্ছা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিলে ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। বাসস্থানের বাহিরে যেখানে

অবহেলায় জঙ্গল জন্মিতেছে, অযত্নে সৌন্দর্য দূরীভূত হইতেছে সেখানে ঘরের মধ্যে মনের ভিতরেও আগাছা জন্মিতেছে এবং সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি ঔদাসীন্য মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।"[৪]

সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগে কবি নাইটিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন মাসের উল্লেখযোগ্য রচনার সারসংকলন করেছেন নিজস্ব ভাবনা চিন্তা অভিজ্ঞতা যুক্ত করে। কোথাও বা তিনি আলোচনা এবং বিচারও করেছেন। প্রথম সংখ্যার সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগে প্রকাশিত হল মণিপুরের বর্ণনা, আমেরিকার সমাজচিত্র, পৌরাণিক মহাপ্লাবন, মুসলমান মহিলা, প্রাচ্যসভ্যতার প্রাচীনত্ব। ১৮৯১এর নাইটিন্থ সেঞ্চুরিতে মূল রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। রচয়িতারা হলেন যথাক্রমে সার জেম্স্ জনষ্টন্, হ্যামিল্টন্ আইভে, হক্স্লি, কোনো তুরস্কবাসিনী ইংরাজ রমণী ও ম্যাক্স্মূলার।

সাধনার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২৯৮ পৌষ) রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য সমাজ শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল, সেটি পূর্ববর্তী সংখ্যায় সাময়িক সার-সংগ্রহ বিভাগে প্রকাশিত মুসলমান মহিলা শীর্ষক রচনার সূত্র অবলম্বনে রচিত। তথাপি প্রাচ্য সমাজ ঠিক মৌলিক নিবন্ধ নয়, যদিও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত। ১৮৯১ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নাইটিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় জাস্টিস্ আমির আলি তুরস্কবাসিনী ইংরাজ রমণীর প্রবন্ধের জবাবে যা লেখেন—মুখ্যত তারই সারাংশ ভাগ প্রাচ্য সমাজ প্রবন্ধে সংকলিত। প্রবন্ধের শেষ অংশে অবশ্য কবির নিজস্ব মনোভাবও সংযোজিত হয়েছে। ইংরাজ মহিলা মুসলমান স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার যে বর্ণনা দেন তারই জবাবে আলি সাহেব দেখিয়েছেন যে খ্রীস্টীয় ধর্মই যে য়ুরোপে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছে তা নয়, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশেই তারা উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত লেখক আরও বলেছেন যে কোনো বিষয়ে মুসলমানদের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ উচ্চতর ছিল এবং মহম্মদ যে সকল সংস্কার-কার্যের সূত্রপাত করেছিলেন তাকেই তিনি চূড়ান্ত স্থির করেন নি। মধ্যস্থ হয়ে তখনকার প্রবল সমাজের সঙ্গে উপস্থিতমত রফা করেছিলেন। কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করে সমাজকে পথনির্দেশ করেছিলেন। তথাপি সমাজ সেখানেই থেমে রইল। আমির আলির মতে সে দোষ মুসলমান ধর্মের নয়, সে কেবল জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার অভাব।

৪. বাগান, সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন—"আসল কথা, বিশুদ্ধ জিনিষও অবরোধের মধ্যে দূষিত হইয়া যায় এবং বিকৃত বস্তুও মুক্তক্ষেত্রে ক্রমে বিশুদ্ধিতা লাভ করে। যে সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীন বুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক। কারণ, তাহাতে বাতাস লাগে না, প্রকৃতির স্বাস্থ্যদায়িনী শক্তি তাহার উপর সম্পূর্ণ তেজে কাজ করিতে পায় না।"

১২৯৮ অগ্রহায়ণে বাগান শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, পরের মাসে লিখলেন রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য। এ প্রবন্ধটিও মূলত ইংরাজি প্রবন্ধের সার-সংকলন। প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই বিষয়বস্তু অনুমান করা যায়। বাইরে অজস্র অদৃশ্য রোগশত্রু যেমন আছে, তেমনি আমাদের শরীরে অন্তর্বর্তী রক্ষকও কম নেই। এই বিষয় নিয়েই বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। হঠাৎ এরূপ বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার কারণ কি? যে উদ্দেশ্যে প্রথম সংখ্যায় বাগান শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন বর্তমান প্রবন্ধটি সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। প্রবন্ধের উপসংহার অংশ পাঠ করলেই তা বোঝা যাবে।

"বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্য উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারো অবিদিত থাকিবে না।"

সাহিত্য পত্রিকায় ১২৯৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বসুর আহার শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ওই প্রবন্ধে লেখক আহারের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেন—দেহের পুষ্টিসাধন ও আত্মার শক্তিবর্ধন। চন্দ্রনাথ বসু বলেন আহারে দেহের পুষ্টি হয় এ কথা সকল দেশের লোকই জানে কিন্তু আত্মার শক্তিবর্ধনও যে তার একটা কাজের মধ্যে—এ রহস্য কেবল ভারতবর্ষেই বিদিত, কেবল ইংরাজি শিখে এই নিগূঢ় তথ্য ভুলে ইংরাজিশিক্ষিতগণ লোভের তাড়নায় পাশব আহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং ধর্মশীলতা, শ্রমশীলতা, ব্যাধি-হীনতা, দীর্ঘজীবিতা, হৃদয়ের কমনীয়তা, চরিত্রের নির্মলতা, সাত্ত্বিকতা, আধ্যাত্মিকতা সমস্তই হারাতে বসেছে। লেখক আরও বলেছেন নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেমন পুষ্টি হয় আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।

সাধনার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গেছে, সাহিত্যেরও অগ্রহায়ণে চন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক এই রকম সময়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে

রবীন্দ্রনাথ পত্রে লিখছেন, "সাধনার প্রথম সংখ্যা কি তোমার হস্তগত হয়েছে ? …আসল কথা, একটা কাগজের ভারি দরকার হয়েছে। অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করচেন।…সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েচে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েচে।"

সাহিত্যে চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ করে তারই প্রতিবাদে সাধনার পৌষ (১২৯৮) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত শীর্ষক দীর্ঘ সমালোচনা। কবি জানালেন, "এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোনো সমাজ রচিত হইতে পারে না।…প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্মশীল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও ছিল, মগজও ছিল মাংসপেশীও ছিল, সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যক অনুসারে আমিষও ছিল, নিরামিষও ছিল, আচারের সংযমও ছিল আচারের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত। শক্তি থাকিলে যেমন ক্ষমা শোভা পায়, সেইরূপ। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবন তেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহৎ ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্তী একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল তখনি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতি সহজে যন্ত্রাচারী এবং কর্ম-ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য আপনাকে মহত্তের ধৈর্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেক ধারণ করিল এবং দুর্ভাগা অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণহীন ব্রাহ্মণের গরুটি হইয়া তাঁহারই ঘানিগাছের চতুর্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল যোগাইতে লাগিল। এমন সংযম, এমন বদ্ধ নিয়ম, এমন নিরামিষ সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে !"

প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সামিষ এবং নিরামিষ আহারের তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি, 'আহার' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া একটা ঘরগড়া দৈববাণী রচনা করা আজকালকার দিনে শোভা পায় না। এখনকার কালে যদি কোনো দৈবদুর্যোগে কোনো

লোকের মনে সহসা একটা অভ্রান্ত সত্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে অথচ সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রমাণ দেখা না দেয় তবে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য সেটাকে মনে মনে পরিপাক করা। গুরুর ভঙ্গীতে কথা বলা একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গ-সাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপ ভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের অপমান করা হয়, কারণ সত্য কোনো লেখকের নামে বিকাতেই চাহে না, আপনার যুক্তিদ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ্য মাত্র।"

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে মাসে মাসে ধর্ম ও সমাজবিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল। সমসাময়িক ইতিহাস এই সকল রচনার প্রেরণামূলে ছিল। বঙ্গের সমাজ ও ধর্মান্দোলনে সে-সময় সংস্কারান্ধতার নূতন গ্রন্থিজাল রচিত হয়ে চলেছে। বঙ্গবাসী সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক—বাংলার হিন্দু গোঁড়ামির প্রশ্রয়দাতা ও সঞ্জীবনী সে-সময় ব্রাহ্মসমাজের কাগজ; কিছু পরে নব্য হিন্দু আন্দোলনের মুখপাত্ররূপে প্রকাশিত হল প্রচার পত্রিকা। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নব্যহিন্দু বিষয়ে কিছু বাদপ্রতিবাদও হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ মন আচারান্ধতার সীমান্তে পৌঁছেই নব্যহিন্দু আন্দোলনের সংসর্গ পরিহার করে।[৫] কিন্তু চন্দ্রনাথ বসু তাতে ধরা দেন। চন্দ্রনাথ শশধর তর্কচূড়ামণির ন্যায় অন্তঃসারশূন্য ছিলেন না। চন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য মনন ও শক্তিমত্তা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, প্রবল মতবিরোধ ও বিতর্ক সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মূল্যচেতনাকে নিজের সৃজনক্ষেত্রে বার বার মর্যাদা দান করেছেন। এই রকম একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যখন রক্ষণশীলতার মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তখন স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মনে বেদনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও অসমর্থনীয় বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই হয়।

সাধনায় (১২৯৮ পৌষ) সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে ১২৯৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যার নব্যভারত পত্রিকার সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। নব্যভারতে সে-সময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ধারাবাহিক লিখছিলেন। এই প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন্তব্য—

৫. রবীন্দ্রনাথ সাধনায় (১২৯৮ অগ্রহায়ণ) সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে নব্যভারতে প্রকাশিত (১২৯৮ অগ্রহায়ণ) হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনাকালে লিখেছেন, "বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন এ কথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে।"

"রমেশবাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘরে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কি ছিল কি ছিল না, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্ত কোনো ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া রমেশবাবু এই যে প্রাচীন সমাজ চিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাঙ্গলার আজন্ম পণ্ডিতগণের মস্তিক-লিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের সখ অনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকেই দুই চারিটি মনের মত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁসিতে দেন না।"

১২৯৮ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হল কর্মের উমেদার শীর্ষক প্রবন্ধ। এখানে কবি য়ুরোপের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের তুলনা করেছেন। চন্দ্রনাথের আহারতত্ত্বের জবাবে রবীন্দ্রনাথ কর্ম সম্বন্ধে যে কথাগুলি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন, মনে হয় তা-ই কর্মের উমেদার নামক প্রবন্ধে বিশদ করবার চেষ্টা করেন। য়ুরোপীয় সংসারযাত্রায় বস্তুভারের চাপ ক্রমশই প্রাধান্য লাভ করছে—রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন। তবে তাঁর মতে, "কিন্তু য়ুরোপের মানুষকে যন্ত্রের তলায় পিষিয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নহে। কোনো প্রবল শক্তি কিছুদিন আমাদের মাথার উপর চাপ দিলেই আমরা ধূলির মতো গুঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একাকার হইয়া যাই; তা সে ব্রহ্মণ্য শক্তিই হউক আর রাজন্যশক্তিই হউক, শাস্ত্রই হউক আর শস্ত্রই হউক। য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছুদিন এইরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যেখানে যে-কারণেই হউক, যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে তখনই সে অধীর হইয়া উঠিয়া তাহা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে—সে ধর্মের বন্ধনই হউক আর কর্মের বন্ধনই হউক।"

আমাদের দেশে এই যন্ত্রচালনার আধিক্য দেখা দিলে কি ঘটতো? অতিরিক্ত যন্ত্রের চাপে পিষ্ট হলে আমাদের দেশের মানুষগুলোর কি অবস্থা হত? রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দেশে যদি অতিরিক্ত যন্ত্রচালনার প্রাদুর্ভাব হইত তবে তাহার পরিণাম ফল কী হইত বলা শক্ত নহে। আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে খুব বেশি পরিবর্তন হইত না। কারণ, আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। কী খাইব, কী করিয়া খাইব, কোথায় বসিব, কাহাকে ছুঁইব, জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বিষয়ে এবং দানধ্যান তপজপ প্রভৃতি ধর্মকার্যে আমরা এমনই বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়াছি যে, মন হইতে স্বাধীনতার অঙ্কুর পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে—স্বাধীনভাবে চিন্তাও করিতে পারি না, স্বাধীনভাবে কার্যও করিতে পারি না। আকস্মিক ঘটনাকে দৈব ঘটনা বলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকি। প্রবল শক্তি মাত্রকেই অনিবার্য দৈবশক্তি জ্ঞান করিয়া বিনা বিরোধে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করি। য়ুরোপে গুটিপোকার মড়ক হইলে, দ্রাক্ষা কীটগ্রস্ত হইলে তাহারও প্রতিবিধানের চেষ্টা হয়; আমাদের দেশে ওলাউঠা এবং বসন্তকে আমরা পূজা করিয়া মরি। স্বাধীন বুদ্ধির চোখ বাঁধিয়া, তুলা দিয়া তাহার নাসাকর্ণ রোধ করিয়া আমরাও সম্প্রতি এইরূপ পরম আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। অন্তরে যখন এইরূপ পরিপূর্ণ অধীনতা বাহিরে তখন স্বাধীনতা কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না।"

১২৯৮ মাঘে সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-মজুর শীর্ষক নিবন্ধ লেখেন। ১৮৯১ সেপ্টেম্বরে নিউ রিভিউ পত্রে ফরাসী লেখক জুল্ সিমঁ ফ্রান্সের স্ত্রীমজুরদের সমস্যা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রনাথ তারই সারবস্তু প্রকাশ করেন সাধনার পৃষ্ঠায়। "দেখা যাইতেছে য়ুরোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই—জিনিষপত্র না মনুষ্যত্ব. কাহার দাম বেশি?"—এইরূপ মন্তব্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিবন্ধ সমাপ্ত করেন।

১২৯৮ ফাল্গুন সংখ্যায় সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আবার এক নূতন বিতর্কে যোগ দেন। সাহিত্যে ১২৯৮ মাঘ সংখ্যায় চন্দ্রনাথ লয় শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকায় চন্দ্রনাথের বক্তব্যের দীর্ঘ সমালোচনা রচনা করলেন। পরব্রহ্মে বিলীন হবার কামনা ও সাধনাই যে হিন্দুর হিন্দুত্ব—এ কথা চন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে নির্দেশ করেন। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক আক্ষেপ করে বলেন যে য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সঙ্কটাপন্ন হয়েছে. সুতরাং তা প্রাণপণে রক্ষা করা সকলের একান্ত কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের বক্তব্য স্বীকার করতে পারেন না।

সমালোচনার শেষাংশ কিছুটা তির্যক ভঙ্গিতে রচিত।

"আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে আদর্শভাব উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিমবাবু তাঁহার ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন আমাদের হিন্দুধর্মেরও সেই আদর্শ—অর্থাৎ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন। চন্দ্রনাথবাবুর মতে হিন্দুধর্মের আদর্শ মনুষ্যত্বের

পূর্ণ ধ্বংসসাধন। তিনি বলেন হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র প্রলয়। এখন হিন্দুগণ বঙ্কিমবাবুর মতে বাঁচিবেন কি চন্দ্রনাথবাবুর মতে মরিবেন সেই একটা সমস্যা উঠিতে পারে। আমরা এ-বিষয়ে একটা মত স্থির করিয়াছি। আমরা জীবনের প্রয়াসী, এবং ভরসা করি, লয় ব্যাপারটা যতই 'বিরাট' হউক তাহার এখনো বিস্তর বিলম্ব আছে।"

সাধনায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রকাশের পরে সাহিত্যে ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় চন্দ্রনাথের লয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হয়। অতঃপর সাধনায় ১২৯৯ আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করে চন্দ্রনাথ সাহিত্যে ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় আমার 'স্বরচিত' লয়তত্ত্ব শিরোনামে প্রবন্ধ লেখেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ যেন সাধনার প্রতিনিধিরূপে সাহিত্য পত্রিকাতেই (১২৯৯ ভাদ্র) নব্য লয়তত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধে চন্দ্রনাথের বক্তব্যের জবাব দিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেন।

১২৯৮ ফাল্গুন সংখ্যায় মীমাংসা শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটি কৌতুকরসাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়।

এই ফাল্গুনে প্রকাশিত হলো 'আলোচনা/(পত্র)' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের পত্র-প্রবন্ধ। আসলে এটিও প্রবন্ধ, কিন্তু ভিন্ন-প্রণালীতে রচিত। এ যেন 'কলে তৈরি প্রবন্ধ' নয়, এ যেন একেবারে 'মানুষের হাতের কাজের মত'। এই শ্রেণীর পত্র-প্রবন্ধ ও পত্রোত্তর-প্রবন্ধ সাধনার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দুই পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ ও কবি-বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত। সাধনায় এই পত্র-প্রবন্ধধারা নিম্নবর্ণিত ক্রমে মুদ্রিত হয়—

রচনা	লেখক	সাধনা
আলোচনা/(পত্র)	রবীন্দ্রনাথ	১২৯৮ ফাল্গুন
সাহিত্যের সত্য/(পত্রোত্তর)	লোকেন্দ্রনাথ	চৈত্র
সাহিত্য/(পত্রোত্তর)	রবীন্দ্রনাথ	১২৯৯ বৈশাখ
সাহিত্যের উপাদান	লোকেন্দ্রনাথ	জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্যের প্রাণ	রবীন্দ্রনাথ	আষাঢ়
সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ	লোকেন্দ্রনাথ	শ্রাবণ
মানব প্রকাশ	রবীন্দ্রনাথ	ভাদ্র-আশ্বিন

এই প্রবন্ধগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধেই কিছু আলোচনা করেছেন। কবি বলেছেন, "মাসিক পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা

অনেক সহজ।...কাজটা দু রকমে নিষ্পন্ন হতে পারে। এক, কোনো একটা বিশেষ বিষয় স্থির করে দুজনে বাদ প্রতিবাদ করা। কিন্তু তার একটা আশঙ্কা আছে, মীমাংসা হবার পূর্বেই বিষয়টা ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। আর এক, কেবল চিঠি লেখা—অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য না রেখে লেখা, কেবল লেখার জন্যেই লেখা।...প্রাপ্য জিনিষের চেয়ে ফাউ যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়; মূল কথাটার চেয়ে তার আশপাশের কথাটা বেশি মনোরম বোধ হয়।...অবশ্য, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে একেবারে পাগলামি করা হয়; কিন্তু তাই বলে নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্রে ধরে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে চললে নিতান্ত কলে তৈরি প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের হাতের কাজের মত হয় না। সেরকম আঁটাআঁটি প্রবন্ধের বিশেষ আবশ্যক আছে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না; কিন্তু সর্বত্র তারই বড়ো বাহুল্য দেখা যায়। সেগুলো পড়লে মনে হয় যেন সত্য তার সমস্ত সুসংলগ্ন যুক্তিপরম্পরা নিয়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোথা থেকে আবির্ভূত হল। মানুষের মনের মধ্যে সে যে মানুষ হয়েছে, সেখানে তার যে আরও অনেকগুলি সমবয়সী সহোদর ছিল, একটি বৃহৎ বিস্তৃত মানসপুরে যে তার একটি বিচিত্র বিহারভূমি ছিল, লেখকের প্রাণের মধ্যে থেকেই সে যে প্রাণ লাভ করেছে, তা তাকে দেখে মনে হয় না; এমন মনে হয় যেন কোনো ইচ্ছাময় দেবতা যেমন বললেন 'অমুক প্রবন্ধ হউক' অমনি অমুক প্রবন্ধ হল; লেট দেয়ার বি লাইট অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট। এজন্য তাকে নিয়ে কেবল আমাদের মাথার খাটুনি হয়, কেবলমাত্র মগজ দিয়ে সেটাকে হজম করবার চেষ্টা করা হয়; আমাদের মানসপুরে যেখানে আমাদের নানাবিধ জীবন্ত ভাব জন্মাচ্ছে খেলছে এবং বাড়ছে সেখানে তার স্বর পরিচিত ভাবে প্রবেশ করতে পারে না; প্রস্তুত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়, সাবধান হয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে হয়; তার সঙ্গে কেবল আমাদের একাংশের পরিচয় হয় মাত্র, ঘরের লোকের মত সর্বাংশের পরিচয় হয় না।"[৬]

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেই মন দিয়েছিলেন তাই নয়, বক্তব্য বিষয়কে নানা ভঙ্গিতে কিভাবে প্রকাশ করা যায় সেদিকেও সবিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ দেখি কোনো রচনা

৬. আলোচনা/পত্র, সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন।

ডায়রিধর্মী (য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি), কোনো রচনা পত্রধর্মী (রবীন্দ্র-লোকেন্দ্র পত্র-প্রবন্ধ) কোনো রচনা বা মজলিশিধর্মী (পঞ্চভূত)। পত্র-প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্যতত্ত্বের কথাই মুখ্যত আলোচিত হয়েছে। সাহিত্যের ধর্ম বা লক্ষণ কি, বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারের মানসূচী কি ইত্যাদি বিষয়ে সহজ স্বতোস্ফূর্ত আলোচনা চলে দুই বন্ধুতে। একজন পত্র লেখেন অপরজন প্রত্যুত্তর দেন—এইভাবে পত্র-প্রবন্ধের মাধ্যমে সাহিত্যের বিচার চলতে থাকে।

১২৯৮ চৈত্র সংখ্যায় কাব্য শিরোনামে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কাব্যরস কি—সে কথাই কবি এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। কবি বলেছেন দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব। বিষয়ী লোকের পক্ষে সে রস আস্বাদন করা কঠিন। কারণ ব্যবসায়ীর নিকট ফুল বাগান অপেক্ষা মুলার ক্ষেত অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও মূল্যবান।

চৈত্র সংখ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, নাম বিদ্যাপতির রাধিকা। এই প্রবন্ধ মূলত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা। এর দশ বৎসর পূর্বে ভারতীতে ১২৮৮ ফাল্গুন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি[৭] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে[৮] মানসবিকাশ শীর্ষক সমালোচনা-নিবন্ধে জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনা করেছিলেন। সেখানে বঙ্কিম বলেছিলেন, "জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।" বঙ্কিম এই প্রবন্ধের অন্যত্র বলেন, "যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্তে।" অর্থাৎ জয়দেব-বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যে তুলনা খাটে, জয়দেব-চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও সেই তুলনাই প্রযোজ্য।

বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। মানসবিকাশ শীর্ষক প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে কিছুটা সংক্ষেপিত হয়ে বিদ্যাপতি ও জয়দেব শিরোনামে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম পূর্ববর্তী প্রবন্ধের পাঠ সংশোধন করে লেখেন, "যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশি খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।" অর্থাৎ যা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলেছেন তা চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস প্রসঙ্গেই অধিকতর

৭. 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৮. বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ।

প্রযোজ্য, বরং বিদ্যাপতি প্রসঙ্গেই ততখানি প্রযোজ্য নয়। এখানে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিম নিজের পূর্ব-অভিমত সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বঙ্কিম 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে পাঠ পরিবর্তন করেন। এ-বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার 'নানা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।

এখন প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রবন্ধের দশ বৎসর পর আবার কেন নূতন করে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন?

আমাদের মনে হয় বঙ্কিম যেমন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তাঁর স্বীয় মত পরিবর্তিত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ সাধনা পত্রিকায় বিদ্যাপতির রাধিকা শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তাঁর পূর্বমত কিছু পরিমার্জিত করেন। যদিও এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর; তথাপি বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ এখানে বিদ্যাপতির কবিতার মধ্যে গভীরতাও অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে বলেন, "বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে, অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে। এত লীলাখেলা নব নব রসোল্লাসের পরিণাম-কথা এই যে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু / নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, / তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল।" চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নেই।" বিদ্যাপতির রাধিকা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এ-কথা বলতে চান না। বরং তিনি যে পদাংশ উদ্ধৃত করেছেন তা এই কথাই বোঝাতে চাইছে যে বিদ্যাপতিরও মিলনে সুখ নেই।

'জনম অবধি হাম' পদটি এখন যথার্থই বিদ্যাপতির কিনা সে-প্রসঙ্গের অবতারণার মনে হয় এখানে প্রয়োজন নেই।

১২৯৮ মাঘ সংখ্যায় একজন পাঠক প্রশ্ন করেছিলেন—

"প্রাচীন কাব্যে 'নিছনি' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তাহার প্রকৃত অর্থ কি এবং তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন?—শব্দতত্ত্বান্বেষী।"

ফাল্গুন সংখ্যায় (১২৯৮) উত্তর প্রকাশিত হল—

"নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা।—শ্রীজগদানন্দ রায়। কৃষ্ণনগর।"

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ চৈত্র সংখ্যায় (১২৯৮) 'নিছনি' সম্পর্কে পুনরায় উত্তর লেখেন। তিনি এই শব্দের বিবিধ প্রয়োগ দেখিয়ে বিভিন্ন অর্থ উদ্ধার করলেন। এবার কবিই প্রশ্ন করলেন, "বর্তমান প্রচলিত ভাষায় এই 'নিছনি' শব্দের ব্যবহার আছে কি না জানিতে উৎসুক আছি ; যদি কোনো পাঠক অনুগ্রহ করিয়া জানান ত বাধিত হই। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।"

এবার (১২৯৯ বৈশাখ) 'নিছনি' সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ নিছনি শব্দের যে-সকল অর্থ আবিষ্কার করেছেন তাছাড়াও অপরাপর অর্থ আছে। তিনি বলেন, "নীরাজনা, আকৃতি, সেবা, মোছা ও শান্তিকর্ম বিশেষ ছাড়াও অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে।" দীনেন্দ্রকুমার বিভিন্ন পদ উদ্ধৃত করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সন্ধান করেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধের মধ্যেই দশটি পাদটীকায় স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। দীনেন্দ্রকুমার তাঁর প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের চারটি পদ উদ্ধৃত করে নিছনি শব্দের প্রয়োগ দেখান।

রবীন্দ্রনাথ শেষ পাদটীকার একেবারে শেষে বলেন, "দীনেন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সে জন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে সকল দুর্বোধ শব্দ প্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এইরূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

অতঃপর ১২৯৯ কার্তিক সংখ্যায় নিছনি সম্পর্কে আরও একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। সেটি ত্রিপুরা থেকে 'জনৈক পাঠক' পাঠিয়েছিলেন।

সাধনায় ১২৯৮ মাঘে নিছনি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং ১২৯৯ কার্তিকে এই আলোচনার সমাপ্তি ঘটে।

১২৯৯ বৈশাখে ধারাবাহিক বা পত্রিকার নিয়মিত বিভাগীয় রচনা ছাড়া তাঁর স্বতন্ত্র একটি মাত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হল—বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা। যাঁরা ইংরেজি গ্রন্থস্তূপের শিখরে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মতামত স্বীকার করতে সম্মত নন। বাংলা ভাষা রাজভাষা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নয়, সম্মান লাভের ভাষা নয়, অর্থোপার্জনের ভাষা নয়, কেবল মাত্র সে হল বাঙালীর মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ বলেন যাঁদের

হৃদয়ে এই মাতৃভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও অটল ভরসা আছে তাঁদেরই ভাষা বাংলা ভাষা।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রবন্ধটির প্রাথমিক খসড়ারূপ দেখতে পাই জোড়াসাঁকোর 'পারিবারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তক' শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত বাঁধানো খাতা থেকে। খাতাটি এখন শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। খাতাতে যে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে তারও ঐ একই নাম—বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা। খাতাতে পরের রচনাটির নাম বঙ্গসাহিত্য। রচনা তারিখ দেওয়া আছে ২৪।৩।৯০, অর্থাৎ ১২ চৈত্র ১২৯৬। খাতার অন্তর্গত প্রথম প্রবন্ধের প্রায় সবটুকু এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধের প্রথমাংশ নিয়ে সাধনার বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত। পরে আমরা দেখাব পঞ্চভূতেরও কিছু কিছু রচনার খসড়ারূপ 'পারিবারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তকে'র মধ্যে আছে।

লোকেন পালিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে সাহিত্যতত্ত্বেরই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন তা নয়। কারণ সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তো সৃষ্টিশীল লেখকমাত্র নন, তিনি সেই সঙ্গে একজন চিন্তাবিদ্ সম্পাদকও। শুধু নিজের লেখা কিরূপ হবে তাই নয়, পত্রিকার লেখাগুলিই বা কিভাবে রচিত হলে ভালো হয়—এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ চিন্তা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি পত্র-পত্রিকা থেকে অনেক মূল্যবান বিষয় গ্রহণ করেছেন, অনুবাদ করেছেন, সার-সংকলন করেছেন, কিন্তু তাই বলে ইংরেজি পত্রিকার রচনা রীতিকেও যে তিনি গ্রহণ করেছেন তা নয়। বরং সে-রীতি তাঁর মনঃপূত নয় বলে তিনি স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন।

"আমি ইংরিজি কাগজ এবং বইগুলো যখন পড়ি তখন অধিকাংশ সময়েই আমার এই কথা মনে হয় যে, একটা কথাকে একটা প্রবন্ধ কিংবা একটা গ্রন্থে পরিণত করতেই হবে এই চেষ্টা থাকাতে প্রতিদিনকার ইংরাজি সাহিত্যে যে কত বাজে বকুনির প্রাদুর্ভাব হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই—এবং সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা কত দুঃসাধ্য হয়েছে। যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা আসলে কত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত, সেটাকে না-হক কত দুরূহ এবং বৃহৎ করে তোলা হয়! ...মাসিক পত্রের এক-একটা প্রবন্ধ দেখলে ভয় লাগে। আমার বোধ হয় 'নাইন্‌টিন্‌থ্‌ সেনচুরি' যদি অত বড়ো আয়তনের কাগজ না হত তা হলে ওর লেখাগুলো ঢের বেশি পাঠ্য এবং খাঁটি হত।"[১]

---

১. আলোচনা / পত্র, সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন।

এখানে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ সাধনা পর্বে নাইন্‌টিন্‌থ্‌ সেন্‌চুরি পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করতেন এবং তার থেকে সার সত্য বস্তু গ্রহণ করে সাধনায় সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগে নিয়মিত প্রকাশ করতেন।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত সাধনায় ১২৯৮ চৈত্র সংখ্যায় ইংরেজি সাময়িক পত্র প্রসঙ্গে কবিকে লেখেন, "ভাষা সাহিত্যের বাহন বলে, ভাষার দ্বারা আমরা আর যা কিছু করি তার মধ্যে এক এক সময়ে সাহিত্যের আভাস ফেলতে পারি। ইতিহাস বিজ্ঞানেও অনেক সময়ে আমরা সাহিত্য মেশাই। ইংরাজি ম্যাগাজিন সম্বন্ধে তুমি যে আপত্তি করেছ তা কেবল ম্যাগাজিনের লেখাগুলোকে সাহিত্য হিসাবে দেখলেই খাটে। ইংরাজি ম্যাগাজিনের লেখাগুলো আর্টিকেলগুলো কিন্তু অমিশ্র সাহিত্য নয়। তাদের ম্যাগাজিনগুলো তাদের জীবনের দৈনিক কাজের জন্য। তাদের এক একটা কথা বলা চাই, তারই মধ্যে যতটুকু সাহিত্য-ভাব মেশাতে পারে ততটুকুই লাভ। আমাদের ম্যাগাজিনে সাহিত্যভাবটা বেশি ফুটিয়ে তোলা দরকার, কেননা প্রথমতঃ আমাদের বলবার কথা কম আর দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে সাহিত্যচ্ছলে বিজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যেমন ছেলেদের মিষ্টান্নের ভিতর ওষুধ পুরে খাওয়ান।"[১০]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরের আলোচনায় লিখলেন, "ইংরিজি ম্যাগাজিন সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ সে কথা ঠিক। তাদের নিতান্ত দরকারি কথা এত বেশি বেড়ে গেছে যে রসালাপের আর বড় সময় নেই।...কিন্তু বড় লেখা যে বড় বেশি বাড়ছে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। আজকাল ইংরিজিতে বেশ একটু আঁটসাঁট ছিপছিপে লেখা দেখলে আশ্চর্য বোধ হয়। ওরা বোধ হয় সময় পায় না। কাজের অতিরিক্ত প্রাচুর্যে ওদের সাহিত্য যেন অপরিচ্ছন্ন মোটা-সোটা ঢিলেঢালা প্রৌঢ়া গিন্নির মত আকার ধারণ করেছে। হৃদয়ের গাঢ়তা আছে কিন্তু মাঝে মাঝে সৌন্দর্যের হ্রাস এবং বলের শৈথিল্য প্রকাশ পায়।"[১১]

একদিকে কবি ইংরেজি পত্র-পত্রিকার রচনারীতির সমালোচনা করছেন, অপর দিকে মনে হয় তাঁর চিন্তাস্রোত একই সঙ্গে বয়ে চলেছে কেমন ভাবে এবং কি রূপে সাধনার রচনাবলী পাঠকের হাতে তুলে দিলে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং কার্যকর হয়।

১০. সাহিত্যের সত্য/পত্রোত্তর।

১১. সাহিত্য/পত্রোত্তর, সাধনা ১২৯৯ বৈশাখ।

১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হল আদিম আর্যনিবাস। সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান প্রবন্ধ। আর্যদের আদিম নিবাস কোথায় এ-বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলে নানা বিতর্ক ও সংশয় আছে। আর্যদের আদিম বাসস্থান কি এসিয়ায় নয়? ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মানির পুরাতত্ত্ববিদেরা বলছেন য়ুরোপই আর্যদের আদিম বাসভূমি। নানা পণ্ডিতের নানা মত। সকলেই চান প্রাচীন আর্য জাতিকে নিজের স্বদেশী পূর্বপুরুষ রূপে প্রমাণ করতে। যেখানে পণ্ডিতেরা বিবাদে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ সেখানে কি বলেন?

কবি বলেন, "আদিম বাসস্থান যেখানেই থাক্ কুটুম্বিতা যতই বাড়ে ততই ভাল। এই এক আর্যজাতি সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক বড় বড় জাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে বাঁধিয়াছে।…ইংরাজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা ত আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদি মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয় গৌরবের তুলনা মিলে না।"

'নিছনি'র মত 'পছঁ' শব্দ নিয়েও সাধনার পৃষ্ঠায় বাদ প্রতিবাদ চলে বেশ কিছুদিন। নিছনি শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথই প্রাচীন কাব্যে দুরূহ শব্দের আলোচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায় পছঁ শব্দটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এই সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আবার দীনেন্দ্রকুমারের লেখাটির সঙ্গেও পাদটীকা যুক্ত করলেন স্বীয় স্বাক্ষরে। অতঃপর শ্রাবণ সংখ্যায় পছঁ সম্পর্কে দীর্ঘ পত্র মুদ্রিত হল। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এই পত্রের লেখক ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। এই পত্রের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হল। পছঁ প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত হয় সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে ১২৯৯ চৈত্র সংখ্যায়। এবারেও সেই দুই লেখক ক্ষীরোদচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।

১২৯৯ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হল—চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, পত্র-প্রবন্ধ—সাহিত্যের প্রাণ, আদিম সম্বল ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ—স্বরবর্ণ অ। এই সংখ্যায় 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' বা 'সাময়িক সারসংগ্রহ' নেই। অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দুটি: আদিম সম্বল ও স্বরবর্ণ অ। দুটিই ছোট প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে বলছেন, "যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধে বাংলা উচ্চারণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করলেন। এবারের বিষয় স্বরবর্ণ অ ; এর কয়েক মাস পর কার্তিক সংখ্যায় আলোচনা করলেন স্বরবর্ণ এ প্রসঙ্গে। এরই মধ্যে শ্রাবণ সংখ্যায় ছন্দ-আলোচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রবন্ধের নাম—বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ, সম্ভবত এটিই বাংলা ছন্দতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ। বাংলা শব্দের উচ্চারণ ধ্বনি ও তার ছন্দ সম্পর্কে কবি অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে আলোচনা করলেন।

শ্রাবণ সংখ্যায় (১২৯৯) ঠাকুরঘর[১২] শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বললেন, "ভান এবং অন্ধ অহংকারের উপর স্বভাবতই দুটো শক্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করে।" কবি বললেন, "যে নৈবেদ্যটা সম্পূর্ণ স্বদেশের প্রাপ্য তাহার সারভাগ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্তর্গৃহশায়ী জড়ত্বটাকে দুধকলা খাওয়াইতেছি।"

স্বদেশবাসীর চরিত্রের সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ বহুবার করেছেন, সে সমালোচনা কোথাও বা যথেষ্ট কঠিন এবং কঠোর ; কিন্তু এই সমালোচনাগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল স্বদেশের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ এবং অপরিসীম আন্তরিকতা। কিন্তু বাইরের কেউ যদি দূর থেকে আমাদের অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, বাঙালী চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করে সেখানে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তীব্র এবং কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন না। এই সময় সার লেপেন্ গ্রিফিন্ নামে জনৈক ইংরেজ বাঙালী জাতির চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করে অতি অভদ্রোচিত ও কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে ফর্ট নাইট্‌লি রিভ্যু পত্রে (১৮৯২ জুন) একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জাতির এই অপমান কবির পক্ষে নীরবে সহ্য করা সম্ভব হল না। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন সাধনায় (১২৯৯ শ্রাবণ) সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগে সার লেপেন্ গ্রিফিন্ শিরোনামে।

"কুকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনো প্রকার গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই—কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই।…লেখকের অভিপ্রায় যেমনই হউক, বাঙালীদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোনো ফল না হউক আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে।

১২. এই প্রবন্ধটি অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

যে সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাইতে পারে।"

ফর্ট নাইট্‌লি রিভ্যু পত্রে নানা 'গালমন্দ'র মধ্য দিয়ে এ-কথাই বলা হয় যে বাঙালী দুর্বল জাতি—তাই রাজতন্ত্রে বাঙালীর স্থান থাকতে পারে না। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ এ-কথা কখনোই স্বীকার করতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রচনা —শিক্ষা সমাজ ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, সাময়িক সার-সংগ্রহ বিভাগের লেখা এবং নূতন ধারাবাহিক রচনা পঞ্চভূতের ডায়ারি।

শব্দতত্ত্বচিন্তার যে জোয়ার সাধনার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছিল, দ্বিতীয় বর্ষের সূচনাতেও সেই প্রবাহধারা লক্ষ্য করা গেল। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১২৯৯ অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন টা টো টে শীর্ষক শব্দতত্ত্ববিষয়ক একটি প্রবন্ধ। পরের সংখ্যাতেই (১২৯৯ পৌষ) প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ শিক্ষার হেরফের। প্রবন্ধটি রাজশাহীতে লোকেন পালিতের বাসায় আতিথ্য গ্রহণকালে রাজশাহী এসোসিয়েশনে পঠিত। প্রবন্ধটি ১২৯৯এর অগ্রহায়ণ মাসে (১৬ তারিখের মধ্যে), ১৮৯২এর নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। সাধনার পৌষ সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত রূপে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়-বর্ষের সাধনায় শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ পর পর প্রকাশিত হয়। সেগুলি এই—

রচনা	লেখক	সাধনা
শিক্ষার হেরফের	রবীন্দ্রনাথ	১২৯৯ পৌষ
শিক্ষা প্রণালী	লোকেন্দ্রনাথ পালিত	মাঘ
ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	চৈত্র
প্রসঙ্গ কথা	রবীন্দ্রনাথ	চৈত্র
প্রসঙ্গ কথা/শিক্ষা সংকট	রবীন্দ্রনাথ	১৩০০ আষাঢ়

সাধনার পুরাতন পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের সূচনাংশটি এখানে প্রথমে উদ্ধার করে দেওয়া গেল। প্রবন্ধটি গ্রন্থে সংকলন কালে কবি নিম্নোদ্ধৃত অংশ বর্জন করেছিলেন। কিন্তু কৌতূহলী পাঠকের নিকট এই অংশের আকর্ষণ কম নয়। কিছু অতিরিক্ত কথা এই অংশেও পাওয়া যায়।

"আমাদের বঙ্গসাহিত্যে নানা অভাব আছে সন্দেহ নাই ; দর্শন বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই ;

এবং সেই কারণে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় সে জন্য আক্ষেপ পরে করিলেও চলে, আপাততঃ শিশুদের পাঠ্য পুস্তক দুই চারিখানি না পাইলে নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না।

পৃথিবীর পুস্তক সাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্স্টবুক কমিটি হইতে যে সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না।

কেহ না মনে করেন আমি শুদ্ধমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটিদ্বারা দেশের অনেক ভাল হইতে পারে ; তেলের কল, সুরকির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারি পূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোনো কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদ্গতি হয় না। অতএব কমিটি নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্য-রস-বর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব ? আখ-মাড়া কলের মধ্য দিয়া যে সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না ; 'সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।

অতএব, কমিটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট-বিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎ-সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য পুস্তকগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণী হইতে বহির্ভূত করা যাইতে পারে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোলবিবরণ এবং নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষাপুস্তক।"

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার যে-সমালোচনা করেছিলেন, তা আজও কম সত্য নয়। কবি স্পষ্টতঃ বললেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ব্যতীত শিক্ষা কখনই সর্বব্যাপী হতে পারে না। কবি কখনো বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজি না শিখলে কারো জ্ঞান বিকাশ হবে না—এই দৃঢ়বদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধেই তিনি প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বাঙ্গালী ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই।" এর কারণ কি? কারণ আমাদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হল ইংরেজি; এই বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করতে করতেই আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায়। যখন শেষে ওই বিদেশী ভাষা আয়ত্তে আসে তখন আর যথার্থ শিক্ষালাভের অবকাশ থাকে না। এর ফলে আমাদের ভাষা ভাবনা ও আচরণের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সমন্বয় থাকে না। যারা সামান্য বাংলা শেখে তারাও রামায়ণ প্রভৃতি কাহিনী পাঠ করতে পারে, কিন্তু যারা এদেশে সামান্য ইংরেজি শেখে তারা কোনো কিছু আয়ত্ত করতে পারে না। দেখা যায় ছাত্রদের জীবনে 'গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে, আর তাদের বসতিজগৎ অন্য প্রান্তে'। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য স্থাপন কি ভাবে সম্ভব সেটাই হল মুখ্য বিবেচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মতে এ মিলন সাধন সম্ভব হতে পারে কেবল বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরের মাসেই (১২৯৯ মাঘ) মুদ্রিত হল লোকেন্দ্রনাথ পালিতের প্রবন্ধ—শিক্ষা প্রণালী। এই প্রবন্ধে শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার স্থান সম্পর্কে লেখক যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে ভাষাকে ভাষাস্বরূপে শিক্ষা দেওয়াই ভালো। ভাষা শেখার পূর্বে সেই ভাষায় অন্য কঠিন বিষয় শিক্ষা দিলে না-হয় ভাষাশিক্ষা, না-হয় বিষয়শিক্ষা। তাঁর মতে নিম্নশ্রেণী থেকে ইংরেজিটা খালি ভাষাস্বরূপে পড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে বিদেশী ভাষায় ইতিহাস ভূগোল অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেবার বা পরীক্ষা নেবার কোনো প্রয়োজন নেই।

বন্ধু লোকেন্দ্রনাথের এই অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ সাধনার চৈত্র সংখ্যায় (১২৯৯) 'প্রসঙ্গ কথা'য় লিখলেন, "শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।"

সাধনার পৌষ সংখ্যায় শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধ পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রবন্ধকারকে যে পত্র দেন, তা সাধনার চৈত্র সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা'য় প্রথমে মুদ্রিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

"পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

"আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি,...তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি।"

আনন্দমোহন বসু লিখেছেন—

"পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর বিষয়সম্বন্ধীয়, ভাবগুণে এবং ভাষালালিত্যে আবার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে।"

১৩০০ আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষাতত্ত্বের কথা আরও একবার লিখতে হল 'প্রসঙ্গ কথা' শিরোনামায়। ভারতীতে ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা সংকট নামে এক প্রবন্ধে সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসংক্রান্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। ভারতীর লেখক মোহিনীমোহন রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিত উভয়ের বক্তব্যেরই বিরোধিতা করে তর্ক উপস্থিত করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তর্কের আরম্ভেই যখন মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন হয় তখন সেই নিষ্ফল বাক্‌যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাই সুবুদ্ধিসঙ্গত।" তথাপি কবি ভারতীর লেখকের প্রতিবাদের উত্তরে আবার আলোচনায় যোগ দেন।

রবীন্দ্রনাথ এবার বললেন, "কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের

অস্পৃশ্যপ্রাণকেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ সাধন হয়।"

ভারতীর লেখক সাধনার প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর একটি ভাব মনে উদয় হয়—সন্দেহ উঠে যে, লেখকগণ হয় ত অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এদেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক—এটা ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড নয়।"

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেন, "আমরা ঠিক সেই কথাটাই ভুলি না। আমরাই বারংবার বলিতেছি—এদেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এখানকার দেশি ভাষা বাঙ্গলা, ইংরাজি নহে। যদি কর্ষণ করিয়া সম্যক ফল লাভ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বাঙ্গলায় করিতে হইবে, নতুবা ঠিক 'কাল্‌চার' হইবে না।"

আলোচনার উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বললেন. "বাঙ্গলার শস্য, বাঙ্গলার ভাষা, বাঙ্গলার সাহিত্যের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এবং একান্ত বিশ্বাস আছে একথায় যাঁহাদের 'সন্দেহ' হয় তাঁহারা পুনর্বার ধীরভাবে আলোচ্য প্রবন্ধগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ কবিয়া পড়িয়া দেখিবেন।"

সাধনার প্রথমবর্ষে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আহারতত্ত্ব ও লয়তত্ত্ব নিয়ে বাদপ্রতি-বাদের ঝড় উঠেছিল; সাধনার দ্বিতীয়বর্ষেও দেখি সে-ঝড় প্রশমিত হয় নি। চন্দ্রনাথ বসু 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১২৯৯ কার্তিক সংখ্যায় কড়াক্রান্তি নামে আবার এক নূতন প্রবন্ধ লিখলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের বিরোধিতা করে লিখলেন কড়ায়-কড়া কাহন-কানা শীর্ষক প্রবন্ধ; প্রকাশিত হল সাধনায় ১২৯৯ পৌষ সংখ্যায়। বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষার ফলে আমাদের মন যেমন যথার্থভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানান্বেষণের ঔৎসুক্য বোধ করতে পারে নি, তেমনই স্বজাতীয় শাস্ত্রের শিক্ষায়, আচারের অত্যাচারেও আমাদের মন জড়ত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। লক্ষণীয়, শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটি যে-সংখ্যায় প্রকাশিত, কড়ায়-কড়া কাহন-কানা প্রবন্ধটিও সেই সংখ্যায় ছাপা হয়। 'পেনি ওয়াইজ্ পাউণ্ড ফুলিশ' এরই বাংলা তর্জমা কড়ায়-কড়া কাহন-কানা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিলা দেওয়া হয়।

তাহার ফল হয়, 'বজ্র আঁটন ফস্কা গিরো'—প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল। আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা, আচার বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।"

পরের মাসে (১২৯৯ মাঘ) বাঙ্গলা লেখক প্রবন্ধে কবি এই সব কথাই অন্যভাবে আলোচনা করলেন। আসলে এ প্রবন্ধও চন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করেই রচিত। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে লেখকদের অবস্থার চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে বাঙালী পাঠকবর্গের কথাও আলোচনা করেছেন। এ দেশে একেই পাঠক সংখ্যা যৎ সামান্য, "তাহার মধ্যে এমন পাঠক 'কোটিকে গুটিক' মেলে কি না সন্দেহ, যাঁহারা কোনো প্রবন্ধ পড়িয়া কোনো সুযুক্তি শুনিয়া আপনার জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্তন সাধন করেন।" পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলিয়ে যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সঙ্গে মেলে ততটুকুই গ্রহণ করে, বাকিটুকু চোখ চেয়েও দেখে না। এই পাঠক-শ্রেণীর ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নেই, এঁদের চোখের সামনে দিয়ে যা চলে আসছে তাই চলে যাচ্ছে অবলীলায়। তাই লেখকেরাও নিজ নিজ লেখার প্রতি কোনরূপ দায়িত্ব অনুভব করে না। ভুল লিখলে কেউ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখলে কেউ প্রতিবাদ করে না, 'নিতান্ত ছেলেখেলা' করে গেলেও তা প্রথম শ্রেণীর ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। মুখ্যতঃ চন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, "আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকও পৃথিবীর ধারণাযোগ্য পদার্থসকলকে গুরুমন্ত্র পড়িয়া ধারণাতীত করিয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক কুহেলিকা নির্মাণ করিতেছেন।" অথচ কেউ এর প্রতিকার করে না, বরং লেখকের তর্ক চাতুরীর 'নৈপুণ্য' দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লেখকসমাজের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, "এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।" এই উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখকসত্তার স্বরূপটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সাধনার দ্বিতীয়বর্ষের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা 'ডায়ারি'। এই ডায়রি সাধনার দ্বিতীয়বর্ষে ও পরে চতুর্থবর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় এই ডায়রিকে কোনো কোনো সংখ্যায় পঞ্চভূতের ডায়ারি পাঞ্চভৌতিক ডায়রি

বা পাঞ্চভৌতিক সভা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। পরে এই রচনাগুলি একত্রে সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে পঞ্চভূত নামে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'গদ্যগ্রন্থাবলী' প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত হয়ে পঞ্চভূত কিছু পরিবর্জিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এর দীর্ঘকাল পর ১৩৪২ বঙ্গাব্দে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পঞ্চভূত প্রকাশিত হয়। এবারের সংস্করণে 'পরিত্যক্ত পুরানো পাঠ' গৃহীত হয়। কেবল একটি প্রবন্ধের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ নূতন করে কিছু অংশ লিখে দেন। দ্বিতীয়বর্ষে পঞ্চভূতের অন্তর্গত যে-ক'টি রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ করা গেল—

সাধনার রচনা	গ্রন্থভুক্ত নাম	প্রকাশকাল
ডায়ারি / ভূমিকা	পরিচয়	১২৯৯ মাঘ
পঞ্চভূতের ডায়ারি	গদ্য ও পদ্য	ফাল্গুন
ডায়ারি	নরনারী	চৈত্র
ডায়ারি	মনুষ্য	১৩০০ বৈশাখ
ডায়ারি	মন	জ্যৈষ্ঠ
পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি	অখণ্ডতা	শ্রাবণ
পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি	সৌন্দর্যের সম্বন্ধ	ভাদ্র
ডায়রি	পল্লীগ্রামে	আশ্বিন-কার্তিক

সাধনার চতুর্থবর্ষে পঞ্চভূতের আরও অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল, সে-কথা পূর্বেই বলেছি। সেগুলির কথা পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে।

পঞ্চভূত গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ ('পরিচয়') যেখান থেকে শুরু সাধনায় উক্ত প্রবন্ধের ('ভূমিকা') গোড়ায় অতিরিক্ত আরও কিছু অংশ ছিল। পঞ্চভূত গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে ওই অংশটি আমাদের সংগ্রহ করা আবশ্যক।

"পাঠকেরা যদি 'ডায়ারি' শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন। যদি সহসা তাঁহাদের এমন আশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, লোকটা নিশ্চয় সহসা মারা গিয়াছে, এখন তাহার দৈনিক জীবনের গোপন সিন্দুক হইতে তাহার প্রতিদিবসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলি সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটন করিয়া রীতিমত ফর্দ করা হইবে, তবে তাঁহারা অত্যন্ত নিরাশ হইবেন। কারণ, আমি এখনো বাঁচিয়া আছি। আমার প্রতিদিনের খসড়া হিসাব এখনো আমার চাবির মধ্যেই আছে।

তবে, ব্যাপারটি কি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। খুব যে পরিষ্কার হইবে এমন আশাও দেওয়া যায় না।

শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা। ভিতরে পাঁচটার প্রমাণ কি তাহা লইয়া অল্প দিন হইল আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়া হইয়া গেছে, সে কথা পরে বলিব। বাহিরে পাঁচটা বলিতে কি বুঝায় সে কথা সংক্ষেপে সারিয়া লই।

কোনো মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। সামাজিক আদান প্রদানের নিয়মে একজন মানুষ, যে, অনেক জন মানুষের দ্বারা গঠিত হয়, এখানে আমি সেই অতি সাধারণ কথার উত্থাপন করিতেছি না। কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ মানুষ বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্মাণ করে। তাহার অসংখ্য আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দেশ করিয়া দেয়। তেমন পারদর্শী জরিপ-আমিন থাকিলে একটা মানুষের সীমা ভাঁওরাইয়া নিম্নলিখিতমত চৌহদ্দি স্থির করিয়া দিতে পারেন—

ব্যক্তি শ্রীঅম্বিকাচরণ। উত্তরে শ্রীশ্যামশঙ্কর। দক্ষিণে শ্রীমতী—নাম করিয়া কাজ নাই। পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র। পশ্চিমে শ্রীমতী—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়া উত্তরপশ্চিম, পূর্বদক্ষিণ প্রভৃতি আরও অনেক কোণ আছে।

উক্ত সীমানার বাহিরে সার্ভে অনুসারে পৃথিবীর অসংখ্য লোকের সহিত অম্বিকার দূরতর এবং নিকটতর সম্পর্ক আছে। কিন্তু দৈবযোগে কেবল শ্যামশঙ্কর, প্রফুল্লচন্দ্র এবং মাননীয়া শ্রীমতী অনামিকারাই অম্বিকাচরণের সহিত সংলগ্নভাবে অবস্থিত। তাহাদিগকে বাদ দিলে অম্বিকাচরণের ম্যাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকারের হইত।

যেমন অম্বিকাচরণের, তেমনি আমারও জনকতক লোক আছেন এই মানবজন্মে যাঁহাদিগকে আমি বিশেষরূপে আমারই জ্ঞান করি, যাঁহারা আমার জীবনের অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্বে সম্বদ্ধ হইয়া আমার পরিধির একটি বিশেষ গঠন নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

রচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচ জনকে লওয়া যাক। এবং তাঁহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।"

গ্রন্থের সূচনা নিম্নরূপ—

"রচনার সুবিধার জন্য আমার পাঁচটি পারিপার্শ্বিককে পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।" এই পঞ্চভূত ব্যতীত আর যাঁকে পাই তিনি ষষ্ঠ ভূত বা ভূতনাথ বা লেখক স্বয়ং। ক্ষিতি এবং ব্যোম ছাড়া বাদবাকির নামকরণ এইরূপ : অপ=স্রোতস্বিনী, তেজ=দীপ্তি এবং মরুৎ= সমীরণ (সমীর)।

শ্রীমতী দীপ্তি একদিন প্রতঃকালে ভূতনাথকে বললে, 'তুমি তোমার ডায়ারি রাখনা কেন?' এই সূত্র ধবে শুরু হলো ডায়ারি লেখার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে সকলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। বস্তুতপক্ষে এই আলোচনা মূল রচনার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। দীপ্তির কথায় সমীর উৎসাহ দেয়। ডায়ারি লেখার দোষগুণ সম্বন্ধে স্রোতস্বিনী ভূতনাথের অভিমত জানতে চাইলে ভূতনাথ বলেন, "ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট গোলমাল আছে, সবকটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।...আমি নিজেকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।...জীবন একদিকে একটা পথ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর একটা রেখা কাটিয়া যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা, যখন বোঝা শক্ত হইয়া দাঁড়ায় তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায়, না, তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। দুটি রেখার মধ্যে কে আসল কে নকল, ক্রমে স্থির করা কঠিন হয়।" যাই হোক শেষ পর্যন্ত ভূতনাথ ডায়রি লিখতে সম্মত হল। তবে বললেন, "আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের।" স্থির হলো এই রচনার মধ্যে সর্বক্ষেত্রে 'সত্যের অনুরোধ' পালন করা হবে না, এবং বন্ধুদের 'মুখে কথা বানাইয়া' দেবেন।

যাই হোক, এখন প্রশ্ন পঞ্চভূতের ডায়ারির প্রেরণা কি? এই পাঁচটি ভূতের

মূলে সত্যই কি কেউ কেউ আছেন? এ বিষয়ে নানা মত আছে। রাজশাহীর শরৎকুমার রায়ের লেখায় আছে—"অক্ষয়বাবুর (মৈত্রেয়) মুখে শুনিয়াছি, তিনি এবং নাটোরের মহারাজ (জগদিন্দ্রনাথ রায়) নাকি রবিবাবুর পঞ্চভূতের ডায়ারির দুইটি ভূত ছিলেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে বন্ধু লোকেন পালিতের নিকট গিয়েছিলেন ২৯ কার্তিক ১২৯৯। তারপর দিন-আঠারো সেখানে কাটান। রাজশাহীতে সে-সময়ে কয়েকজন সাহিত্যিক-মনীষীও ছিলেন। কবি সেখানে আসাতে লোকেন পালিতের বাসায় বেশ একটা সাহিত্যিক মজলিশ জমে ওঠে। এঁদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎকুমার রায় প্রমুখ। প্রমথ চৌধুরীর মতে রবীন্দ্রনাথের মাথায় ডায়রির আইডিয়াটা এই সময়েই ঘুরছিল, হয়তো বা রাজশাহীতে বসেই ওই ডায়রির সূচনা ঘটে, কারণ দু মাস পরেই মাঘ মাসের (১২৯৯) সাধনায় ডায়রির ভূমিকা-অংশ ছাপা হয়।[২]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও সাহিত্যিক মজলিশ জমতো। 'পারিবারিক-স্মৃতিলিপি' নামে একটি খাতা ছিল। সেই খাতাটি ছিল আড্ডা বা আলোচনার একপ্রকার ডায়রি বা সংগ্রহপুস্তক। অবশ্যই হস্তাক্ষরে রচিত পুস্তক। এই খাতায় রচনার সূত্রপাত ঘটে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। তারপর কয়েক বৎসর লেখালেখি চলতে থাকে। ১২৯৫এর ২২ কার্তিক থেকে ৫ পৌষ—এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দিনই খাতায় কিছু না কিছু লিখতেন। সাহিত্যিকরা এই খাতায় নানা বিষয়ে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য লিখতেন। একই বিষয়ে নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করতেন। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন লেখকদের মধ্যে প্রধান। অর্থাৎ এ-খাতায় তিনিই ভূতনাথবাবু। বাদ-প্রতিবাদ-আলোচনায় আর যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণী, সরলাদেবী চৌধুরাণী, লোকেন পালিত, সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ। এর তিন বৎসর পর যখন সাধনা প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল পারিবারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তকের অনেক সাহিত্যিকই সাধনারও লেখক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূত নামে যে-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা মুখ্যত এই পাণ্ডুলিপির উপাদান ও আইডিয়া হইতে গৃহীত।"[৩] কোথাও কোথাও পাণ্ডুলিপির রচনার সঙ্গে পঞ্চভূতের রচনার

১-৩. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

বিষয়গত মিল যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক-স্মৃতিলিপির রচনারীতির সঙ্গেও পঞ্চভূতের রচনারীতির মিল লক্ষণীয়।

পঞ্চভূতের পাঁচ জন কে কে হতে পারেন এ বিষয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। তাঁর একটি লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"অনুমান করা যেতে পারে এঁদের মধ্যে দীপ্তি হচ্ছেন কাদম্বরী দেবী আর স্রোতস্বিনী হচ্ছেন ইন্দিরা দেবী। কাদম্বরী দেবী অবশ্য এর কয়েক বৎসর পূর্বে লোকান্তরিতা হন। কিন্তু রবীন্দ্র-মানসে তিনি ছিলেন অবিস্মরণীয়া। তাঁর যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় তেজের অংশ তাঁর চরিত্রে বেশ ছিল। ইন্দিরা দেবীর বয়স এ সময়ে অল্প। তবে এই বয়সেই কবির সাহিত্যিক জীবনে তাঁর স্থান লাভ হয়েছিল।...পঞ্চভূতের পাঁচ ভূতের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্যোম যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন। শ্রীযুক্ত সমীর খুব সম্ভব লোকেন পালিত। প্রমথ চৌধুরীর আদলও যে তাঁতে মাঝে মাঝে না দেখা যায় তা নয়, তবে এ সময়ে চৌধুরী মশায়ের বয়স ছিল অল্প। শ্রীযুক্ত ক্ষিতি যে কে, অর্থাৎ কার সঙ্গে তাঁর চরিত্র মেলে, তা অনুমান করা কঠিন। সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে নন তা সহজেই বোঝা যায়, কেন না, ক্ষিতি বাস্তববাদী কিছু বেশি—অবশ্য সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিও। প্রিয়নাথ সেন, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, এঁদের কেউ ক্ষিতির রূপ পেয়েছেন কি না তা ভাবা যেতে পারে।"[৪]

এখন যথার্থভাবে বলা কঠিন পঞ্চভূতের কে কি ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর বন্ধুদের প্রতি বলেছেন, "তোমরা কিছু ভাবিও না আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।"

পঞ্চভূতের রচনারীতি ও আঙ্গিকের সঙ্গে অপর কোনো কোনো রচনার আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক। হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন, "গ্রীক কোরাস, ল্যাণ্ডরের Imaginary Conversations, Oliver Wendell Holmes-এর The Autocrat of the Breakfast Table ইত্যাদি...রচনার সঙ্গে পঞ্চভূতের আকৃতি-প্রকৃতিগত অল্পবিস্তর সাদৃশ্য

৪. পঞ্চভূত, শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ, ১৩৬৮।

যে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।...ল্যাণ্ডরের 'ইম্যাজিনারি কনভার্সেশন্‌স্' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৪ থেকে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। প্রায় একই সময়ে – ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে Oliver Wendell Holmes তাঁর The Autocrat of the Breakfast Table লিখতে আরম্ভ করেন।...১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। পঞ্চভূতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেমন ভূতনাথ, প্রাতরাশের টেবিলে স্বয়ং হোমস্ তেমনি হয়েছেন Autocrat, Poet এবং Professor।"[৫]

সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে[৬] পঞ্চভূতের উপর অসকার ওআইল্ডের প্রভাব দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। প্রবন্ধ-লেখক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় নানা তথ্য ও সাদৃশ্য সহযোগে দেখাতে চেষ্টা করেছেন ওআইল্ডের 'Intentions'-এর অন্তর্গত রচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতের অন্তর্গত কিছু কিছু রচনা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত। 'Intentions'-এর লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত রচনার পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছিল সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। 'Intentions'-ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ডায়রি রচনার পূর্বেই। উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকাল ২ মে ১৮৯১।

'Intentions' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধের নাম 'The Decay of Lying/An observation/A Dialogue'। উক্ত প্রবন্ধের একটি অংশ –

"Nothing is more evident than that Nature hates Mind. Thinking is the most unhealthy thing in the world, and people die of it just as they die of any other disease. Fortunately, in England at any rate, thought is not catching. Our splendid physique as a people is entirely due to our national stupidity. I only hope we shall be able to keep this great historic bulwark of our happiness for many years to come."

৫. রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ, 'পঞ্চভূতের রবীন্দ্রনাথ'।

৬. The Opposing Self ; A Comparative Study of Tagore's 'Panchabhuta' and Oscar Wilde's 'Intentions', শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, The Visva Bharati Quarterly, Vol 39, No. 3 & 4.

এখন ১৩০০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সাধনা থেকে ডায়রির (মন) একটি অংশ উদ্ধৃত করি—

"কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতা গাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে এ সরস শ্যামল দারু-জীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়। তবে চিন্তায় উহার চিকণ সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মত কুঞ্চিত হইয়া আসে।"

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় আরও অনেক অন্যোন্য সাদৃশ্যের উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। আমাদের বিশেষভাবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ অসকার ওআইল্ডের এই প্রবন্ধটি 'Intentions' গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই পড়ে থাকতে পারেন। 'The Decay of Lying' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ জানুআরি সংখ্যার 'The Nineteenth Century' পত্রে। এই পত্রিকা যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নিয়মিতই পড়তেন তা সাধনার পাঠক মাত্রেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ লিখিত সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগটিতে 'The Nineteenth Century' পত্রিকার অন্তর্গত বহু রচনার সার সংকলিত হয়েছে।

হস্তাক্ষরে রচিত পারিবারিক-স্মৃতিলিপি থেকে কোনো কোনো উপাদান ও উপকরণ যে পঞ্চভূতে গ্রহণ করা হয়েছে তার কিছু প্রমাণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে এই পারিবারিক-স্মৃতিলিপি খাতাটি আছে। সমগ্র খাতাটিই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

যাই হোক, এখানে প্রথমে পারিবারিক-স্মৃতিলিপি খাতা থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা-কণিকা উদ্ধার করবো; পরে সাধনার ১২৯৯ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত পঞ্চভূতের ডায়ারির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা যাবে। স্মরণীয়, উক্ত প্রথমাংশ পরে পঞ্চভূত গ্রন্থ থেকে বর্জিত হয়। আমরা পূর্বেই তালিকায় উল্লেখ করেছি সাধনায় ১২৯৯ ফাল্গুনে যে-ডায়রিটি প্রকাশিত হয়, গ্রন্থে সেটি-ই 'গদ্য ও পদ্য' নামে চিহ্নিত।

পারিবারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তক থেকে শরৎকাল শীর্ষক রবীন্দ্ররচনা—

"আবার শরৎকাল আসিয়াছে। এই শরৎকালের মধ্যে আমি একটি নিবিড় গভীরতা, একটি নির্মল নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি।...শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত আকারে আমার হৃদয়ের শিরায় মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। কবিতার মধ্যে

অনেক সময়ে এইরূপ স্মৃতি জাগরণের কথা লেখা হয়, সে কথা সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না—মনে হয় ও একটা কবিতার অলঙ্কার মাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটা ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ। বাঁশির শব্দে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তাহাকে স্মৃতির অপেক্ষা বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি। নহিলে 'বিস্মৃতি জাগিয়া উঠা' কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতর মনের ভাবটি হয় অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়।...” ইত্যাদি।

এবার সাধনায় মুদ্রিত পঞ্চভূতের ডায়ারি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি। পরে গ্রন্থভুক্তি কালে অনেকটা অংশ পরিত্যক্ত হয়। আমরা এখানে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলাম—

“শরৎকাল। রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কি এক নূতন উত্তাপেব দ্বারা সোনাকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে, সোনা আর নাই, কেবল তাহার স্বুবর্ণময় লাবণ্যে দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বায়ুহিল্লোলের মধ্যে একটি চিরপরিচিত স্পর্শ প্রবাহিত হইতে থাকে। কাজকর্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চলিয়া যাইতেছে, না, মন্ত্রমুগ্ধ আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে বুঝা যায় না।

আমি বলিতেছিলাম—শরতের প্রভাতে যেন বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত-আকারে হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করে। কবিতায় অনেক সময়ে এই স্মৃতিজাগরণের কথা লেখা হয়, সে কথা সকল সময়ে ঠিকটি বোঝা যায় না, মনে হয় ও একটা কবিতার অলঙ্কার মাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ। বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু কিসের স্মৃতি তাহার কোনো ঠিকানা নাই। যাহার কোনো নির্দিষ্ট আকার নাই তাহাকে এতদেশ থাকিতে স্মৃতিই বা কেন বলিব, বিস্মৃতিই বা না বলিব কেন, তাহার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু 'বিস্মৃতি জাগিয়া ওঠে', এমন একটা কথা ব্যবহার করিলে শুনিতে বড় অসঙ্গত বোধ হয়। অথচ কথা নিতান্ত অমূলক নহে।...শরতের ঐ দিগন্তসংলগ্ন শুভ্র মেঘখণ্ড যেমন, হৃদয়ের এই অনির্দিষ্ট ভাবটিও সেইরূপ। যে জলকণা সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে রুদ্রনৃত্যে যোগ দিত এবং

যে শিশিরবিন্দুটি যূথীকলিকার মুখাগ্রভাগে দোদুল্যমান ছিল, তাহারা বাষ্প হইয়া ঐ মেঘের মধ্যে এক হইয়া আছে ; পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃদু বায়ুভরে অনন্ত আকাশময় স্বপ্নের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে ; সহসা এক সময়ে আপনাকে ধারণ করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া এক পসলা অশ্রুধারার মত ঝরিয়া পড়িবে।"

ডায়রির অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ নরনারী। এই প্রবন্ধে কবি আমাদের দেশের নর ও নারীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও চরিত্রের মূল্যায়ন করেছেন। পঞ্চভূতের দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী নারী ; অবশিষ্ট তিন—ক্ষিতি সমীরণ (সাধনার 'সমীরণ' গ্রন্থে 'সমীর' হয়) ও ব্যোম্। সুতরাং এঁদের মধ্যে নর ও নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে পারস্পরিক মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধটি যে পারিবারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তকের বেশ কয়েকদিনের আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আলোচনাগুলির সংখ্যা ও নাম, লেখকের নাম ও রচনার তারিখ প্রদত্ত হল—

	রচনার নাম	লেখক	তারিখ
২৬	স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব	রবীন্দ্রনাথ	১৯।১১।১৮৮৮
২৯	কবিতার উপাদান রহস্য	"	২০।১১।১৮৮৮
৩০	সৌন্দর্য ও বল	"	২১।১১।১৮৮৮
	আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব	"	"
৩৯	সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব	"	২৪।১১।১৮৮৮
৪১	আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব	"	২৬।১১।১৮৮৮
	Chivalry	"	"
৪৩	সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা লইয়া স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব	শরৎকুমারী চৌধুরাণী	"
৪৪	ঐ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	"
৪৫	ঐ	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	
৪৬		সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
৪৭		অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী	
৫০		শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৯।১২।১৮৮৮

এই রচনাগুলি এখানে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পারিবারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তকখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক মুদ্রিত হলে অদ্যাবধি অপ্রকাশিত বিভিন্ন জনের বহু সংখ্যক রচনা আমাদের সকলের হস্তগত হতে পারত। স্মরণীয়, এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বিশিষ্টতম লেখক। আমরা উপরে যে রচনাগুলির নির্দেশ দিলাম তা 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সাধনায় প্রকাশের পর পঞ্চভূত প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। অতঃপর ১৩১৪ 'গদ্যগ্রন্থাবলী প্রথমভাগে'র অন্তর্গত হয়ে মুদ্রিত হয়। এর দীর্ঘকাল পর ১৩৪২ চৈত্রে এই গ্রন্থ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে নরনারী প্রবন্ধের শেষে অতিরিক্ত কিছুটা অংশ কবি-কর্তৃক সংযোজিত হয়। প্রচলিত গ্রন্থে মূল প্রবন্ধ যেখানে শেষ তার নীচেই সাধনায় প্রকাশিত হবার মাস-কাল দেওয়া, এবং তারপর সামান্য ফাঁক দিয়ে সংযোজন অংশটি মুদ্রিত হয়েছে।

১৩৪২এর সংস্করণে হঠাৎ এই অতিরিক্ত সংযোজনের কারণ কি? এ বিষয়ে বেশ প্রত্যক্ষ সংবাদ পাওয়া যায় সুধীরচন্দ্র কর রচিত 'কবি-কথা' শীর্ষক গ্রন্থে।

"পঞ্চভূত ছাপা হচ্ছে; অনেকদিন পর নূতন সংস্করণ হবে। কবি নিজে একটি প্রুফ দেখতে চাইলেন। মেয়েদের আলোচনার অংশে এসে দাঁড়ালো এক বিপর্যয়। তাঁরই জানা উচ্চশিক্ষিতা একটি মেয়ে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন, ভালোবেসেছিলেন একজনকে। তাঁর ভালোবাসার দায়ে পুরুষটির উন্নতির পথ ব্যাহত হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তাঁকে বিয়ে করলেন না। কবি ঘটনা জেনে মর্মাহত হয়েছিলেন। রেগে গিয়ে বলেছিলেন,—সংসারে পুরুষদেরই অপবাদ—মেয়েদের তারা ডোবায়। কিন্তু কত মেয়ে যে পুরুষদের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়েছে, ভালোবাসার উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, তার খবর কে রাখে।

এই বলে আটকে রাখলেন প্রুফ। তাতে যোগ হল নূতন এক অধ্যায়, মেয়েদের উপর কড়া মন্তব্য নিয়ে।"

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এই গ্রন্থের অতঃপর আর কোনো পুনর্মুদ্রণ হয় নি।

সাধনায় প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের

সমালোচনাটি কি রবীন্দ্রনাথ-কৃত? বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে এই সমালোচনা প্রথম পুনর্মুদ্রিত করেন। সেখানে লেখাটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা বলেই উল্লেখ করা হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডের ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের সংস্করণে উক্ত সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলেই আলোচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে এই সমালোচনার উল্লেখ নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "সাধনার ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসে কবির সমালোচনা (কঙ্কাবতী) প্রকাশিত হয়। প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর পরে 'কঙ্কাবতী' নূতন সংস্করণ প্রকাশনকালে অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এই বিস্মৃত রচনাটি উদ্ধার করিয়া গ্রন্থমুখে ভূমিকারূপে সংযোজন করিয়াছেন।" অতঃপর রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, "কঙ্কাবতীর বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।" এই প্রসঙ্গেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কিছু অংশ উদ্ধার করে দেন মূল সাধনা পত্রিকা থেকেই।

এখন আমাদের বিনীত প্রশ্ন, সাধনার এই সমালোচনাটি যে রবীন্দ্রনাথের সে-বিষয়ে আমাদের হাতে এমন কি প্রমাণ আছে? যদি কেউ বলেন ভাষার লক্ষণ দেখেই বোঝা যায় ওটি রবীন্দ্রনাথের—অন্য প্রমাণের দরকার নেই; তবে সে আলাদা কথা। নতুবা, এই সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা এ-কথা বলার পক্ষে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ আছে কি না—সে-বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। কারণ, পত্রিকার মধ্যে এমন কোনো নির্দেশ পাই না যার থেকে বলা যায় যে এটা রবীন্দ্রনাথের। পত্রিকার অর্ধবার্ষিক সূচিতেও দেখি 'সমালোচনা' বিভাগে লেখকের নাম নেই। অন্যত্রও এমন কোনো সূত্র পাই নি যার থেকে এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এমন হতে পারে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ হয়তো মৌখিক সম্মতি জানিয়েছিলেন রচনাটি তাঁর বলেই। সাধনায় এ-লেখাটি স্বাক্ষরহীন। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় না যে এটি অপর কারও রচনা, রবীন্দ্রনাথের নয়।

এ-প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন। সাধনার দ্বিতীয় বর্ষের কোনো গ্রন্থ-সমালোচনাতেই সমালোচকের নাম নেই। কঙ্কাবতীর সমালোচনাটিকে যদি রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে গ্রহণ করি তাহলে ওই বর্ষের অন্যান্য স্বাক্ষরহীন সমালোচনা-গুলিকেও কি রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে গ্রহণ করলে হয় না? কঙ্কাবতীর সমালোচনা যাঁর লিখিত, অন্যান্য সমালোচনাগুলিও তাঁরই বলে আমাদের বোধ হয়। কঙ্কাবতী যদি রবীন্দ্রনাথ লিখিত সমালোচনা হয় তাহলে সাধনায় প্রকাশিত

স্বাক্ষরহীন প্রায় সকল সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত বলে গ্রহণ করা যায়। আমরা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কঙ্কাবতী বা অন্যান্য কোনো কোনো গ্রন্থের সমালোচনাকে সাধনার প্রস্তুত সূচীপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে চিহ্নিত করি নি। কিন্তু তার মানে আমাদের বক্তব্য এই নয় যে এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়। আমরা যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি সেখানেই কেবল লেখকের নাম উল্লেখ করেছি। যেমন ধরা যাক, সাধনার চতুর্থ বর্ষের (১৩০১) ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত সমালোচনাটি। 'দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব' শীর্ষক গ্রন্থের সমালোচনাটি কার রচিত সে-সংবাদ সাধনা পত্রিকার মধ্যে নেই। রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের মধ্য থেকে জানতে পারি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা স্বয়ং কবি-কৃত। এ-প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রাবলীর ১৯০ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

সাধনার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই বৎসরেও কবি সাময়িক সারসংগ্রহ বিভাগে বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক রচনা লেখেন। যেমন উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য (১৩০০ জ্যৈষ্ঠ), অভ্যাসজনিত পরিবর্তন (১৩০০ আষাঢ), মানুষ সৃষ্টি (১৩০০ ভাদ্র), ওলাউঠার বিস্তার (১৩০০ ভাদ্র), ঈথর (১৩০০ ভাদ্র)।

১৩০০ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দুটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। পয়সার লাঞ্ছনা ও প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ। সমকালীন সমাজ শিক্ষা ধর্ম ও রাজনীতি হল কবির ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু। সাদাচামড়া ও কালোচামড়ার মধ্যে যে প্রভেদ সর্বক্ষেত্রে অতি সযত্নে মেনে চলা হয়, তার তীব্র প্রতিবাদ এবং এই কৃত্রিম পার্থক্যেব অসারত্ব দেখানোই পয়সার লাঞ্ছনা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ প্রবন্ধে কবি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সুতীব্র আঘাত করেন।

দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যা আশ্বিন ও কার্তিক (১৩০০) যুগ্ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতের ডায়ারি ব্যতীত অপর প্রবন্ধ ইংরাজ ও ভারতবাসী।

সাধনায় রাষ্ট্রনীতিক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল ইংরাজ ও ভারতবাসী শীর্ষক প্রবন্ধে। অতঃপর সাধনার তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে তাঁর রাজনীতি-বিষয়ক আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ একে একে প্রকাশিত হতে থাকে। সাধনায় রাজনীতিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ যেমন ইংরেজ

চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তাদের ঘৃণাপর স্বভাব এবং অহমিকার পরিচয় ফুটিয়ে তুললেন, তদ্রূপ আমাদেরই বা দুর্বলতা কোথায় তাও দেখিয়ে দিলেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে কবি ইংরেজের উপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত করলেন। ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুভব করেছিলেন যে, ইংরেজ-চরিত্রের যে ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীনতা শাসক-শাসিতের মধ্যে ভেদ মেনে ও দূরত্ব রেখে গৌরব বোধ করে তা-ই একদিন ইংরাজ-রাজত্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর বর্ণগত, চরিত্রগত, ব্যবহারগত যে সব অনৈক্য তা ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বিলুপ্ত করে শাসক-শাসিতের মধ্যে মিলন ঘটানো প্রয়াসের রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা সম্পর্কে সবটুকু সচেতন হয়েও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপেই স্বাদেশিক। ইংরেজের দয়ার উপর নির্ভর করে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না, আত্মনির্ভরতার মধ্যেই জাতির গৌরব দাঁড়িয়ে থাকে। গভীর বেদনা বহন করেও কবি বলেছেন—

"যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোন ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরাজের কাজে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব, অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।"

প্রবন্ধটি প্রকাশের পূর্বে চৈতন্য লাইব্রেরিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়েছিল।[৭]

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও শিক্ষাচিন্তার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নেই। তাঁর এই প্রবন্ধের মধ্যে পৌষ মাসের (১২৯৯) শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের মূল বাণীর প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।

সাধনার তৃতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক যে-সকল আলোচনা লেখেন, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন সেগুলির প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা গেল।

৭. দ্রষ্টব্য, সাধনার তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা।

সপ্তম অধ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার তৃতীয় বর্ষ

সাধনার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩০০ অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। ১৩০০ পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত হল তিনটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ : কর্তব্যনীতি / অধ্যাপক হক্‌সলির মত, বিনি পয়সায় ভোজ এবং ইংরাজের আতঙ্ক। লক্ষণীয়, এর পরের দুই সংখ্যা ১৩০০ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যাতেও রবীন্দ্রনাথের কোনো গদ্য-নিবন্ধ নেই। অবশ্য এ-সকল সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের গল্প বা কবিতা যথারীতি প্রকাশিত হয়। সাধনার চার বছরের ইতিহাসে কেবল এই তিনটি সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রবন্ধ-জাতীয় রচনা মুদ্রিত হতে দেখা যায় না।

Thomas H. Huxleyর 'Evolution and Ethics'এ যে সকল মতামত আছে তাকেই মুখ্যত অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যনীতি শীর্ষক রচনাটি লেখেন। রচনার শিরোনামের নীচেই 'অধ্যাপক হক্‌স্‌লির মত'—এ-কথাও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃ নির্দেশ করে দেন।

১৮৯৩ সাল। এই সময় মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে নব হিন্দুজাতীয়বাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সময় তিনি 'গোরক্ষণী সভা' আন্দোলন অর্থাৎ গোরক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারকে উদ্বোধিত করে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে আগ্রহী হন। গোরক্ষা আন্দোলন আজকের দৃষ্টিতে অনেকটা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিবেচিত হবে, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে, সে যুগে এই আন্দোলনের মূল্য কম ছিল না। এই আন্দোলন ইংরেজ সরকারকে আশঙ্কিত ও উত্তেজিত করেছিল। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বোম্বাই বিহার ও উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষাকে কেন্দ্র করে নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধে। এই বিরোধের পিছনে একটি অদৃশ্য হাত স্পষ্ট দেখা যায়।[1] এরই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের আতঙ্ক শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন। সমগ্র

১. দ্রষ্টব্য, নেপাল মজুমদার—ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড।

প্রবন্ধটিতে গোরক্ষা আন্দোলন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে যে-সকল হীন জঘন্য অপকৌশল গ্রহণ করা হয় তারই কঠিন স্পষ্ট সমালোচনা আছে।

প্রবন্ধের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য –

"হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্ণমেণ্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুংকারে যে, এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করা হইতেছে ; তুলা বেচারি একে ত পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল।

কেবল ইংরাজের মনে অকস্মাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ব্যাপারগুলি ঘটিতেছে।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজের উপনিবেশ পাকা করার জন্য যে নৃশংস অভিযান চলে তাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বাইরে গেল না। বিলাতি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ট্রুথ' থেকে বিবিধ পত্র ও প্রবন্ধ পাঠ করে কবি ম্যাটাবিলি যুদ্ধের সংবাদাদি জানলেন।

এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি –

"সে এক উদ্দাম সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার আপন আপন উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া আফ্রিকার স্বর্ণ ও খনিজ সম্পদ এবং কাঁচামালের লোভে বিশাল আফ্রিকা মহাদেশটিকে আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার তীব্র প্রতিযোগিতা পড়িয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অধিক তৎপর হইয়া উঠে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলণ্ডের একমাত্র কেপ-কলোনির উপর অধিকার ছিল ; ১৮৭০ হইতে ১৯০০ – এই কয় বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড আস্তে আস্তে নাটাল, রোডেসিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, গোল্ড কোস্ট, সোমালিল্যাণ্ড, উগাণ্ডা ও

মিশর দখল করিয়া লয়। আমাদের আলোচ্য পর্বে, ইংরাজ-সৈন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাটাবিলিদের এবং মিশর-বিদ্রোহ (আরবি পাশার নেতৃত্বে)-কে উৎখাত করিতে ব্যস্ত।"

ট্রুথ পত্রিকায় এই সকল বিবরণ পাঠ করে ইউরোপীয় শক্তিগুলির উন্মত্ত-সাম্রাজ্য-লালসা সম্পর্কে কবির মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সেই প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে রাজনীতির দ্বিধা শীর্ষক প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে দুটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করি –

"সভ্য খৃষ্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অষ্ট্রেলিয়ার কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃষ্টানের গালে খৃষ্টানী চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।…"

"সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি, য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মত খসিয়া পড়ে এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিছু সসঙ্কোচে বলিলাম নিকৃষ্টতর নহে, নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্বর লবেঙ্গুলা ইংরাজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজদের ক্রুর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে ইংরাজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।"

নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাটাবিলি যুদ্ধ আর ভারতবর্ষের ইংরেজ-শাসন, রবীন্দ্রনাথের চোখে এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কবি এখন সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক রূপটি দেখতে পেয়েছেন। সুদূর আফ্রিকার নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের সঙ্গে কবির এই যে গভীর একাত্মতাবোধ অথবা হতভাগ্য ম্যাটাবিলিদের প্রতি কবির যে গভীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায় – তা বিশেষ ভাবেই আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাজনীতির দ্বিধা প্রবন্ধ প্রকাশের (১৩০০ চৈত্র) তিন মাস পর আবার রবীন্দ্রনাথ রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সাহিত্যবিষয়ক মূল্যবান যে-কটি প্রবন্ধ লিখেছেন তার কথা পরে আলোচনা করব। ১৩০১ শ্রাবণে রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ পাই। এ সংখ্যায় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও আছে। ১৩০১ শ্রাবণে মুদ্রিত হল রাজা ও প্রজা, এবং বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য; ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হল অপমানের প্রতিকার শীর্ষক প্রবন্ধ।

রাজা ও প্রজা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে এই প্রবন্ধটি রচিত তা প্রবন্ধের সূচনাতেই ব্যক্ত হয়েছে।

"সিভিলিয়ান রাভীচি-সাহেব আইনলঙ্ঘনপূর্বক উড়িষ্যার কোনো এক জমিদারকে অপমান ও পীড়ন করাতে তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর ম্যাক্‌ডোনেল-সাহেব অন্যায়কারীকে এক বৎসরের জন্য নিগৃহীত করিয়াছিলেন।

ভাবিয়া দেখিলে ব্রিটিশ-শাসনাধীনে এরূপ ঘটনা আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণের নিকট এই ন্যায়বিচারটি আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই কারণে মূঢ়মতি সাধারণ কিছু সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনতিকাল পরেই ম্যাক্‌ডোনেল-সাহেব যখন যথাসময়ে এলিয়ট-সাহেবকে তাঁহার গদি ছাড়িয়া দিলেন তখন এলিয়ট আসিয়া ম্যাক্‌ডোনেলের বিচার লঙ্ঘনপূর্বক রাভীচিকে নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন আবার মূঢ়মতি সাধারণ সবিশেষ শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কর্তার ইচ্ছা কর্ম। কর্তাই জানেন এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন, আমরা কেবল অন্ধকারে অনুমান করিয়া মরিতেছি মাত্র।"

এই মরণের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ কি?

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারত-বর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।

এরূপ অবস্থায় আমাদের স্থায়ান্যায়বোধ প্রবল হইয়া উঠিলে ইংরাজের রাজনীতি বিপথগামী হইতে পারিবে না। ইংরাজ যখন জানিবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার কাজের বিচার করিতেছে তখন ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।"

এ কথাটাই আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

"যে গবর্ণর প্রজার মর্মবেদনার উপর, প্রজার ন্যায়ান্যায়বোধের উপর জুতার গোড়ালি ফেলিয়া ফেলিয়া চলেন এবং সেই মচ্‌মচ্‌ শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আর্তস্বর নিমগ্ন করিয়া দেন তিনি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান স্ট্রং গবর্ণর।

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বল প্রকাশ পায়, না, আমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্বলতার সূচনা করে তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। গবর্ণমেণ্টের এরূপ উদ্ধত অবজ্ঞায় ইহাই প্রকাশ পায় যে তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়বোধ এমন প্রবল নহে যে, তাহার নিকট সংকোচ অনুভব করা যায়। বরংচ এই চিরনিপীড়িত জাতির নিকট নিঃসঙ্কোচ স্বেচ্ছাচারই যথার্থ বলের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

আমরা যদি রাজপুরুষগণকে এমন কথা বুঝাইতে পারি যে, ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিলে সেটাকে আমরা বাহাদুরী জ্ঞান করি না, অন্যায় যতই বলিষ্ঠ দেখিতে হউক আমাদের প্রাচ্যস্বভাবেও তাহা ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বলিয়া অনুভব হয়, এবং সুদৃঢ় নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র সর্বলোকের প্রতি যথোচিত ন্যায়দণ্ড বিধান করিবার সাহস না থাকা আমাদের নিকট দুর্বলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে, তবে আমাদের সেই কর্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে ইংরাজ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, কারণ, সে আদর্শের সহিত তাঁহাদের নিজেদের আদর্শের ঐক্য দেখিতে পাইবেন।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় প্রজার উপর ইংলণ্ডের ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রত্যাশা করেছেন।

যে-সংখ্যায় রাজা ও প্রজা বেরোয় সেই সংখ্যাতেই ছাপা হল বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য। ১৮৯৩এর শেষ দিকে সুইডেন থেকে হ্যামারগ্রেন্‌ নামে এক সুইডিশ যুবক কলকাতায় আসেন। রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থাবলী পাঠ করে তিনি বঙ্গদেশের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজ জন্মভূমি থেকে এদেশে চলে আসেন কোনো সেবার কর্মে নিজের জীবন উৎসর্গ করবার সংকল্প নিয়ে। নিরন্তর কর্ম ও পরিশ্রমের ফলে এদেশে অকালেই তাঁর

মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে হ্যামারগ্রেনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেন হিন্দু মতে তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন হয়। এ ব্যাপার নিয়ে সনাতনী হিন্দুসমাজে ঘোর আন্দোলন দেখা দেয়। তাঁদের প্রশ্ন—বিদেশীয় বিধর্মীকে কেমন করে হিন্দুর শ্মশানে দাহ করা যায়? রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করেই বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন।

একই মাসে প্রকাশিত হয় অনধিকার প্রবেশ শীর্ষক ছোট গল্প। সেটিও এই প্রবন্ধের সঙ্গেই পাঠ করা আবশ্যক।

১৩০১ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হল অপমানের প্রতিকার। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় ইংরেজ সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধ ও নৈতিক চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেন।

দেশে এই সময়ের কিছু পূর্বে জুরি প্রথার সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন চলেছিল। এই প্রবন্ধ রচনার দেড় বৎসর পূর্বে (৯ ফেব্রুআরি ১৮৯৩) কটকে বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তের বাড়িতে এক ভোজসভায় র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের অশিষ্ট আচরণে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে আহত হয়েছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে এসে সাহেব ভোজসভায় বসে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন এবং বলেন জুরিপ্রথায় এই ভারতীয়দের সংখ্যা যত হ্রাস পায় ততই মঙ্গল। রবীন্দ্রনাথ পরের দিনেই ইন্দিরা দেবীকে যে পত্র লেখেন তাতেই দেখি ভোজসভার এই ঘটনায় কবি আহত এবং সাহেবের এই আচরণকে তীব্র নিন্দা করছেন। অপমানের প্রতিকার প্রবন্ধের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ কটকের এই ঘটনাটির অবতারনা করে এদেশীয় ইংরেজ-চরিত্রের সমালোচনা ও নিন্দা করলেন।

"একদা কোনো উচ্চপদস্থ বাঙালী গবর্মেণ্ট-কর্মচারীর বাড়িতে কোনো কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-দমন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

আহারান্তে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরিপ্রথার কথা উঠিল। ইংরাজ প্রোফেসর কহিলেন, যে দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধ শিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরাজ এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা সে বাহুল্য জ্ঞান করে। আমাদের নৈতিক

আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাঁহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পরুষবাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরাজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরাজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য করে।"

ইংরেজের অত্যাচার উৎপীড়ন ও অপমানের প্রতিকার হবে কোন্ পথে ?

"আমাদিগের প্রতি কর্তৃজাতীয়ের এই-যে অবজ্ঞা, সেজন্য প্রধানত আমরাই ধিক্কারের যোগ্য। কারণ, এ কথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না; সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাসিক স্বরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।"

ইংরেজ অপমান করে সেজন্য সে নিন্দার্হ, কিন্তু যারা সেই অপমানের প্রতিকার করতে পরাঙ্মুখ, তাদেরও কবি প্রশংসার পাত্র মনে করেন না। এই সময়ে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট বেটসন বেল্ এক মুহুরিকে প্রহার করেন। তা নিয়ে মকদ্দমা হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে লেখেন, "হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা।"

রবীন্দ্রনাথ জাতির কাপুরুষতা ও দুর্বলতাকে কোনোদিন সহ্য করতে পারেন নি। তিনি জাতীয় মানসে ও চরিত্রে একটি সর্বাত্মক নৈতিক দৃঢ়তা দান করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান আমাদের এই দাস মনোবৃত্তি ও কাপুরুষতার মূল আরও গভীরে এবং আমাদের সমাজ জীবনের মধ্যেই তা নিহিত। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ, তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে।...আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তরের নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা

করি। সেই আমাদের প্রতি মুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও, মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই-সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি, এবং সেই কারণেই ইংরাজ ইংরাজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, গৃহের শিক্ষায় এবং সমাজের শিক্ষায় যখন ভারতবাসী মনুষ্যত্ব উপার্জন করতে সক্ষম হবে তখন ইংরেজ বাধ্য হবে ভারতের মানুষকে শ্রদ্ধা করতে, এবং তখন ইংরেজের পক্ষে আর অপমান করার সাহসও থাকবে না।

সাধনার তৃতীয় বর্ষে ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশিত হয় তিনটি—বিনি পয়সায় ভোজ (১৩০০ পৌষ), অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি (১৩০১ ভাদ্র) এবং স্বর্গীয় প্রহসন (১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক)। ইতিপূর্বে সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনা আমরা লক্ষ্য করেছি।

বিনি পয়সায় ভোজ এক অভিনব রীতিতে লেখা নাট্যধর্মী রসরচনা। একটি মাত্র চরিত্রের উক্তির মধ্য দিয়েই সমস্ত কাহিনীটি বিবৃত। অথচ এ উক্তি স্বগতোক্তি নয়, পরিপূর্ণ সংলাপ। একটি চরিত্রের উক্তির মধ্য দিয়েই অপরের উক্তি শোনা গেছে। এই ভাবে একজনের উক্তির মধ্য দিয়ে সংলাপের অবতারণা অভিনব। সাধনায় রচনাটির নাম ছিল বিনি পয়সায় ভোজ, পরে গ্রন্থে বিনি পয়সার ভোজ নামে ছাপা হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই শ্রেণীর রচনার অনেকগুলিতে দেবতা নিয়ে ব্যঙ্গই প্রাধান্য লাভ করেছে। দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ; তৃতীয় বর্ষে মুদ্রিত হয়েছে অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি ও স্বর্গীয় প্রহসন; এখানে প্রসঙ্গক্রমে সাধনার চতুর্থ বর্ষের একটি রচনাও উল্লেখ করা আবশ্যক, নাম—নূতন অবতার।

সুকুমার সেন বলেছেন, "সাধনায় প্রকাশিত, সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে যাহাকে 'ভাণ' (monologue play) বলে সেইরূপ দুইটি ছোট রচনা—'বিনি

পয়সার ভোজ' ও 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি'—উল্লেখযোগ্য।"[২] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বিনি পয়সার ভোজ, অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি ইত্যাদি রচনাকে 'একক নাট্য বা monologue' বলেছেন [৩]

এখন, তৃতীয় বর্ষের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। তৃতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত সাহিত্যবিষয়ক প্রথম রচনা রাজসিংহ, ১৩০০ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের রাজসিংহ প্রথমে অংশত প্রকাশিত হয় ১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যায়। অতঃপর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। 'পুনঃপ্রণীত' রাজসিংহ (চতুর্থ সংস্করণ) প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০০)। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্করণটি অবলম্বনে তাঁর সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করেন। সমালোচনার শিরোনাম এইভাবে লিখিত—'রাজসিংহ। / (নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ)'।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' যে-মাসে প্রকাশিত হয়, সেই মাসেরই শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু (২৬ চৈত্র ১৩০০) ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা দেখে যেতে পেরেছিলেন ? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজসিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়া গিয়াছিলেন কি না জানি না।"[৪] আমাদের মনে হয় বঙ্কিম এই লেখা দেখে যেতে পারেন নি।

সাধনার চৈত্র সংখ্যাটি যদি যথাযথ দিনে প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে ধরতে হয় তার প্রকাশকাল ১৫ চৈত্র ১৩০০। কারণ সাধনা পত্রিকা প্রকাশের দিন প্রতি বাংলা মাসের ১৫ তারিখ। এর এগার দিন পর বঙ্কিমের মৃত্যু হয়।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আছে, "১৩০০ সালের শীতকালে সহসা রোগ বাড়িয়া উঠিল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগের উপশম হওয়া দূরে থাক, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অবশেষে চৈত্র মাসের প্রথমে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল।"[৫] অতঃপর মৃত্যু।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড।

৩ ৪. রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

৫. বঙ্কিম-জীবনী।

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় আছে, "১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে [চৈত্রের গোড়ায়] তাঁহাব বহুমূত্র রোগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন ; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।"

এই সকল তথ্য দেখে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ওই সময় চৈত্র মাসের সাধনা পাঠ করা সম্ভব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকেও বলেছিলেন, "চষা মাঠের উপর দিয়া পালকি চড়িয়া যাইবার সময় রাজসিংহ পড়িয়াছিলাম, বড় ভাল লাগিয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমবাবু তখন মৃত্যু শয্যায়, আমার সমালোচনা পড়িতে পান নাই।"[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা-মনোভাব ছিল। বিভিন্ন সময়ে নানা লেখার মধ্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন, আলোচনা করেছেন।[৭] রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসের প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন নানা আলোচনা প্রসঙ্গে। তবে রাজসিংহই বঙ্কিমের একমাত্র উপন্যাস, যা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পূর্ণাঙ্গরূপে সমালোচিত হয়।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজসিংহ বা প্রথম তিনটি সংস্করণের কোনো সংস্করণ কি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন ? হয়তো পড়েছিলেন, কারণ পড়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের একজন নিয়মিত পাঠক ছিলেন, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর কৌতূহল আকর্ষণ অনুরাগ। কিন্তু ক্ষুদ্রকথা-রাজসিংহের কোনো উল্লেখ রবীন্দ্র-রচনায় পাই না। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ রাজসিংহের সমালোচনাতেও 'ছোট' রাজসিংহের কোনো উল্লেখমাত্র নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে অনেক গ্রন্থের সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করেন, যে-সমালোচনাগুলির শিরোনাম ছিল গ্রন্থের নামানুসারেই। যেমন 'অবকাশরঞ্জিনী', 'মানসবিকাশ', 'দানবদলন কাব্য', 'বৃত্রসংহার', 'পলাশির যুদ্ধ', 'ঋতুবর্ণন'

৬ মানসী ও মর্মবাণী ১৩২৩ ফাল্গুন।

৭. দ্রষ্টব্য, বর্ত্তমান লেখকের—অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। এবং বর্ত্তমান লেখক কর্তৃক সংকলিত রবীন্দ্রনাথ প্রণীত বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক গ্রন্থ।

ইত্যাদি।[৮] সাধনা পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ-কৃত রাজসিংহের সমালোচনা, সেই জাতীয় প্রথম রচনা।

ইতিপূর্বে, ১২৮৪ ও ১২৮৯এ, কবি মেঘনাদবধ কাব্য যে-রীতিতে সমালোচনা করেন, রাজসিংহ প্রচলিত সেই সমালোচনা রীতি থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। রাজসিংহ হল রবীন্দ্রনাথ-কৃত একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা-নিবন্ধ।[৯]

রাজসিংহের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনোই সমালোচকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নি; সেখানে কবি স্পষ্টত একজন সাহিত্য-পাঠক মাত্র। রচনার ভঙ্গিটি আদৌ সমালোচকের নয়, গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে পাঠকের যে চিন্তা ভাবনা প্রশ্ন সংশয় ও সুখানুভূতি জন্মে—তা-ই যেন ডায়রির আকারে রচিত। আসলে কবি এখানে সমালোচনা-প্রবন্ধের কোনো নূতনতর ভঙ্গি প্রবর্তনে আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে নূতন নূতন প্রকরণেব প্রতি প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক মাত্রই বিচারক নন, সমালোচ্য গ্রন্থটি মনোমত না হলেও—সমালোচক সেখানে বিচারক নন, পাঠক। সমালোচকই বা কেন সর্বদা গ্রন্থকারের উপরে আসন গ্রহণ করবেন? সম্ভবত এই রচনাটি লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্নগুলি জেগেছিল। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ এখানে যাঁর গ্রন্থের সমালোচনা করছেন তিনি কবিব একজন শ্রদ্ধাভাজন মনস্বী সাহিত্যিক এবং তিনি তখন জীবিত। তাই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে নিজেকে কখনই তথাকথিত সমালোচকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন নি। এখানে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত একজন পাঠকমাত্র যিনি সমালোচনা নয়, উপন্যাসের রসগ্রহণে একান্ত আগ্রহী। এ যেন উপন্যাস পাঠ সম্পূর্ণ করে লিখতে বসা নয়, পড়তে পড়তে চলা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই লেখা।

মূল সমালোচনাটি থেকে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"চষা মাঠের মাঝখানে ভাঙা পথ বাহিয়া পালকি চড়িয়া চলিতে চলিতে বঙ্কিমবাবুর নূতন সংস্করণ 'রাজসিংহ' পড়িতেছিলাম।···মাঝে মাঝে যখন গ্রামের নিকটে আসিতেছিলাম আমার গ্রন্থপাঠের সহিত বনের ছায়া, পাখির

৮. দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখক কর্তৃক সংকলিত—বঙ্কিমচন্দ্র কৃত সাহিত্য-সমালোচনা: দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ।

৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে।

গান এবং আম্রমুকুলের গন্ধ মিশ্রিত হইতেছিল। অখণ্ড অবসর ছিল—এবং কল্পনাকে বাধা দিবার জন্য না ছিল জনতা, না ছিল অট্টালিকা, না ছিল অবরুদ্ধ রাজপথের ধূলিমিশ্রিত বিচিত্র কোলাহল।"

"এইজন্য মাঠের মধ্যে আমার রাজসিংহ পড়িবার বড়ো সুযোগ ঘটিয়াছিল। বইখানি আমার হাতে ছিল বটে—কিন্তু আসল ব্যাপারটি বাঁধানো গ্রন্থের কালো মলাটের কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত মাঠ এবং সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছিল।"

"মনে করিলাম এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা-কিছু লিখিয়া ফেলি। কিন্তু সমালোচনা লিখিতে হইবে মনে করিলেই ভয় হয়। একটা তো আগাগোড়া ফাঁদিয়া বসিতে হইবে—একটা তো নূতন কথার অবতারণা করিতে হইবে। গ্রন্থের মধ্য হইতে এমন একটা-কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার এবং পাঠকবর্গ অন্ধকারে ছিলেন।

রাজসিংহের মধ্যে সে প্রকাবের অপরূপ রহস্য অবশ্যই কিছু আছে, তাহার সন্ধানের ভার আমি বিজ্ঞ সমালোচকদের উপর রাখিয়া দিলাম। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি আমার হৃদয়ে যে সাহিত্যরসপিপাসা আছে এ গ্রন্থ পাঠে তাহার কতটা পরিতৃপ্তি হইল।"[১০]

"রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে।"

"প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া কবিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম-প্রথম খটকা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়োই বেশি তাড়াতাড়ি দেখিতেছি, কাহারো যেন মিষ্টমুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই।"

"বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি

১০. উপরে যে অংশগুলি উদ্ধৃত হল তা আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে নেই। রবীন্দ্রনাথ সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম দিকের অনেকটা অংশ পরে পরিত্যাগ করেন।

দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে। গ্রন্থপাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথা বলিতে হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাজসিংহ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বলেন, "এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসপ্রণয়নে কোনো লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" বঙ্কিমের স্পষ্ট অভিমত দুর্গেশনন্দিনী চন্দ্রশেখর বা সীতারাম নয়, রাজসিংহই তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন নি। কিছু কিছু মন্তব্য করে গেছেন মাত্র, কিন্তু রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে সার্থক কি না সে-বিচার রবীন্দ্রনাথ তেমন স্পষ্টভাবে করেন নি বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ; উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা।" কিংবা,

"ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।" অথবা,

"এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনা-বহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে; কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত।" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ প্রবন্ধ রচনার প্রায় পাঁচ বছর পর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে ঐতিহাসিক উপন্যাস শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মুখপাত্র বা আদর্শ হিসাবে লেখক কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহকে গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছেন স্কটের লেখা আইভ্যান্‌হোকে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহকে তাঁর আলোচনার মুখ্য অবলম্বন কেন করলেন না সে-বিষয়ে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে।

আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে রাজসিংহ প্রবন্ধটি যেখানে 'সমাপ্ত' সাধনায় তার পরেও একটি অনুচ্ছেদ ছিল। সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"রাজসিংহ উপন্যাসখানি সম্বন্ধে মোট কথা আমার যাহা মনে উদয় হইয়াছে আমি তাহাই এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিলাম। হয়তো খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সমস্ত দোষগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা যাইতে পারিত। কিন্তু সেভাবে লেখা আরম্ভ করি নাই এবং সে নৈপুণ্যও আমার নাই, অতএব এইখানেই বিরত হইলাম।"

এই অংশ পাঠ করে স্পষ্টই মনে হয় রাজসিংহের দোষ এবং গুণ এই উভয় বিষয়েই কবির আরও কিছু কথা বলার ছিল। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে স্পষ্ট করে তাঁর সব কথা আলোচনা করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তখন জীবিত; তাঁর প্রণীত গ্রন্থের খোলাখুলি সমালোচনা করতে হয়তো রবীন্দ্রনাথ কিছুটা দ্বিধা বোধ করে থাকতে পারেন। হয়তো সেই কারণেই প্রবন্ধের সূত্রপাতটিও ছিল ভিন্ন ভঙ্গিতে – প্রচলিত সমালোচনার ভঙ্গি তা নয়। দোষগুণের আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করবার অবকাশ ছিল, হয়তো বা প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তা করেন নি। বলেছেন, 'সেভাবে লেখা আরম্ভ করি নাই'; তাই আমাদের এখানে মনে হয়, রাজসিংহ প্রবন্ধের প্রথমাংশ (সাধনা পত্রিকায় চার পৃষ্ঠা পরিমাণ), যা রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে পরিহার করেছেন, সেই অংশ মূল প্রবন্ধটির প্রকৃতি ও সমালোচকের বিশেষ মানসিকতা বোঝবার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।

১৩০০ বঙ্গাব্দ অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেন। লেখাটি প্রথমে ষ্টার থিয়েটার হলে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত এবং পরে সাধনার ১৩০১ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধটি যখন সংকলিত হয়, তখন মূল প্রবন্ধের বিপুলাংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে মূল প্রবন্ধের কিছু কিছু বর্জিত পাঠ সংকলিত হয়। রাজসিংহ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ দুটির সকল বর্জিত পাঠ আমার সংকলিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের (বিশ্বভারতী প্রকাশিত) পরিশেষে সংগৃহীত হয়েছে।

১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি লিখলেন, চোদ্দ বছর পর গ্রন্থে প্রকাশকালে তার অনেক অংশ বাদ যায়। গ্রন্থভুক্তি কালে মূল রচনার নানা অংশ নানান্ কারণে বাদ যেতে পারে। হয়তো গ্রন্থমধ্যে ভিন্ন প্রবন্ধে একটি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং একটি গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে

একই উপমার একাধিক ব্যবহার শ্রুতি সুখকর নয়, সুতরাং পরিহার করতে হয়। আবার কোথাও বা লেখকের মতেরও বদল ঘটে দীর্ঘকালের ব্যবধানে। সেখানে লেখক শুধু বর্জন করেন না, সংযোজনও করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে পরবর্তী কোনো সংযোজন নেই, শুধুই সংক্ষেপণ ঘটেছে। নিতান্ত প্রকাশনগত কারণেও কখনো কখনো রচনা কমাতে বাড়াতে হয়, ফর্মা সাজাতে সে প্রয়োজন দেখা দেয়—গ্রন্থজগতের মানুষ মাত্রেরই সে অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমাদের শুধু নিবেদন এই যে রবীন্দ্রনাথ যা বর্জন করলেন, আমাদের নিকট কিন্তু সর্বদা তা পরিহারযোগ্য নয়। বরং মূল রচনার দিকে তাকালে লেখকের রচনাকালীন মানসিকতার অধিকতর নিকটবর্তী হওয়া যায়। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক রচনাটি বিশেষ একটি উপলক্ষে রচিত, সে-কথাও বিস্মৃত হবার নয়। তাই এ প্রবন্ধে একই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে, অপরদিকে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নও করা হয়েছে।

আমাদের মনে আছে, সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে, ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজ ও ভারতবাসী প্রবন্ধের কথা। এই প্রবন্ধটি সাধনায় প্রকাশের পূর্বে চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয়, সভাপতি হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সভায় প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে একদিন সমস্ত লেখাটি বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখক পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন; সভাপতি হবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি একবার দেখে নিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই স্মরণ করে তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, "অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্বে যে-সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহাব বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোক প্রকাশ করিতে হইবে। কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ।··· সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার সভাস্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদর বাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব করিলে ভরসা করি সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন। কিন্তু সেই পুরস্কার যে তাঁহার হস্ত হইতে আমার

শেষ পুরস্কার হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। সেই সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্যপথযাত্রার মহামূল্য পাথেয়স্বরূপ আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল; তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ-জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।" এখানে রবীন্দ্রনাথ যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপেই ঐতিহাসিক; পরবর্তীকালে আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে এই অংশ পরিত্যক্ত হলেও আমাদের নিকট তা মূল্যহীন বা অনৈতিহাসিক হতে পারে না।

পত্রিকায় প্রবন্ধের সূচনা নিম্নরূপ—

"গত বর্ষ শেষ হইবার অনতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালের জন্য আমাদের মধ্য হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছেন।

যে-সকল রাজ্যে মহত্ত্ব বিরল নহে সেখানে কোনো যশস্বী লোকের অন্তর্ধান হইলে সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি, জীবনের কার্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসার ক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হন তখন এই জড়তাপন্ন দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগদুঃখে শোকাতুর। যদি সত্যই বঙ্গদেশের সেই বেদনাবোধ থাকিত তবে আজিকার এই চিরবিচ্ছেদের মধ্যেও সান্ত্বনার রশ্মি প্রকাশ পাইত।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব সম্পর্কে এবং বাংলা সংস্কৃতিতে বঙ্গদর্শনের ব্যাপক ও গভীর প্রভাবের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমপ্রতিভার যথার্থ বিকাশ, বস্তুতপক্ষে বঙ্গদর্শনই বঙ্কিমপ্রতিভার যথার্থ ভাণ্ডার। বঙ্গদর্শনের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত।" বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য 'কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা'র ন্যায় বহু ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হয়েছে। পূর্ববর্তীর সঙ্গে তুলনায় এ উন্নতির পরিমাণ কিরূপ তা নিরীক্ষণ করতে পারলেই, কবির মতে বঙ্কিমপ্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাবে।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম শুধু সৃষ্টির কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন না, সমালোচনার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে "রচনা এবং সমালোচনা

এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" মূল প্রবন্ধে এর পরেই রবীন্দ্রনাথ নয়টি অনুচ্ছেদে সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব বিস্তৃতভাবে জানান। পরবর্তীকালে এই অংশ আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই তিনি এর পাঠক। এই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের সমালোচক-মূর্তিটি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমের সমালোচনা, সমালোচ্য ব্যক্তির মনে তার প্রতিক্রিয়া, পাঠকের উপর সেই সমালোচনার প্রভাব ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আজকে প্রচলিত বঙ্কিম-রচনাবলীগুলিতে যে সমালোচনা-নিবন্ধগুলি পাই তাই কি তাঁর সব? বস্তুতপক্ষে একালে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচকসত্তার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে পরিচয়ের সুযোগ পান না। বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর সকল সমালোচনা গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত করেন নি, আবার অনেক সমালোচনা-নিবন্ধের অংশবিশেষ মাত্র পুনর্মুদ্রিত করেছেন—বিপুলাংশ পরিত্যাগ করেছেন।[১১] রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ সুযোগ ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ সমালোচকমূর্তিটির সঙ্গে পরিচিত হবার। তাই তিনি বঙ্গদর্শনের সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করলে স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"সাহিত্যের পক্ষে যাহা-কিছু অযোগ্য, যাহা-কিছু অনাবশ্যক, যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জনা করিতেন না। এই সমস্ত স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সুতীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইত; অনেক সময় মনে হইত এই-সকল ক্ষণজীবীদের প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। বিশেষত তখনও বাংলা লেখার শৈশব-অভ্যাসগুলি দূর হয় নাই, লেখকেরা তখনও বঙ্কিমের নূতন

১১. দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখক কর্তৃক সম্পাদিত—বঙ্কিমচন্দ্র কৃত সাহিত্য-সমালোচনা: দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ।

রাজত্বের কঠিন নিয়মসকল ভালো করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে-অবস্থায় সহজেই অনেক ত্রুটি মার্জনা করিয়া দোষকে কম করিয়া দেখিয়া এবং গুণকে বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণত উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের রাজদণ্ড সেরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই। তিনি নির্দয়ভাবে ঠিক বাছিতে গিয়া গাঁ উজাড় করিবার জো করিয়াছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা—উচ্চ লক্ষ্য, অটল সংকল্প এবং মহৎ পৌরুষের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহার প্রবল অনুরাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলেন। যাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠিন।"

বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা সমালোচনার অবস্থার চিত্র রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন। কবি তাঁর প্রবন্ধে এক স্থানে বঙ্কিমের সমালোচনার সঙ্গে পরবর্তীকালের সমালোচনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অধিকার সর্বাধিক। বাংলা সমালোচনা মুখ্যত সাময়িকপত্র-নির্ভর। সাময়িকসাহিত্যের সমালোচনা সাময়িকপত্রেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। বঙ্কিম যেমন বঙ্গদর্শনে সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা করেছিলেন, সাধনার পাতায় রবীন্দ্রনাথকেও সেই পথ অনুসরণ করতে দেখি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সমালোচনার সঙ্গে পরবর্তীকালের সমালোচনার তুলনা করেছেন। এর অর্থ একরকম এই দাঁড়ায়—বঙ্গদর্শন-কালের সঙ্গে সাধনা-সমকালের তুলনা। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব ১২৭৯ বঙ্গাব্দে। প্রথম চার বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক, পরে সঞ্জীবচন্দ্রের নাম সম্পাদকরূপে থাকলেও মূলত বঙ্কিমই পত্রিকা পরিচালনা করতেন।[১২] সঞ্জীব-সম্পাদিত শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮৯ চৈত্রে। এর প্রায় নয় বৎসরকাল পর সাধনা প্রকাশিত হয়।

সাধনা থেকে রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করি—

"বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সেদিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। সাহিত্যের প্রতি এখনকার সমালোচনার কোনো প্রভাব নাই। সাধারণে এখনকার সমালোচনা কেবল বিজ্ঞাপনস্তম্ভ সজ্জিত করিবার আয়োজন-স্বরূপে দেখে। যথার্থ রসবোধ এবং সূক্ষ্ম বিচার

১২. দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখক প্রণীত—বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন গ্রন্থ

প্রকাশ পায় এমন সমালোচনা বহুকাল দেখা যায় নাই। গ্রন্থসমালোচনার ভার অনেক সময়ে অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং অনেক কৃতবিদ্য লেখকও অত্যুক্তি কাল্পনিকতা এবং অবান্তর প্রসঙ্গে তাঁহাদের সমালোচনা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন; গ্রন্থের অন্তর্গত প্রকৃত সাহিত্যপদার্থকে প্রাধান্য না দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কোনো তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া পাঠকের চিত্তকে যথার্থ সাহিত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করেন। অন্য হিসাবে তাহাব গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য নাই। তাহাতে পাঠকদের মনে রসবোধ বা নির্বাচনশক্তির চর্চা হয় না।

সেইজন্য এখনকার সাহিত্যে বিস্তর স্বেচ্ছাচারিতা এবং ইতর ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখনকার কোনো রচনা কোনো যথার্থ শ্রদ্ধেয় সমালোচকের হস্তে কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় না—সকলেই স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্র জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মধ্যে সংযমের সৌন্দর্যের, শিষ্টতার এবং উচ্চ আদর্শের আবশ্যক কেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না, স্বাভাবিক বিচারশক্তির সহিত নিরপেক্ষভাবে দণ্ডপুরস্কার বিধান করিবার কেহই নাই, পত্রে এবং সংবাদপত্রে উৎসাহ অত্যন্ত মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়া থাকে এবং রাজকোষের শূন্য অবস্থায় কাগজের নোট যেরূপ অজস্র অথচ অনাদৃত হইয়া উঠে এই-সকল প্রাচুর্যবিশিষ্ট সমালোচনাও সাধারণের নিকট সেইরূপ প্রায় বিনামূল্যে বিক্রীত হয়।

এই বর্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। বিশেষত এ দোষের অংশ যখন আমাদিগের সকলকেই বহন করিয়া লইতে হইবে তখন ইহার মধ্যে নিজের সান্ত্বনা বা শ্লাঘার কারণ কিছুই দেখি না। কিন্তু এই অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্যসিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে সে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, বঙ্কিম যখন আমাদের সাহিত্যতরীর কর্ণধার হইয়াছিলেন তখন তরণী কেন এমন আশ্চর্যবেগে অগ্রসর হইয়াছিল, আর আজই বা কেন সে যথেচ্ছা ভাসিয়া যাইতেছে এবং নানা বাতাসে ঘুরিয়া মরিতেছে। আমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই, সে সাহস নাই, সে প্রতিভা নাই। আমরা যদি বা স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে কেহ কেহ কোনো কোনো বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, কিন্তু বর্তমানের গতিকে নিয়মিত করা, সমস্ত

সাহিত্যকে চালনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গদর্শন তখনকার সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের মর্মস্থলে শ্রীস্বরূপে বিরাজ করিতেছিল এখন সে স্থান শূন্য। সেইজন্য এখনকার সাহিত্যের বিশেষ কোনো আকারপ্রকার দেখা যায় না; তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু তাহার রূপ নাই, তাহার কোনো লক্ষণ নাই, আদর্শ নাই, বিবেকশক্তি নাই, তাহার পক্ষে সকল পথই সমান।"

বঙ্গদর্শন-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যজগতে যে 'অরাজকতার চিত্র' রবীন্দ্রনাথ এখানে অঙ্কিত করেছেন, সেই চিত্র কিছু-পরিমাণে তাঁর লিখিত পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করেছি। এ-প্রসঙ্গে সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে ১২৯৯ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙ্গলা লেখক শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকা হাতে নিয়ে বাংলা সাহিত্যকে এই অরাজকতার কবল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনে সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যেমন কঠোর তেমনই কঠিন। সমালোচকের কঠিনতম মূর্তি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন; সেই মূর্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-ভক্তি-আকর্ষণ স্বাভাবিক-ভাবেই গড়ে উঠেছিল। সাধনা হাতে নিয়ে বঙ্কিমের আদর্শ অনুসরণে আগ্রহ স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মনে জন্মেছিল। সাধনার প্রথম সংখ্যাটি সবে বেরিয়েছে, কবি বলছেন—"সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েছে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েছে।" এ প্রসঙ্গ আমরা ইতিপূর্বে ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সাধনা আমার হাতের কুঠারের মত'। মনে হয় এই কুঠার সাধনার রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করেন ১৬ বৈশাখ ১৩০১, ২৮ এপ্রিল ১৮৯৪ তারিখে। সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই স্মৃতিসভায় প্রথমে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল নবীনচন্দ্র সেনকে। কিন্তু তিনি সভাপতি হতে সম্মত হন নি।

আমার জীবন গ্রন্থের পঞ্চম ভাগে নবীনচন্দ্র এ-বিষয়ে যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করি।

"সভা-শ্রাদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে এখন ইংরাজের অনুকরণে 'শোক-সভা' পর্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর জন্য 'শোক-সভা' হইবে, রবিবাবু শোক-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভাপতিত্ব করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম।

আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায় আমি হিন্দু তাহা বুঝি না। সভা করিয়া শোক! যাহা হউক শোক-সভা হইল, রবিবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন, শুনিলাম অমনি শ্রোতৃমণ্ডলী চারি দিক হইতে বলিতে লাগিল—রবি ঠাকুর। একটা গান কর। শোকের এ বিচিত্র পরিণতি দেখিয়া সভাপতি মাননীয় গুরুদাসবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন যে, রবিবাবুর গলা আজ ভাল নাই, তিনি গাইতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি 'শোকসভা' সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া রবিবাবুর 'সাধনা'তে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বোধ হয় উহা শোকসভার শোকান্ত পরিণতির পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল।···আমাদের শোক বড় নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাসার জিনিস করা আমি মহাপাতক মনে করি।"

নিত্যকৃষ্ণ বসুর সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায়। ১৩১০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ১৩০১এর ১৬ বৈশাখ তারিখের লেখা যে ডায়রি মুদ্রিত হয়েছে, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই শোকসভার বিবরণ আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হিসাবে ডায়রির এই অংশ সংগ্রহযোগ্য।

"১৬ই বৈশাখ। ৯-৩০ গাড়িতে যাত্রা করিয়া আজ প্রায় ১১টার সময় কলিকাতায় আসিলাম। চৈতন্য-লাইব্রেরি কর্তৃক আহূত বঙ্কিমচন্দ্রের শোক-সভায় যোগ দিবার জন্য বৈকালে ষ্টার থিয়েটার গৃহে উপস্থিত হইলাম। সভাস্থলে উপস্থিত হইতে আমার প্রায় ৫-৩০ বাজিয়া গেল। তখন রজনীবাবুর বক্তৃতা শেষ হইয়া রবীন্দ্রবাবুর রচনা-পাঠ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে নিতান্ত স্থানাভাব। সুতরাং বাহিরে কখনও বেঞ্চের উপর বসিয়া, কখনও দুই একজন বন্ধুর সহিত গল্প করিয়া, কখনও বা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু-আধটু শুনিবার চেষ্টা করিয়া, সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে অক্ষয়বাবু আসিলেন। তিনি ভিতরে না যাইয়া ছাড়িলেন না। গ্যালারীর সর্বশেষ বেঞ্চের উপর কষ্টে সৃষ্টে একটুকু আসন করিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রায় এক ঘণ্টা কাল চলিল। আমি বক্তৃতা শুনি নাই, সুতরাং সে-বিষয়ে আজ কিছুই লিখতে পারিলাম না। সু-চন্দ্র হস্তলিপিখানা লইয়া আসিয়াছেন। আর 'সাধনা'তেও ছাপা হইতেছে। পরে পাঠ করিয়া তাহার আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিবার কায়দা আছে। সুরটি বেশ মিষ্ট। তার উপর আবার সুন্দর চেহারার সম্মিলন। ইহাতে যে অনেকটা কাজ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।"

সাহিত্য পত্রিকার ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বৈশাখের সাধনা সমালোচনা করতে গিয়ে লিখছে, "এবারকার সাধনায় সর্বপ্রধান প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্কিমচন্দ্র'। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রবাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু, বাঙ্গলা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্তির উজ্জল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্রবাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।"

ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্রের উদ্ধৃতির মধ্যে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের সাধনাতে শোকসভা সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখন আমরা সেই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারি। বৈশাখে (১৩০১) 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রকাশিত হবার পরের সংখ্যাতেই (জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখলেন, নাম শোকসভা। নবীনচন্দ্রের আত্যন্তিক স্বাদেশিকতা এবং অতিমাত্র হিন্দুত্বকে রবীন্দ্রনাথ সহজ সরলতাজ্ঞানে উপেক্ষা করতে পারলেন না; শোকসভা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন, "যেমন আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পিতৃহীন ব্যক্তির পিতৃশোক ব্যক্ত করা প্রকাশ্য কর্তব্যস্বরূপে গণ্য হয় তেমনি পাব্লিকের হিতৈষী কোনো মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন একটা সামাজিক-কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।" কবির মতে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট থেকে আমরা বহু জিনিস গ্রহণ করেছি এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যথার্থও হয়েছে। শোকসভা অনুষ্ঠান তার অন্যতম। পাশ্চাত্য বলেই যে তা বর্জনীয় হতে হবে এ কথার কোনো মূল্য নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্ধানের দেড় মাস পরেই মৃত্যু হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১)। তাঁর মৃত্যুর পরের মাসে, অর্থাৎ আষাঢ়ে, রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত বিহারীলালের দুটি কাব্য বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল কাব্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাহিত্য সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত 'বৃত্রসংহার' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমি বলেছি—রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সমালোচনা-প্রবন্ধ বিহারীলাল যে বঙ্কিম-কৃত

বৃত্রসংহার সমালোচনার রীতিপদ্ধতি অনুসরণেই রচিত—এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। যিনিই দুটি প্রবন্ধ একসঙ্গে মিলিয়ে পড়বেন তিনিই এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন। বঙ্কিমের পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশের পর কখনো পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি।

ওই ভূমিকায় আরও বলতে চেষ্টা করেছি যে, যদিও রবীন্দ্রনাথের রচনাটির নাম বিহারীলাল, কিন্তু মূলত এটি বিহারীলালের বিশেষ কাব্যগ্রন্থের আলোচনার প্রেরণাতেই রচিত। বিষয়ের দিক থেকে সমালোচনাটির শিরোনাম সারদামঙ্গল বা বঙ্গসুন্দরী হলেও ক্ষতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বিহারীলাল প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে; আর বিহারীলাল প্রবন্ধটি রচনার দু-মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন—বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সেদিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না—ইত্যাদি। ১৩০১ বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ এ-কথা বললেন, ১৩০১ আষাঢ়ে সাহিত্য সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তির দিকে তাকিয়ে তিনি যে সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করলেন তার নাম বিহারীলাল।

সাধনার তৃতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যাটি যুগ্ম সংখ্যা (১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক)। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—মেয়েলি ছড়া, স্বর্গীয় প্রহসন এবং ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ুপ্রবাহ। স্বর্গীয় প্রহসনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ুপ্রবাহ বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ বাল্যকালাবধি। সাধনায় মাঝে-মধ্যেই দেখা যায় কবি বিজ্ঞানের কথা বলেছেন।

সাধনার তৃতীয় বর্ষের এই শেষ সংখ্যাটির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ মেয়েলি ছড়া। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরিতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠ করেছিলেন। ছড়ার জগতে সহজ স্বাভাবিক কাব্যরসটি কবিকে সবিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। 'মেঘরাজ্যের মত' ছড়ারও যে-একটি 'স্বতন্ত্র রাজ্য' আছে, সে বিষয়ে বাঙালী ইতিপূর্বে তেমন অবহিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে সেই রাজ্যে প্রবেশ করে আনন্দ পেয়েছিলেন, আর পাঠককেও সেই রাজ্যে প্রবেশ-পথের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও নির্দেশে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধনার পাতায় রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী হয়ে এ-কাজে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন। তাঁর মেয়েলি

ব্রত শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ সাধনার চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ মেয়েলি ব্রত বই আকারে বেরোয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে।

মেয়েলি ব্রত পুস্তকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া[১৩] এবং মেয়েলি ব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন. সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।...

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই, পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানিতেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গ রূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোনপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরদের কোমল-হৃদয়-পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"[১৪]

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ছড়ার প্রভাব কম নয়। বিশেষত তাঁর কাব্য-কবিতায় ছড়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাধনায় প্রকাশিত তাঁর কোনো কোনো কবিতার মধ্যেও ছড়ার কিছু কিছু প্রভাব যে আছে তা আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক স্থানে আলোচনা করেছি।

১৩. রবীন্দ্রনাথ রচিত 'মেয়েলি ছড়া' (১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক) প্রবন্ধটি তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে মুদ্রিত হয়।

১৪. দ্রষ্টব্য, সুধীরচন্দ্র কর—প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ, মাসিক বসুমতী ১৩৫৮ জ্যৈষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায় চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার চতুর্থ বর্ষ

চতুর্থ বর্ষে সাধনার মোট দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পূর্বে তিন বৎসরে প্রতি বৎসরই একটি সংখ্যা দুই মাস একত্রিত হয়ে যুগ্ম সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বর্ষে (১২৯৯) ভাদ্র-আশ্বিন, দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০০) আশ্বিন-কার্তিক, তৃতীয় বর্ষে (১৩০১) আশ্বিন-কার্তিক—এই সংখ্যাগুলি ছিল যুগ্ম সংখ্যা। সাধনার শেষ বর্ষের (১৩০২) শেষ সংখ্যাটি তিনটি মাসের একত্র সমাহার। এই শেষ সংখ্যাটি আড়াই শত পৃষ্ঠার (২৯৯-৫৫৪ পৃষ্ঠা) একখানি বিপুলায়তন সাহিত্য-সম্ভাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাই হোক, হিসাবের দিক থেকে মোট দশটি সংখ্যা এই বৎসর প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই (১৩০১ অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথের চারটি গদ্য-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে প্রথমটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। শিরোনাম সুবিচারের অধিকার।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি বিশেষ একটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে রচিত। বোম্বাইয়ের সেতারা জেলায় বাই নামক নগরে এই সময় তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর জেল হয়েছিল। এই বিচার যে কতখানি অন্যায় ও অবিচারের পরিণতি, রবীন্দ্রনাথ সে কথাই এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। ইতিপূর্বে কবি দেখেছেন গোরক্ষা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিদ্বেষ ঘটানোর ব্যাপারে কিরূপ কর্মতৎপর হয়েছিল। এবারেও রবীন্দ্রনাথ সেই একই কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করলেন। সেতারা জেলার বাই নগরের অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো বিরোধ ছিল না। পরিবর্তে সহজ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল পরস্পরের মধ্যে। সুস্থ জীবনের মধ্যে কিভাবে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণের ব্যবস্থা চলেছে—রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করলেন বার বার। হিন্দুদের একটি পূজা উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সেখানকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট একটি আদেশ দেন। হিন্দুরা সেই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে পারে নি। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কারণেই সেখানকার তেরো জন হিন্দুকে জেল দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের

মনে গভীর সংশয় জাগায়। তিনি বর্তমান প্রবন্ধে ইংরেজের হীন ও জঘন্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে দিতে চান।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্য পথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা [ইংরেজ সরকার] উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।...যেখানে কোনো-কালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্যপক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।"

এই প্রবন্ধ লেখবার উদ্দেশ্য কি, তা লেখক প্রবন্ধের মধ্যেই একস্থানে স্পষ্ট করে বলেছেন। "গবর্ণমেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।"

স্মরণীয়, এইটিই সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের শেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ। অতঃপর বাকি ন'টি সংখ্যায় তাঁর আর কোনো রাজনৈতিক প্রবন্ধ দেখতে পাই না।

১৩০১ মাঘ সংখ্যায় আবদারের আইন শিরোনামে যে রাজনীতি-বিষয়ক রচনাটি প্রকাশিত হয় সেটি কি রবীন্দ্রনাথের? এই প্রশ্নের কারণ, (ক) সাধনার চতুর্থ বর্ষে লেখকদের নাম পত্রিকার মধ্যে পাওয়া যায় না, (খ) আবদারের আইন রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীভুক্তও নয়, (গ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র-জীবনীর প্রথম খণ্ডে এটি রবীন্দ্রনাথ রচিত বলে মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণে ৪১৬ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকায় আছে, "আবদারের আইন, সাধনা, মাঘ ১৩০১। প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।" বর্তমানে বিশ্বভারতীর সাধারণ গ্রন্থাগারে সাধনার সেট নেই। এই সেট এখন শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত। রবীন্দ্রভবনে সাধনার একাধিক সেট আছে। প্রতি বছরের সাধনা দুই খণ্ডে (ছয় মাসে এক খণ্ড) বাঁধানো। কোনো কোনো খণ্ডের

চার পাঁচটি কপিও আছে। আবদারের আইন যে খণ্ডে আছে সেই খণ্ডের দুটি কপি আছে রবীন্দ্রভবনে। সেই দুটি কপির একটিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা-গুলির শিরোনামের পাশে লাল পেন্সিলের √—দাগ দেওয়া আছে। হয়তো এই দাগগুলিই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, যা রবীন্দ্রজীবনীকার তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সাধনার যে 'কপি'টির কথা উল্লেখ করেছেন, এটি যদি সেই বিশেষ কপি-ই হয়, তবে আবদারের আইন যে রবীন্দ্রনাথের রচনা—সে বিষয়ে সংশয় থাকে না; কারণ এই প্রবন্ধের মাথাতেও লাল পেন্সিলের চিহ্ন আছে। কিন্তু সংশয় দেখা দিয়েছে অন্যত্র। এই খণ্ডে এমন একটি অ-স্বাক্ষরিত রচনা আছে, যেটি অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত না-হওয়া সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পেরেছি যে সেটি রবীন্দ্রনাথ লিখিত; কিন্তু আলোচ্য সাধনার কপিতে সেই রচনার শিরোদেশে লাল পেন্সিলের চিহ্ন নেই। আমরা এখানে ১৩০১ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত, 'দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব' শীর্ষক গ্রন্থের সমালোচনার কথা উল্লেখ করছি। এই সমালোচনা যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত তা সমকালীন ছিন্নপত্রাবলীর একটি পত্রের (পত্র ১৯০) মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। হয়তো এমন হতে পারে, পরবর্তীকালে নির্দেশ করবার সময় এই রচনাটির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন কবি।

যাই হোক, আমাদের লক্ষ্য ছিল আবদারের আইন প্রবন্ধটির দিকে। বর্তমানে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে না পাওয়ায় আমরা আপাতত উক্ত নিবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনা বলে তেমন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারছি না।[১]

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে পঞ্চভূতের আটটি রচনা প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বর্ষে পঞ্চভূতের কোনো লেখা নেই। চতুর্থ বর্ষে আবার পঞ্চভূত লেখা শুরু হয়। এবারেও প্রকাশিত হয় মোট আটটি রচনা।

সাধনার রচনা	গ্রন্থভুক্ত নাম	প্রকাশকাল
কাব্যের তাৎপর্য √ (পাঞ্চভৌতিক সভায় আলোচিত)	কাব্যের তাৎপর্য	১৩০১ অগ্রহায়ণ
কৌতুকহাস্য √ (পাঞ্চভৌতিক সভা)	কৌতুকহাস্য	পৌষ

১. এই প্রসঙ্গে সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত কঙ্কাবতীর সমালোচনাটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য দ্রষ্টব্য।

সাধনার রচনা	গ্রন্থভুক্ত নাম	প্রকাশকাল
সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ	সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ	১৩০১ মাঘ
কৌতুকহাস্যের মাত্রা	কৌতুকহাস্যের মাত্রা	ফাল্গুন
সরলতা	সরলতা	চৈত্র
অপূর্ব রামায়ণ / (পাঞ্চভৌতিক সভা)	অপূর্ব রামায়ণ	১৩০২ আষাঢ়
ভদ্রতার আদর্শ / (পাঞ্চভৌতিক সভা)	ভদ্রতার আদর্শ	শ্রাবণ
বৈজ্ঞানিক কৌতূহল / (পাঞ্চভৌতিক সভা)	বৈজ্ঞানিক কৌতূহল	ভাদ্র-কার্তিক

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চভূতের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সেখানে দেখিয়েছি পঞ্চভূতের বিভিন্ন রচনার উপর পারিবারিক-স্মৃতিলিপির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এ-প্রসঙ্গে এই পর্বের শেষ রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রবন্ধে আছে—

"এমন সময়ে স্রোতস্বিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া সমীরকে কহিল, সেদিন দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি বইখানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে, সেটার কি দশা হইয়াছে জান ?

সমীর কহিল, না।

স্রোতস্বিনী কহিল, রাত্রে ইঁদুরে তাহা কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া পিয়ানোর তারের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছে। এরূপ অনাবশ্যক ক্ষতি করিবার ত কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সমীর কহিল, উক্ত ইঁদুরটি বোধ করি ইঁদুরবংশে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বহির সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারিয়াছে।…"

এখন পারিবারিক-স্মৃতিলিপির অন্তর্গত ইঁদুর-রহস্য শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি—

"দিনকতক দেখা গেল সুরির[২] ছুটো একটা বাজনার বই খোওয়া

২. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যাইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল একটা ইন্দুর রাতারাতি উক্ত বইয়ের কাগজ কাটিয়া ছিন্নখণ্ডগুলি পিয়ানোর তারের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়া ইহার ত কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দুর জাতির স্বাভাবিক…মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায়। তাহারা যেরূপ নিজের ল্যাজের উপরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করে, তাহাদের যেরূপ উজ্জ্বল ক্ষুদ্র দৃষ্টি, যেরূপ তীক্ষ্ণ দন্ত,…যেরূপ আগ্রহপূর্ণ সন্ধানপর নাসিকা, যেরূপ উদ্বোখিত সতর্ক কর্ণযুগল, যেরূপ বিদ্যুৎ গতিতে চারিদিকে ধাবমান হইবার ক্ষমতা, সকল জিনিসেই যেরূপ ছিদ্র খনন করিবার তৎপরতা এবং যাহা পায় তাহারই টুক্‌রা যেরূপ নিভৃত গহ্বর—laboratoryর মধ্যে সঞ্চয় করিবার স্পৃহা, তাহাতে তাহাদের scientific training সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। বর্তমান প্রবন্ধের ইন্দুরের উল্লেখ করা যাইতেছে সে বোধ করি স্বভাব বৈজ্ঞানিক ইন্দুর বংশে একটি বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ইন্দুর। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বইয়ের সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিয়াছে।…" ইত্যাদি।

শুধু যে ইঁদুরের প্রসঙ্গ তা-ই নয়, 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' শব্দটিও এই রচনার মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। পারিবারিক-স্মৃতিলিপিতে যা ছিল সুরেন্দ্রনাথের পিয়ানো বাজানোর বই, পঞ্চভূতে সেই বই-ই দীপ্তির বলে নির্দেশিত হয়েছে।

সাধনা পত্রিকায় এক-একটি গ্রন্থকে অবলম্বন করে দীর্ঘ সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে তৃতীয় বর্ষে রাজসিংহ উপন্যাসের সমালোচনা উপলক্ষে। চতুর্থ বর্ষে অনেকগুলি গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থের নামেই মুখ্যত সমালোচনার শিরোনাম। গ্রন্থগুলি হল শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ফুলজানি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আর্যগাথা, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত যুগান্তর এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ।

উপরিউক্ত ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের সমালোচনা আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত, ষষ্ঠ গ্রন্থটির সমালোচনা কবি-সংগীত নাম গ্রহণ করে লোকসাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্তরত্নোদ্ধার গ্রন্থের সমালোচনার শেষে বলেছেন, "শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গুপ্তরত্নোদ্ধার নাম দিয়া এই যে কবিদলের

গান একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন সে জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীমাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। পদাবলী-সংগ্রহ 'পদরত্নাবলী' শ্রীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ (১২৯২)। এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্রের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত। শ্রীশচন্দ্রের ফুলজানি প্রথমে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ভারতী ও বালক পত্রে ১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দে। অতঃপর ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৩ মার্চ ১৮৯৪) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ সাধনায় লেখবার জন্য পত্রিকার সূচনাতেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং শ্রীশচন্দ্র বন্ধুর দাবি প্রত্যাখ্যান না করে প্রায় নিয়মিত সাধনায় লেখা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ফুলজানির সমালোচনা লেখেন তার পূর্বেই সাধনায় শ্রীশচন্দ্রের অপর উপন্যাস কৃতজ্ঞতা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে গেছে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনেও দেখা গেছে—বঙ্গদর্শনের কোনো নিয়মিত লেখকের প্রকাশিত বইয়েব সমালোচনা বঙ্গদর্শনেই হয়েছে তার সমালোচনা বিভাগের মধ্যেই।

রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্পাদক হয়ে সেই পত্রিকারই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু-লেখকের গ্রন্থ-সমালোচনা করলেও সমালোচকের সততা থেকে তিনি কিন্তু কখনই দূরে সরে যান নি। তাই দেখি শ্রীশচন্দ্রের রচনা যেখানে প্রশংসার যোগ্য সেখানে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন, আবার উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য কোনো কোনো ত্রুটির প্রতি তিনি পাঠকের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ফুলজানি উপন্যাসের প্রধান সৌন্দর্য কোথায়? "ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য।…এরূপ উপন্যাস সুপরিচিত স্থানের ন্যায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত বিরামদায়ক; এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই, মনকে কিছুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপে এক-একটা দুরূহ সমস্যা জাগ্রত হইয়া উঠে না, সৌন্দর্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে, তাহার জন্য কোনোরূপ কৃত্রিম মাল-মসলার আবশ্যক করে না।"

এই উপন্যাসের গঠনগত ত্রুটি সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রথমত এই ত্রুটির অন্যতম কারণ পাঠককে চমৎকৃত করার অতিরিক্ত প্রলোভন। "পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ; বাংলার লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে, কিন্তু তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষমতা

প্রকাশ করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিতে চাহেন এবং সেই কাজ করিতে গিয়া নিজের প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্মবিরোধ বাধাইয়া বসেন।" দ্বিতীয় ত্রুটিটি হলো কাহিনীর ঐক্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। এই জন্যই গ্রন্থের শেষভাগে আকস্মিকতার চমক বড় আকারে দেখা দিয়েছে। অধিকতর চমক-সৃষ্টির ব্যাকুলতায় গ্রন্থকার গ্রন্থশেষেও ক্ষান্ত না হয়ে "আবার শেষকে নিঃশেষ করিতে বসিলেন।" অকস্মাৎ সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা এসে বিচিত্র কাণ্ড বাধিয়ে তুললো। পাঠক এমন আকস্মিকতার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাকে হঠাৎ চমকে উঠতে হলো।

উপন্যাসের এই আকস্মিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনার শেষে যেন গ্রন্থকারের উদ্দেশেই প্রশ্ন করেছেন, "এ-সমস্ত কেন? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কী যোগ? প্রথম হইতে এমন কী-সকল অনিবার্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল?" এই প্রশ্নের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে কি তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না।

যে সংখ্যায় ফুলজানি উপন্যাস সমালোচিত হয় সেই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় আর্যগাথা পুস্তকের সমালোচনা। আর্যগাথা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সংগীত-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের আরও দুটি গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন ভিন্ন পত্রিকায়। শেষের গ্রন্থ দুটি (আষাঢ়ে এবং মন্দ্র) কবিতাপুস্তক কিন্তু আর্যগাথা হলো সংগীতের বই। তাই সমালোচনাতেও দেখি রবীন্দ্রনাথ রচনাগুলির কাব্যধর্ম অপেক্ষা সংগীতধর্মের উপরেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলা কবিতাই যে কেবল গীতিধর্মী—তা নয়; বাংলা ভাষায় রচিত গানও যে একান্তভাবে কাব্যধর্মী, সংগীত ও কাব্যের পরিপূর্ণ সমন্বয়েই যে গড়ে উঠেছে বাংলা গান, বর্তমান সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটিই বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন।

চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় সঞ্জীবচন্দ্র প্রণীত পালামৌ গ্রন্থের সমালোচনা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বের সংখ্যায় ফুলজানি গ্রন্থের সমালোচনায় গ্রন্থকার সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন।" আরও বলেছিলেন, গ্রন্থকার নিজের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করতে চান, এবং সে কাজ করতে গিয়ে নিজের প্রতিভার মধ্যে অনর্থক এক আত্মবিরোধ

বাধিয়ে বসেন। সঞ্জীবচন্দ্র এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লেখক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাঁতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজ দেখাইয়াছেন তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে-পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।"

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। এ-কথা রবীন্দ্রনাথের বুঝতে বিলম্ব হয় নি যে সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত একজন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র নিজে যথার্থ প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর রচনা কিন্তু সে-পরিমাণ সার্থকতা লাভ করে নি ; বাংলা সাহিত্য তাঁর নিকট থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হয়েছে।

এই কারণটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, "তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে ; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায় ; সে স্থলে অনেক জিনিস ফেলাছড়া যায়, অথচ অল্প জিনিসই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই ; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।"

রবীন্দ্রনাথের মতে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণের কাছে নয়, তাঁর প্রতিভার যথার্থ সমাদর মিলবে বিজ্ঞ ভাবুক পাঠকমণ্ডলীর নিকট।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে ?

সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ, সকল বিষয়কে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে গ্রহণের প্রবণতা, সহজ অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গী, স্বল্প বাক্যে চিত্র প্রত্যক্ষ করাবার ক্ষমতা, উপমা প্রয়োগে স্বাভাবিক কুশলতা ইত্যাদি গুণসামগ্রী সহজেই রবীন্দ্রনাথকে সঞ্জীব-রচনার অনুরাগী করে তোলে।

পর পর দুটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ দুই ভ্রাতার দুটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করলেন তাঁর সাধনায়। *১৩০১ পৌষে পালামৌ, আর মাঘ-ফাল্গুন দুই সংখ্যায় কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ

যখন এই সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র তখন পরলোকগত। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের একটি কপি বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন।[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-কর্তৃক উপহৃত বইখানির দীর্ঘ আলোচনা অতি সমাদর ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ করলেন সাধনার পৃষ্ঠায়।

কৃষ্ণচরিত্র শীর্ষক সমালোচনাটি লেখার নয় মাস পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন কালে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থখানিরও আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্র শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবেশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটি প্রসঙ্গে কি বলেছেন—প্রথমে তা দেখা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল বঙ্গদর্শনের সমালোচকরূপেই কঠোর ও কঠিন ছিলেন—তা নয়, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনাতেও তিনি ছিলেন রীতিমতো খড়্গধারী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে 'কৃষ্ণচরিত্রে' বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে-আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার-দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথককরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসংকোচে করিয়াছেন যে, এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।"

বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরও মন্তব্য—

"অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। 'কৃষ্ণচরিত্রে' উদ্দামভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসংবরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা

৩. দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের—অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের অন্তর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র।

লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লেখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।"

আমরা ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটির যখন আলোচনা করি তখন উল্লেখ করেছিলাম যে আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধ যখন সংকলিত হয়, তখন সাধনায় মুদ্রিত পাঠের অনেক অংশ কবিকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে এই অংশ বর্জিত), "বঙ্কিম গীতার উপদেশ অনুসারে কেবলমাত্র আপনার কর্ম করিয়া গিয়াছেন, ফললাভের প্রতি দৃকপাত করেন নাই। তিনি নিজে কৃষ্ণকে পরিপূর্ণ ভক্তি করিতেন অথচ কৃষ্ণভক্তদিগকে প্রসন্ন করিবার কোনো চেষ্টা করেন নাই, তিনি কৃষ্ণের দেবত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন অথচ বহু যত্নে বহু সাবধানে কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত অলৌকিক অংশ দূর করিয়া দিয়াছেন; আমাদের দেশেব লোকের যে অন্ধ-ভক্তি এবং নির্বিচার অতিবিশ্বাসের দিকে প্রবণতা আছে বঙ্কিম তাঁহার সমস্ত রচনায় কোথাও তাহার পোষণ বা সমর্থন করেন নাই, বরং প্রতি পদে তাহাকে আঘাত করিয়া গিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের শাস্ত্র থেকে ইতিহাস উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিমের পক্ষে গ্রহণ করাই সম্ভব ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম গ্রহণে ইউরোপীয়গণ সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হতে পারেনি। হিন্দুদের মধ্যেও কখনো পরিচয়ের অভাব, কখনো বা অতি পরিচয়ের কারণে সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। শাস্ত্রের মধ্য থেকে যথার্থ ইতিহাসটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যানের সময় বঙ্কিমকে 'দুই শত্রুর' মাঝখান দিয়ে পথ কেটে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কেউ অবতার মানেন না, তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি দেবত্ব আরোপের বিপক্ষে; কেউ শাস্ত্রগতপ্রাণ, শাস্ত্রের বিচার এবং সার ও অসার পৃথককরণে ঘোরতর বিরোধী। এরূপ অবস্থায় বঙ্কিম আপন প্রতিভাবলে বীরদর্পে অকুণ্ঠিতভাবে স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথেব মতে বঙ্কিম যা বিশ্বাস করেছেন তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—বাক্‌চাতুরীর দ্বারা তিনি নিজেকে বা অপরকে বঞ্চনা করেন নি।

১৩০১ বৈশাখে বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে এই সকল মত ব্যক্ত করেছিলেন। এবার কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থই তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয়। দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। বর্তমান প্রবন্ধে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের মূল ভাবটি সমালোচক

চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। সমালোচকের ভাষায়, "আমাদের মতে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক, স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে কৃষ্ণের চরিত্রকে উপলক্ষ করে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার করেছেন। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমই এই কার্যে সর্ব-প্রথম অগ্রসর হন। ঐতিহাসিকতা বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও বঙ্কিমের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। বিশেষতঃ বঙ্কিমের বিচারপদ্ধতিরই বিরোধিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তি, "বঙ্কিম মহাভারতের তিনটি স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম স্তরের রচনা উদার ও উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; দ্বিতীয় স্তরের রচনা অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং তৃতীয় স্তর বহু-কালের বহুবিধ লোকের যদৃচ্ছামত রচনা।" রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-কৃত এই স্তর-বিভাগের সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন তা লক্ষ্য করবার পূর্বে এই স্তরবিভাগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যটি গোড়ায় দেখা আবশ্যক।

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে মহাভারতের স্তরবিভাগ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্বিংশতি-সহস্রশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোনো কোনো অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পরমার্থিক দার্শনিক-তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, —তদ্বিষয়ে সৃষ্টিচাতুর্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি একজনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা।

বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক বা আদিম, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়াছে, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কালবিচ্যুতমাংস-পিণ্ডের ন্যায় বন্ধনশূন্য এবং প্রয়োজনশূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি।...ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া 'বেশ রচিয়াছি' মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে ...এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার এই অংশ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা এখন লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিম-কৃত মহাভারতের এই স্তরবিভাগ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, "কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিয়া স্তর নির্ণয় করা নিতান্তই আনুমানিক। রুচিভেদে কবিত্ব ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। আবার একই কবির রচনার একাংশ অপরাংশের সহিত কবিত্ব হিসাবে আকাশ-পাতাল তফাত হয় এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। অতএব ভাষার প্রভেদ ঐতিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়, কবিত্বের প্রভেদ নহে। মহাভারতের মধ্যে এই ভাষার অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা নির্ণয় করা এবং মূল মহাভারত নির্বাচন করা প্রভূত শ্রমসাধ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারপদ্ধতির সকল অংশ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে না পারলেও বাংলা ভাষায় হিন্দু শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিচারে বঙ্কিমই যে আমাদের প্রথম পথ দেখিয়েছেন একথা সমালোচক স্বীকার করেছেন।—

"সমুচিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত মহাভারতের সমূলক অংশ উদ্ধার

করা একজন লোকের জীবিতকালে সম্ভব কিনা সন্দেহ। অতএব মহাভারতের বিস্তীর্ণ গহন অরণ্যের মধ্যে বঙ্কিম যে এক সংকীর্ণ পথের সূচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, এবং অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমাদের কেবল বক্তব্য এই যে, তাঁহার কার্য পরিসমাপ্ত হয় নাই। বঙ্কিমের প্রতিভা আমাদিগকে যেখানে উপনীত করিয়াছেন সেইখানেই যে আমাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। তিনি আমাদিগকে অসন্তোষের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে; সচেষ্টভাবে সত্যের রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে। তিনি আমাদের হাতে মুক্তাটি দিয়া যান নাই, দৃষ্টান্ত সহকারে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যদি মুক্তা চাও তো সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। খুব সম্ভবত আমরা নমস্কার করিয়া বলিব, আমাদের মুক্তায় কাজ নাই, আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিব না।"

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হলো, কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা তখনই সম্ভবপর, যখন আমরা প্রমাণ ও বিচারপূর্বক সমগ্র মহাভারতের ইতিহাস-অংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হবো।

শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত যুগান্তর শীর্ষক উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হলো ১৩০১ চৈত্র সংখ্যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী সেকালের একজন বিশিষ্ট মনীষী, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজতুল্য এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। কিন্তু তাঁর রচিত উপন্যাসের সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ যখন করতে বসেন তখন পারিবারিক বন্ধুত্ব বা ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির দ্বারা সমালোচকের লেখনী প্রভাবিত হতে দেখি না। সম্পাদক-সমালোচক রূপে এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ কৃতিত্বের দিক। শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থে গুণের অভাব নেই, আবার দোষও দুর্লক্ষ্য নয়। যুগান্তর গ্রন্থে সমালোচক অনেক প্রশংসনীয় গুণ দেখতে পেয়েছেন, সমালোচনার প্রথমেই সে-বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, "এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।" কিন্তু এই উপন্যাসের মুখ্য ত্রুটি হলো, উপন্যাস নামক একটি আধারের মধ্যে প্রায় দুটি স্বতন্ত্র গল্পের একত্রিকরণ। সমালোচকের ভাষায়, "দুই স্বতন্ত্র গল্পকে জবরদস্তি করিয়া একত্র বাঁধিয়া দিলে একটা গল্পের হিসাবে তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়, দুইটা গল্পের হিসাবেও তাহাদিগকে আড়ষ্ট করিয়া বধ করা হয়। বর্তমান গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি দুটি গল্পকে বিচ্ছিন্ন আকারে রচনা করিতেন তাহা হইলে সম্ভবত দুটিকেই উৎকৃষ্ট

গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন।" এই দুই গল্পের মধ্যে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রথমটি অধিকতর উৎকৃষ্ট—এ-কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন।

সমালোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, "লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।" কঠিন কথা এমন সহজ সরল ও এমন রসমণ্ডিত করে বলা সহজ নয়।

সাধনার শেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখিত দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। একটি পঞ্চভূতের অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, অপরটি বিদ্যাসাগব চরিত। বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিদ্যাসাগর চরিত রবীন্দ্রনাথেব লেখা দীর্ঘ প্রবন্ধ। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা মনোভাবটি এই প্রবন্ধে প্রকাশিত। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও কৌতূহল একেবারে শিশুকাল থেকেই জন্মেছিল। শিশুকালে পাঠ্য বাংলা বইগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরের বই ছিল অন্যতম প্রধান। বালক বয়সে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাঠ করার সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ম্যাক্‌বেথের স্বকৃত অনুবাদ কবিতা। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুস্মরণ দিনে একটি স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার এমারেল্ড্‌ থিয়েটারে। উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লুপ্ত-রচনা : সাধনা পত্রিকা থেকে উদ্ধার

"যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যা কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি—আমার সরস্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে।"

ক. সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃষ্ঠা ৮৪-৯২

ভারতী। ১৫শ ভাগ। আশ্বিন ও কার্তিক। এবারকার ভারতীতে "লজ্জাবতী" নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এ রচনাটি ছোট গল্প লেখার আদর্শ বলিলেই হয়, দুটি একটি বাঙ্গালী অন্তঃপুর-বাসিনীর জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোনপ্রকার কাল্পনিক ভঙ্গী করিয়া বসান হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোন বাড়াবাড়ি নাই, রকম সকম নাই, রোমহর্ষণ ভাষাপ্রয়োগ নাই, অথচ পাঠ সমাপ্তিকালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে।

"বিলাপ" একটি গদ্যপ্রবন্ধ। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম, না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অমূলক প্রবন্ধ বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোন আবশ্যক দেখি না।

"লিটারেরি"। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি থাকে তেমনি সকল দলেরই পশ্চাতে কতকগুলি অনুবর্তী লোক থাকে তাহারা খাঁটি দলভুক্ত নহে অথচ ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া দলপতির সঙ্গে একত্রে তরিয়া যাইতে চাহে। এরূপ লোক সর্বত্রই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা সারস্বত-মণ্ডলীর ছায়াস্বরূপে থাকিয়া সাহিত্যের ভড়ং করিয়া থাকেন লেখক তাঁহাদিগকে লিটারেরি নাম দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলা

দেশে সেরূপ মণ্ডলীও নাই এবং তাঁহাদের ফিকা অনুকরণও নাই। লেখক যে বর্ণনা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা দেশের কোন বিশেষ দলের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। লেখা পড়িয়াই মনে হয় সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও সহিত লেখকের তর্ক হইয়া থাকিবে, এবং প্রতিপক্ষের নিকট হইতে এমন কোন রূঢ় উত্তর শুনিয়া থাকিবেন যে, "ওসকল তুমি বুঝিবে কি করিয়া!" সেই ক্ষোভে তাঁহার প্রতিপক্ষের একটি বিরূপ প্রতিমূর্তি আঁকিয়া অমনি কাগজে ছাপাইয়া বসিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায় তাঁহার এ রচনা যতই তীব্র এবং অসামান্য ব্যঙ্গরসপূর্ণ হউক না কেন ইহা ছাপায় প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। এরূপ লেখা সত্যও নহে, সুন্দরও নহে, এবং ইহাতে কাহারও কোন উপকার দেখি না।

"প্ল্যাঞ্চেট"। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত নামে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। প্ল্যাঞ্চেটে বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং একটি বালকের সহযোগে যে দুইটি ইংরাজি কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। বিশেষতঃ শেষ কবিতাটি কোন বাঙ্গালীর নিকট হইতে আশা করা যায় না।

"একাল ও একালের মেয়ে" যে লেখিকার রচনা আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এরূপ সরল পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ এবং চিত্রিতবৎ লেখা কয়জন লেখক লিখিতে পারেন? লেখিকা কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ। যে লোক চিরকাল পদব্রজে চলিত সে আজ সুবিধা সম্মুখে দেখিয়াই ট্রামে চড়িতেছে; পূর্বে যাহারা ঠন্ঠনের চটিও পরিত না আজ তাহারা বিলাতি জুতা মোজা পরিতেছে; জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পুরুষসমাজে যে আশ্চর্য পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছে তাহা কয়জন পূর্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন? কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বর্তমান কালোচিত পরিবর্তনের লেশমাত্র দেখিলেই এই নূতন ভাবের ভাবুক, এই নূতন বিদ্যালয়ের ছাত্র, এই নূতন পরিচ্ছদ পরিহিত নববিলাসী পরিহাস করেন, প্রহসন লেখেন এবং কেহ কেহ সীতা দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশা করেন সমাজের পুরুষার্ধ শিক্ষাকিরণে পাকিয়া রাঙা হইয়া উঠিবে এবং বাকি অর্ধেক সনাতন কচিভাব রক্ষা করিবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না, এক ফলে পৃথক নিয়ম খাটে না। অতএব ভালই বল আর মন্দই বল—পুরুষের অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীলোকের প্রাচীন ধর্ম—বর্তমান সহস্র

নূতনত্বের মধ্যে সেই প্রাচীন মনুকথিত ধর্ম অব্যাহত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। লেখিকা বর্তমান আতিথ্য সম্বন্ধে যে দু-এক কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্তিক। চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম। বহুকাল হইতে এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের জীবন-চরিত ও ধর্ম সম্বন্ধে লেখক একটি কথাও বাকি রাখিতেছেন না। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্বাচন করিয়া গেলে ভাল হইত। যাহা হউক লেখকের পরিশ্রম এবং বিপুল সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে সম্পাদককে বলিতে হয় এরূপ বিস্তারিত গ্রন্থ সাময়িক পত্রে প্রকাশের যোগ্য নহে।

"সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী" প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুকজনক।

"মহাতীর্থযাত্রা" লেখকের নরোয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বর্ণনাংশ বড় বেশি সংক্ষিপ্ত এবং লেখকের হৃদয়াবেগ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় "শকাব্দ" প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অব্দ বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে, এক সময়ে মধ্য এসিয়াবাসী এক জাতি (ইংরাজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ান্‌স্ বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গলা সাময়িকপত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অসংখ্য তর্কজালে জড়িত হইয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে এ লেখাটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না – আশ্চর্য এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য।

"আত্মসম্ভ্রম" প্রবন্ধ হইতে আমরা দুই এক জায়গা উদ্ধৃত করি। বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন—"তুমি যাহার কাপড় পরিয়া আরাম পাও, যাহার হার্মোনিয়ম বাজাইয়া পুলকিত হও, যাহার রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ দেখিয়া চমকিয়া যাও, যাহার পমেটাম ল্যাভেণ্ডার মাথায় দিয়া কৃতার্থ মনে কর, যাহার ফেটিঙে চড়িয়া স্বর্গসুখ লাভ কর, যাহার জাহাজ কামান তোমার দেবকীর্তি বোধ হয় তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না

থাকুক, তাহার গোলাম তোমাকে হইতেই হইবে।…ইংরাজের শিল্প সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অটল যে, তাহার এ দেশের অর্ধেক আধিপত্য রেল ও স্টীমার হইতে হইয়াছে; কারণ, সাধারণে এইগুলি সর্বদা দেখিয়া থাকে ও বিস্ময়জনক মনে করে, সুতরাং ইহাতেই নিজের নিজের বল, সাহস ও অভিমান হারায়।"

সা হি ত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন। এই সংখ্যায় "ফুলদানী" নামক একটি ছোট উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাংলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়—ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকদেব রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমন কি সামাজিক প্রথাব পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদেব কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষামাধুর্য অনুবাদে কখনই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়।

"শিক্ষিতা নারী" প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নারীদের অর্থোপার্জনশক্তির দৃষ্টান্ত-স্বরূপে মার্কিন স্ত্রীডাক্তার স্ত্রীঅ্যাটর্ণি এবং ইংরাজ স্ত্রীগ্রন্থকারদিগের আয়ের আলোচনা কবা নিষ্ফল। বড বড ধনের অঙ্ক দেখাইয়া আমাদিগকে মিথ্যা প্রলোভিত করা হয় মাত্র। জর্জ এলিয়ট্ তাঁহাব প্রথম গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন। যদি নাও পাইতেন তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হইত না। এমন দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে অনেক পুরুষ গ্রন্থকাব তাঁহাদের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ নিতান্ত যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, পুরুষেব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি—কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে স্ত্রী এবং জননী হইতেই হইবে। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্বত্র সেই শিক্ষায় বহুল পরিমাণে

বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননীকর্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রী-পুরুষের বর্তমান অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভ্য সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমতঃ, এককালে মানুষকে যাহা দায়ে পড়িয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা করিতে হইত, এখন তাহার অধিকাংশ বিনা বিপদ ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সভ্যতার একটি লক্ষণ এই, উত্তরোত্তর কর্তব্যের ভাগ। কুঁড়ি যত ফুটিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দল ততই স্বতন্ত্র হইয়া আসে। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে স্ত্রীলোকের কর্তব্যও বাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে পুরুষ হইতে পৃথক করিতে থাকিবে। অনেক পশু জন্মদান করিয়াই জননীকর্তব্য হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু মনুষ্যমাতা বহুকাল সন্তানভার ত্যাগ করিতে পারেন না। অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী। যত সভ্যতা বাড়িতে থাকে, যতই মানুষের সম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই 'মানুষ করা' কাজটা গুরুতর হইয়া উঠে। প্রথমে যাহা বিনা শিক্ষায় সম্পন্ন হইতে পারিত এখন তাহাতে বিশেষ শিক্ষাব আবশ্যক করে। অতএব মানুষ যতই উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে মাতার কর্তব্য ততই গৌরবজনক এবং শিক্ষাসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার পর যিনি জননী হইয়াছেন, জননীর স্নেহ, জননীর সেবাপরায়ণতা, জননীর শিক্ষা বিশেষ করিয়া লাভ করিয়াছেন তিনি কি সন্তানযোগ্য হইবামাত্র সেগুলি বাক্সয় তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার সেই সমস্ত শিক্ষা তাঁহার সেই কোমল প্রবৃত্তির নিয়ত চর্চা ব্যতীত তিনি কি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? এই জন্য তিনি স্বতঃই তাঁহার স্বামী ও পরিবারের জননীপদ গ্রহণ করেন - ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি। এবং তাঁহার কন্যাও সেই জননীর গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসন্তান হইলেও হৃদয়ের গুণে তাঁহার সন্তানের অভাব থাকে না। প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে - অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনা পাওনা, কেনা বেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্যতা লাভ করিতে চাহে

তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াৎ করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যবসা, বিজ্‌নেস্‌। এই জন্য কার্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশ স্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিঁকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারী আরম্ভ হইয়াছে সেকথা না উত্থাপন করাই ভাল, তাহাব ফলাফল এখনও পরীক্ষা হয় নাই।

তবে একথা সহস্রবার করিয়া বলিতে হইবে, মানুষকে "মানুষ করিয়া" তুলিতে শিক্ষার আবশ্যক। সেও যে কেবল সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে, রীতিমত শিক্ষা। অবশ্য মানুষকে কেরাণী করিয়া তুলিতে বেশি শিক্ষা চাই না, স্তনদানের পালা সাঙ্গ করিয়া পাঠশালায় ছাড়িয়া দিলেই চলে; দোকানদার করিতে হইলেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু আমরা সচরাচর মনে করি মানুষ হইয়া তেমন লাভ নাই, সুদে পোষায় না, যেমন তেমন করিয়া অফিসে প্রবেশ করিতে পারিলেই জীবনের কৃতার্থতা; অতএব মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তাহারা স্তনদান এবং রান্না বাড়্‌না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্তে দেবী উপাধী দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।

[সা হি ত্য] কার্তিক। কার্তিক মাসের সাহিত্যে "হিন্দুজাতির রসায়ন" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়ণিক যন্ত্রেব বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখকমহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙালীদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমতঃ একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়তঃ আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙালী তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণতঃ বাঙালী লেখকেরা নিজের জবানী কোন-কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া

থাকেন—হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্বেলিত করিয়া তোলেন। "আত্মজীবনচরিত" যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত সহৃদয়তা এবং নিরলঙ্কার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখকমহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাক্‌চাতুরী প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কি প্রভেদ!

সাধনা ১২৯৮ পৌষ পৃ ১৮২-১৮৮

ন ব্য ভা র ত। অগ্রহায়ণ। "হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার" নামক প্রবন্ধে লেখক প্রথমে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্মের নূতন আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর দেখাইয়াছেন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পুরাতন হিন্দু প্রথা সম্পূর্ণভাবে পুনঃ প্রচলিত হওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন "ভিন্ন দেশজাত দ্রব্যমাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিলাতি আলু, কোপি, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।" "সোডা লিমনেড্, বরফ প্রভৃতি প্রকাশ্যরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। এ সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।" তিনি বলেন শাস্ত্রে পলাণ্ডুভক্ষণ নিষেধ কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। "যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন।" "যজ্ঞউপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতঃ শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য করিয়া থাকে?" "ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে যাঁহারা চাকরি করেন তাঁহারা কি প্রকারে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?" লেখক বলেন, যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন, বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে ; ইহাতে করিয়া শাস্ত্রীয় বাক্য বেদবাক্যসকল স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে। অধিক কি, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহাদের কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত

হইতেছে। অতঃপর লেখক বহুতর শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্রাচীনকালেই বা ব্রাহ্মণের কিরূপ লক্ষণ ছিল এবং বর্তমানকালে তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় আছে। কেবল একটা কথা আমাদের নূতন ঠেকিল। বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে।

"ঋষি চিত্র" একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব প্রকাশ আর কোন বিদেশীর দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবিব রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশিরস্নাত পবিত্র নবীন উষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন বসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাঙ্গলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না, কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন গম্ভীর ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে।

নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের "হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত" খণ্ডশঃ বাহির হইতেছে। রমেশবাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশেব বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘবে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কি ছিল কি না ছিল, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্যকোন ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া রমেশবাবু এই যে প্রাচীন সমাজচিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাঙ্গলার আজন্ম পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কলিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের সখ অনুসাবে তাঁহারা প্রত্যেকেই দুই চারিটি মনের মত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁষিতে দেন না। মনে কর তাহার কোন একটি শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন রাত্রি, আমরা দেখিতেছি দিন। বঙ্গপণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন "আচ্ছা চোখ বুজিয়া দেখ দিন কি রাত্রি।" অমনি বিংশতি সহস্র চেলা চোখ বুজিবেন এবং মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিবেন "অহো কি আশ্চর্য! ঋষিবাক্যের কি মহিমা! গুরুদেবের কি তত্ত্বজ্ঞান! দিবালোকের লেশমাত্র দেখিতেছি না!" যে হতভাগ্য চোখ খুলিয়া থাকিবে, যদি তাহার

চোখ বন্ধ করিতে অক্ষম হন ত ধোপা নাপিত বন্ধ করিবেন, এবং দুই একজন মহাপ্রাজ্ঞ সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া তাহার চোখে ধূলা দিতে ছাড়িবেন না। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর এই স্বরচিত ভারতবর্ষ, সত্য হউক মিথ্যা হউক খুব যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষ তাহা নহে। বাঙ্গলা দেশের একখানি গ্রামকে অনেকখানি "আধ্যাত্মিক" গঙ্গাজলের সহিত মিশাল করিয়া একটি বৃহৎ ভারতবর্ষ রচনা করা হয়, সেখানেও কয়েক জন নিস্তেজ নির্বীর্য মানুষ অদৃষ্টের করধৃত নাসারজ্জু অনুসরণ করিয়া সাতিশয় কৃশ ও পবিত্রভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছে ; সমাজ অর্থে জাতি লইয়া দলাদলি, ধর্ম অর্থে সর্ববিষয়েই স্বাধীন বুদ্ধিকে বলিদান, কর্ম অর্থে কেবল ব্রতপালন এবং ব্রাহ্মণভোজন, বিদ্যা অর্থে পুরাণ মুখস্থ, এবং বুদ্ধি অর্থে সংহিতার শ্লোক লইয়া আবশ্যক অনুসারে ব্যাকবণের ইন্দ্রজাল দ্বারা আজ "না"-কে হাঁ কবা কাল "হাঁ"-কে না করাব ক্ষমতা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বঙ্গসমাজ প্রাচীন হিন্দুসমাজেব ন্যায় উন্নত ও সজীব নহে, অতএব বাঙ্গালীর কল্পনার দ্বাবা প্রাচীন ভারতের প্রতিমূর্তি নির্মাণ অসম্ভব—প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রীতিমত ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত আর গতি নাই। একজন চাষা বলিয়াছিল, আমি যদি রাণী রাসমণি হইতাম তবে দক্ষিণে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, বামে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, একবার ডান দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া খাইতাম একবার বাম দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া মুখে পুরিতাম। বলা বাহুল্য চিনির প্রাচুর্যে রাণী রাসমণির এতাধিক সন্তোষ ছিল না। রমেশবাবুও প্রমাণ পাইয়াছেন প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মণ্য ও সাত্ত্বিকতারই সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব ছিল না, মৃত্যুব যেরূপ একটা ভয়ানক নিশ্চল ভাব আছে তখনকার সমাজ-নিয়মের মধ্যে সেরূপ একটা অবিচল শ্বাসরোধী চাপ ছিল না, তখন বর্ণভেদ প্রথার মধ্যেও সজীব স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু চিনিকেই যে লোক সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাকে রাণী রাসমণির আহারের বৈচিত্র্য কে বুঝাইতে পারিবে? দুর্ভাগ্যক্রমে একটি মত বহুকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে, হিন্দুসমাজের পরিবর্তন হয় নাই। সেই কথা লইয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি যে আমাদের সমাজ এমনি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে সহস্র বৎসরে তাহার এক তিল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। জগতের কোথাও কিছুই থামিয়া নাই, হয় সংস্কার নয় বিকারের দিকে যাইতেছে ; যখন গঠন বন্ধ হয় তখনি ভাঙ্গন আরম্ভ হয় জীবনের এই নিয়ম। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুসমাজ থামিয়া

আছে। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতার পক্ষে সেই একটি প্রধান যুক্তি, এ সমাজ সাধারণ জগতের নিয়মে চলে না, এই ঋষিরচিত সমাজ বিশ্বামিত্ররচিত জগতের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু ইঁহারা একমুখে দুই কথা বলিয়া থাকেন। একবার বলেন হিন্দুসমাজ নির্বিকার নিশ্চল, আবার সময়ান্তরে পতিত ভারতেব জন্য বর্তমান অনাচারের জন্য কণ্ঠ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু পতিত ভারত বলিতে কি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিকার বুঝায় না? সেই হিন্দুধর্ম সেই হিন্দুসমাজ সবই যদি ঠিক থাকে তবে আমরা নূতনতর জীব কোথা হইতে আসিলাম?

"য়ুরোপীয় মহাদেশ" লেখাটি সন্তোষজনক নহে। কতকগুলা নোট্ এবং ইংরাজি, বাঙ্গলা, ফরাসী (ভুল বানানসমেত) একত্র মিশাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসংলগ্ন হইয়াছে। বাঙ্গলা লেখার মধ্যে অনেকখানি কবিয়া ইংরাজি এই পত্রের অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যায় এবং সকল সময়ে তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝা যায় না।

"বঙ্গবাসীর মৃত্যু" প্রবন্ধে লেখক বড় বেশি হাঁসফাঁস করিয়াছেন; লেখক যত সংযত ভাবে লিখিতেন লেখার বল তত বৃদ্ধি পাইত। হৃদয়ের উত্তাপ অতিমাত্রায় রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে তাহা বাষ্পের মত লঘু হইয়া যায়।

সা হি ত্য। অগ্রহায়ণ। বর্তমান সংখ্যক সাহিত্যে "আহার" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সমালোচনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

"প্রাকৃতিক নির্বাচনে" চন্দ্রশেখরবাবু ডারুয়িনের মতের কিয়দংশ সংক্ষেপে সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

"মুক্তি" একটি ছোট গল্প। কতকটা রূপকের মত। কিন্তু আমরা ইহার উপদেশ সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয়

করিতে চেষ্টা করি – কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না – এই জন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্ম-সুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া একাকী মুক্তি শিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে – যে বিশ্বকে ঈশ্বর ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যেদিন নিখিলকে আপনার ও আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকারহীনতার স্বাধীনতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

চীন পরিব্রাজক হিউ এন্থ সঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় "প্রাচীন ভারতবর্ষ" নামে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের একটি চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। নাম লইয়া তারিখ লইয়া কেবল তর্কবিতর্কের আবর্ত রচনা না করিয়া প্রাচীন কালের এক একটি চিত্র অঙ্কিত করিলে পাঠকদিগের বাস্তবিক উপকার হয়। গুপ্ত মহাশয় যদি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার প্রণালী তৎসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়া চিত্রবৎ পাঠকদের সম্মুখে ধরিতে পারেন তবে সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর হয়।

সাধনা ১২৯৮ মাঘ পৃ ২৮২-২৮৫

ন ব্য ভা র ত। পৌষ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংখ্যায় "হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস" প্রবন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। কথায় কথায় তুমুল তর্ক-বিতর্কের ঝড় না তুলিয়া এবং মাকড়সার জালের মত চতুর্দিকে ইংরাজি বাঙ্গলা নোটের দ্বারা মূল কথাটাকে আচ্ছন্ন ও লুপ্তপ্রায় না করিয়া তিনি প্রাচীন ইতিহাসকে ধারাবাহিক চিত্রের ন্যায় পাঠকের সম্মুখে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন এজন্য আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অজীর্ণ অন্নকে জীর্ণ অন্নের অপেক্ষা অধিক গুরুভার বলিয়া অনুভব হয়, সেই কারণে রমেশবাবুর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অনেক পাঠকের নিকট তেমন গুরুতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে না; তাঁহারা মনে করিবেন ইহাতে যথেষ্ট 'গবেষণা' প্রকাশ হয় নাই;

পড়িতে নিতান্ত সহজ হইয়াছে। বিপর্যয় পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহাসিক ব্যায়াম-নৈপুণ্য আমরা বিস্তর দেখিয়াছি, তর্কের ধূলায় অস্পষ্ট প্রাচীন জগৎ উত্তরোত্তর অস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে; রমেশবাবু নিজের পাণ্ডিত্য আড়ালে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়টিকেই যে প্রকাশমান করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। লতাগুল্মসমাকীর্ণ অন্ধকার অরণ্যপথ ছাড়িয়া সহসা যেন একেবারে রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছি।

সাহিত্য। পৌষ। পূর্ব মাস হইতে সাহিত্যে "রায় মহাশয়" নামক এক উপন্যাস বাহির হইতেছে। গল্পটি শেষ না হইলে কোন মত দেওয়া যায় না, এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভাষাটি পরিষ্কার এবং সরস, ও পল্লিগ্রামের জমিদারী সেরেস্তার বর্ণনা অতিশয় যথাযথরূপে চিত্রিত হইতেছে।

মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস "অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী" নামক প্রবন্ধে স্ত্রীজাতি, যে, "সকল দেশে ও সকল অবস্থাতেই একরূপ কোমলপ্রেমে ভূষিত, একরূপ সহিষ্ণুতায় মণ্ডিত ও একপ্রকার দৃঢ়তায় আবৃত" তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন "এ জগতে যদি তাহাদের সেই কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অপব্যবহার না হইত, তাহা হইলে, আজ আর নারীজাতির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে তর্ক বিতর্কের কিছুমাত্র আবশ্যক রহিত না।" এখনো কোন আবশ্যক দেখি না। যাহা সত্য তাহা স্বতঃই সত্য, তর্ক বিতর্কের সাহায্যবশতই সত্য নহে। নিকৃষ্টতা কখনই শ্রেষ্ঠতাকে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। অতএব শ্রেষ্ঠতা আপনিই প্রতিপন্ন হইবে। কেহ যদি বা মুখে তাহাকে অস্বীকার করে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ, কার্যে তাহার গৌরব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আজকাল কোন কোন নারীলেখক এই প্রমাণকার্যে এতই প্রাণপণে লাগিয়াছেন যে, মনে হয়, এবিষয়ে যেন তাঁহাদের নিজের মনে কথঞ্চিৎ সংশয় আছে। আমার বোধ হয় স্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন না হইয়া নিরভিমান ও সহজভাবে আত্মকর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠতা আছে; আজকাল নারীগণ সেই শ্রেষ্ঠতা হইতে বিচ্যুত হইবার আয়োজন করিতেছেন। আর একটি কথা আছে; যে রমণীগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদের এইটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যুগযুগান্তর হইতে যে কর্তব্যপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আজি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সে পথ ত্যাগ করিলে ক্রমশঃ কিরূপ অবস্থা ঘটিবে বলা কঠিন।

নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে; তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নহে।

বর্তমান সংখ্যায় সাহিত্যসম্পাদকমহাশয় সাধনার সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

সা হি ত্য ও বি জ্ঞা ন। কার্তিক। এই নামে নূতন মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "এটা কোন যুগ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখাটি বিশেষ কৌতুকাবহ। লেখক মনুসংহিতা, মহাভারত ও হরিবংশ হইতে দেখাইয়াছেন যে সত্যযুগ চারি সহস্র বৎসরে, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে, দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বৎসরে ও কলিযুগ এক সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। সর্বসমেত চারিযুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে কলিযুগ আরম্ভের পর ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মনুর মতে খৃষ্টজন্মের ১৯০০ বৎসর পূর্বেই কলিযুগ শেষ হইয়াছে। তবে এখন এটা কোন যুগ। কুল্লুক ভট্ট ও মেধাতিথি ইহার মীমাংসা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই সকল যুগবৎসর দৈব বৎসর, বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না দেখিয়া য়ুরোপের অনেক খৃষ্টান এইরূপ দৈব দিনের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৈব বৎসরের কথা লেখক পরিষ্কাররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। লেখক যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন তাহার কোন উত্তর দেন নাই। উত্তর দেওয়াও কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আজকাল হঠাৎ সত্যযুগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে; আর কোথাও না হউক বাঙলা দেশে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে কলির কুয়াশা ক্রমেই কাটিয়া উঠিতেছে এবং এক রাত্রির মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার নব নব কুশাঙ্কুর সূচির মত জাগিয়া উঠিয়া গত কলিযুগের বকেয়া পাপীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। অতএব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পূর্বাচলে নব সত্যযুগের অভ্যুদয় যে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন পৃ ৩৭১-৩৭৮

সা হি ত্য। মাঘ। —"লয়"। এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবু পরব্রহ্মে বিলীন হইবার কামনা ও সাধনাই যে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আক্ষেপ করিয়াছেন য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকতক কথা বলিবাব আছে। ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তারক্ষার বিরোধী। কারণ সে সাধনার নিকট কোথায় গৃহবন্ধন কোথায় সমাজবন্ধন, কোথায় জাতিবন্ধন! অতএব জাতীয়তা বিনাশচেষ্টাকেই যদি হিন্দুর জাতীয়তা বলা হয় তবে সে জাতীয়তা ধ্বংস করাই যে, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিদ্যাচর্চা সৌন্দর্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমি ছাড়া যতদিন আর কিছুকে দেখিতে পাইব অনুভব করিতে পারিব, ততদিন আমি মায়াবদ্ধ, যখন আমি ছাড়া আর কেহ নাই কিছু নাই, অতএব যখন আমিও নাই (কাবণ, অন্যের সহিত তুলনা করিয়াই আমির আমিত্ব) তখন সাধনার শেষ, মায়া-মোহের বিনাশ। এমন সর্বনাশিনী জাতীয়তা যদি হতভাগ্য হিন্দুর স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকে তবে সেটাকে প্রাণপণে বিলুপ্ত করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এই অসীম বৈরাগ্যতত্ত্ব আমাদের হিন্দুসমাজেব অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে একথা সত্য, তাহার ফল হইয়াছে আমাদের একুল ওকুল দুই গেছে। প্রত্যেকে এক একটি সোঽহং ব্রহ্ম হইতেও পারি নাই অথচ মনুষ্যত্ব একেবারে নির্জীব হইয়া আছে। মরণও হয় না, অথচ ষোল আনা বাঁচিয়াও নাই। প্রকৃতিনিহিত প্রীতিবৃত্তিকে দর্শনশাস্ত্রের বিরাট পাষাণ একেবারে পিষিয়া ফেলিতে পারে নাই অথচ তাহার কাজ করিবার বল ও উৎসাহ যথাসম্ভব অপহবণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মত সমস্ত বৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না। সেই জন্য আমাদের দেশে মুখে মুখে বৈরাগ্যের কথা প্রচলিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি, সংসারের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ চিরানন্দস্রোতে মনুষ্যত্বকে যথা-সাধ্য সতেজ ও সফল করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। বিরাট নিপীড়নে সেই প্রেমানন্দকে পরাহত করিতে পারে নাই বলিয়াই চৈতন্য আসিয়া যেমনি প্রেমের তান ধরিলেন অমনি "বিরাট" হিন্দুর "বিরাট" হৃদয়ের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমের স্রোত আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার কি সেই বিরাট পাষাণখানাকে তিল তিল করিয়া গড়াইয়া জগতের অনন্ত জীবন-উৎসের মুখদ্বারে তুলিয়া বিরাট হিন্দুর বিরাট জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে?

কিন্তু হে বিরাট বিরাগী সম্প্রদায়, এ স্রোত তোমাদের দর্শন-শাস্ত্রের সাধ্য নহে রুদ্ধ করা ; যদি বা কিছুকালের মত কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত থাকে আবার একদিন চতুর্গুণ বলে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া শাস্ত্রদগ্ধ শুষ্কশূন্য বিরাট বৈরাগ্য-মরুকে প্রাণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া কোমল করিয়া শ্যামল করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে। আজকাল আমরা যখন স্বজাতির গুণগরিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অন্যজাতিকে খাট করিয়া আপনাদিগকে বড় করিতে চেষ্টা করি। তাহার একটা উপায়, স্বদেশে যে মহোচ্চ আদর্শ কেবল শাস্ত্রেই আছে সাধারণের মধ্যে নাই তাহার সহিত অন্য-দেশেব সাধারণ প্রচলিত জীবনযাত্রার তুলনা করা। দুঃখের বিষয়, চন্দ্রনাথ বাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতে চান হিন্দুবা কেবল ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যই নিযুক্ত, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল আত্ম-সুখের জন্যই লালায়িত। তিনি একদিকে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্যদিকে য়ুরোপীয়দের কথায় বলিয়াছেন, "ক্ষুধায় অন্ন একমুঠা কম পাইলে, তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডুষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, বেশবিন্যাসে একটি আল্‌পিন্ কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া তোলে।"

চন্দ্রনাথবাবু যদি প্রণিধান করিয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশেও আদর্শেব সহিত আচরণের অনেক প্রভেদ। নির্গুণ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে ব্যবহারে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এত দেব এত দেবী এত কাষ্ঠ এত পাষাণ এত কাহিনী এত কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মের উচ্চ আদর্শ কোন্ দেশে আচ্ছন্ন করিয়াছে! আমাদের দেশের নরনারী-গণ কি প্রতিদিন মৃন্মূর্তির নিকট ধন পুত্র প্রভৃতি ঐহিক সুখসম্পত্তি প্রার্থনা করিতেছে না? মিথ্যা মকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য তাহারা দেবীকে কি বলির প্রলোভন দেখাইতেছে না? নিরপরাধী বিপক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য তাহারা কি দেবতাকে নিজপক্ষ অবলম্বন করিতে স্তুতি বাক্যে অনুরোধ করিতেছে না? তাহারা কি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও প্রতিযোগীর ধ্বংসের জন্য হোমযাগ করে না? রাগদ্বেষ হিংসা মিথ্যাব্যবহার এবং বিবিধ কলঙ্কমসি দ্বারা তাহারা কি আপনাদের দেবচরিত্র অঙ্কিত করে নাই? শাস্ত্রের

মধ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম এবং মন্দিরের মধ্যে বিকৃত কল্পনা এমন আর কোথায় আছে!

অতএব তুলনার স্থলে আমাদের দেশের আদর্শের সহিত য়ুরোপের আদর্শের তুলনাই ন্যায়সঙ্গত।

য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ আত্মসুখ নহে, বিশ্বসুখ। মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি সাধনই তাহার সাধনার বিষয়। জ্ঞান এবং প্রেম, "মাধুর্য এবং জ্যোতি" সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। তাহাদের কবি সেই গান গাহিতেছে, তাহাদের মহাপুরুষ ও মহানারীগণ সেই উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে জীবন বিসর্জন করিতেছে। আবার এদিকে সাধারণের মধ্যে আত্ম-সুখান্বেষণও বড় কম নহে; এদিকে পরের ধনে লোভ দিতে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইতে, পরের সুখ ছারখার করিতে ইহারা সকল সময়ে বিমুখ নহে। এবং একদিকে ইহারা হিংস্র বিদেশের মরুনির্বাসনে একাকী ধর্মপ্রচার করিতেও তুষার-কঠিন দুর্গম উত্তর মেরুর নিষ্ঠুর শীতের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না অন্যদিকে স্নানের পর বুরুশ না পাইলে এবং বেশবিন্যাসে আল্‌পিন্‌টি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে। মানুষ এমনি মিশ্রিত, এমনি অদ্ভুত অসম্পূর্ণ জীব।

সর্বশেষে পাঠকদিগকে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে আদর্শভাব উপরে উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিমবাবু তাঁহার ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন আমাদের হিন্দুধর্মেরও সেই আদর্শ—অর্থাৎ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন। চন্দ্রনাথবাবুর মতে হিন্দুধর্মের আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণ ধ্বংসসাধন। তিনি বলেন হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র প্রলয়। এখন হিন্দুগণ বঙ্কিমবাবুর মতে বাঁচিবেন কি চন্দ্রনাথবাবুর মতে মরিবেন সেই একটা সমস্যা উঠিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে একটা মত স্থির করিয়াছি। আমরা জীবনের প্রয়াসী, এবং ভরসা করি, লয় ব্যাপারটা যতই "বিরাট" হউক তাহার এখনো বিস্তর বিলম্ব আছে।

সাধনায় আমরা "শিক্ষিতা নারী" নামক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্তমান সংখ্যায় তাহার উত্তর বাহির হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম ভুল বুঝিয়াছিলাম। ভুল বুঝিবার কিঞ্চিৎ কারণ ছিল। তিনি আমেরিকার স্ত্রী-অ্যাটর্নি, স্ত্রী-বক্তা প্রভৃতি প্রবলা রমণীদের কথা এমনভাবে লিখিয়াছিলেন যাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তিনি উক্ত ধনোপার্জনকারিণীদিগকে প্রধানতঃ শিক্ষিতা নারীর আদর্শস্থলরূপে

খাড়া করিতে চাহেন। তাঁহার যদি এরূপ উদ্দেশ্য না থাকে তবে আমাদের সহিত তাঁহার মতান্তর দেখি না। কেবল এখনও তিনি "নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে পুরুষের স্বার্থপরতা বা উৎপীড়ন" এ অভিযোগ ছাড়েন নাই। লেখিকা ভাবিয়া দেখিবেন "মূল" বলিতে অনেকটা দূর বুঝায়। যদি আমরা বাঙ্গালীবা বলি ইংরাজের স্বার্থপরতাই বাঙ্গালীর জাতীয় অধীনতার মূল তাহা হইলে তাহাতে দুর্বল প্রকৃতির বিবেচনাশূন্য কাঁদুনি প্রকাশ পায় মাত্র। ইংরাজ আপন স্বার্থপর প্রবৃত্তি আমাদের উপর খাটাইতেই পারিত না যদি আমরা গোড়ায় দুর্বল না হইতাম। অতএব স্বার্থপরতাকে মূল না বলিয়া দুর্বলতাকেই মূল বলিয়া ধরা আবশ্যক। সকল প্রকার অধীনতারই মূলে দুর্বলতা। লেখিকা বলিতে পারেন যে, এই সুসভ্য উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক দুর্বলতাকে দুর্বলতা বলাই উচিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধিচর্চা এবং জ্ঞানোপার্জনও বলসাধ্য। দুই জন লোকের যদি সমান বুদ্ধি থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের শারীরিক বল অধিক থাকে তবে বলিষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধিসংগ্রামেও অন্যটিকে পরাভূত করিবে, শরীর ও মনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তবে যদি প্রমাণ হয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি তবে কথাটা স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক, প্রকৃতির পক্ষপাতের জন্য পুরুষকে অপরাধী করা উচিত হয় না। কারণ, পুরুষের পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারী আছে। যেখানে ক্ষমতা সেখানে প্রায়ই ন্যূনাধিক অত্যাচার আছেই। ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া চলা সর্বসাধারণের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না; সেই কারণে, রমণীর প্রতি পুরুষের উপদ্রবের অপরাধ পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপরে আবার একটা "ওরিজিনাল্ সিন্" একটা মূল পাপ পুরুষের স্কন্ধে চাপান নিতান্ত অন্যায়। সেটা পুরুষের নহে প্রকৃতির। রমণীর কাছে পুরুষেরা সহস্র প্রেমের অপরাধে চির অপরাধী সে জন্য তাঁহারা সুমধুর অভিমানে আমাদিগকে দণ্ডিত করেন, সে সকল আইন ঘরে ঘরে প্রচলিত; এমনকি তাহার দণ্ডবিধি বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল নারীরা পুরুষের নামে এ কি এক নূতন অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নীরস ও নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসনা করিতেছেন। এরূপ অশ্রুজলশূন্য শুষ্ক শাসনের জন্য আমরা কোন কালে প্রস্তুত ছিলাম না; এটা আমাদের কাছে নিতান্ত বে-আইনি রকম ঠেকিতেছে। রমণী সৌন্দর্যে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (কেবল শারীরিক সৌন্দর্যে নহে)। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে সৌন্দর্যবোধ অনেক

বিলম্বে পরিণতিলাভ করে। কিন্তু অনাদৃত সৌন্দর্যও প্রেমপরিপূর্ণ ধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে জানে; অন্ধবল তাহার সম্মুখে দম্ভ প্রকাশ করে বলিয়াই বলের প্রতি তাহার কোন ঈর্ষা নাই; সে সেই খেদে বলিষ্ঠ হইয়া বলকে অতিক্রম করিতে চায় না, সুন্দর হইয়া অতি ধীরে ধীরে জয়লাভ করে। যিশুখৃষ্ট যেরূপ মৃত্যুর দ্বারা অমর হইয়াছেন সৌন্দর্য সেইরূপ উৎপীড়িত হইয়াই জয়ী হয়। অধৈর্য হইবার আবশ্যক নাই; নারীর আদর কালক্রমে আপনি বাড়িবে, সেজন্য নারীদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে না; বরঞ্চ আরো অধিক সুন্দর হইতে হইবে। রাবণের ঘরে সীতা অপমানিতা, সেখানে কেবল পশুবল, সেখানে সীতা বন্দিনী। রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা; সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন, সেখানে সীতা স্বাধীনা। ধৈর্যকঠিন প্রেমকোমল সৌন্দর্যের অলক্ষ্য প্রভাবে মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে থাকিবে এবং সেই মনুষ্যত্ব বিকাশেব সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ পৌরুষ যখন পরিণত হইয়া উঠিবে, তখন এই উদারহৃদয় পৌরুষই অনাদরের হাত হইতে সৌন্দর্যকে উদ্ধার করিবে; এজন্য নারীদিগকে লড়াই করিতে হইবে না।

সমালোচ্য প্রবন্ধের দুই একটা বাঙ্গলা কথা আমাদের কানে নিরতিশয় বিলাতি রকম ঠেকিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, माननीয়া লেখিকা মার্জনা করিবেন। "কর্ষিত বিচারশক্তি" "মানসিক কর্ষণ" শব্দগুলা বাঙ্গলা নহে। একস্থানে আছে "সংসারে যে গুরুতর কর্তব্য তাহার উপর অর্পিত হয়, তজ্জন্য, সমভাবময় হৃদয়ের ন্যায়, কর্ষিত মস্তকেরও একান্ত আবশ্যক।" "সমভাবময় হৃদয়" কোন্ ইংরাজি শব্দের তর্জমা ঠাহর করিতে পারিলাম না সুতরাং উহার অর্থনির্ণয় করিতে অক্ষম হইলাম; "কর্ষিত মস্তক" কথাটার ইংরাজি মনে পড়িতেছে কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক।

"সোম" নামক প্রবন্ধে বৈদিক সোমরস যে সুরা অর্থেই ব্যবহৃত হইত না লেখক তাহাই প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। "সোম" বলিতে কি বুঝাইত ভবিষ্যৎ সংখ্যক সাহিত্যে তাহার আলোচনা হইবে লেখক আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

"রায় মহাশয়" গল্পে বাঙ্গলার জমিদারী শাসনের নিষ্ঠুর চিত্র বাহির হইতেছে। ক্ষমতাশালী লেখকের রচনা পড়িয়া সমস্তটা অত্যন্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আশাকরি ইহার মধ্যে কিছু কিছু অত্যুক্তি আছে।

সাধনা ১২৯৮ চৈত্র পৃ ৪৫৮-৪৬১

ন ব্য ভা র ত। মাঘ। "আলোক কি অন্ধকার?" সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় সে অন্ধকার দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কি করিলে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন সংঘটন হইতে পারিবে লেখক তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "হিন্দুধর্মের ন্যায় আর ধর্ম নাই, এমন কল্পবৃক্ষ আর জন্মিবে না—যাঁহার যে প্রকার ধ্যান ধারণার শক্তি তিনি সেই প্রকাবেই সাধনা করিতে পারেন, এমন ধর্ম আর কোথায়? ছিন্ন ভিন্ন ভাবতকে আবার যদি কেহ এক করিতে পারে, আবাব যদি কেহ ভারতকে উন্নত করিয়া তাহার শরীরে হিমমুকুট পরাইতে পারে, তবে সে সনাতন হিন্দু-ধর্ম।" লেখক মনে করিতেছেন কথাটা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং আজ হইতে তাঁহার পাঠকেরা কেবল কল্পবৃক্ষেব হাওয়া খাইয়া ভারতের "শরীরে হৈমমুকুট" পবাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হিন্দুধর্ম কি? তাহা কবে ভারতবর্ষে ছিল না? তাহা কবেই বা ভাবতবর্ষ হইতে চলিয়া গেল? তাহাকে আবাব কোথা হইতে আনিতে হইবে এবং কোন্ "অবতার" আনিবেন। যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি তদনুসাবেই সাধনা করিতে পারিবেন এমন বহুরূপী ধর্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোন্ খানে? এবং এই হিন্দুধর্মের প্রভাবে আদিম বৈদিক সময়ের পরে কোন্ কালে ভাবতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ছিল?

"সাঁওতালের শ্রাদ্ধ প্রণালী" লেখাটি কৌতূহলজনক।

"জাতীয় একতা" প্রবন্ধে লেখক কৌতুক করিতেছেন কি জ্ঞান দান করিতেছেন সহসা বুঝা দুঃসাধ্য; এই পর্যন্ত বলা যায় দুইটির মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই।

"দোকানদারী।" বঙ্গ সাহিত্যে এই ধরণের অশ্রু গদ গদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কোন উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্রে এরূপ গল্পপ্রবন্ধ কেন স্থান প্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।

সা হি ত্য। ফাল্গুন। "সোম।" এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বেদ হইতে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন বেদে সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম বুঝায়। সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম রূপকভাবে বুঝাইত, না তাহার প্রকৃত অর্থই এই, লেখক মহাশয় কোথাও তাহার আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না, সুরাপানের আনন্দের সহিত ঈশ্বর প্রেমানন্দের তুলনা

অন্যত্রও পাওয়া যায়, হাফেজের কবিতা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রামপ্রসাদের কোন গানেও তিনি সুরাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তান্ত্রিকেরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সুরাই সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখনো আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ মোচন হয় নাই।

"আহার।" শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন "আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।" এই ভাবের কথা আমরা অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত—কিন্তু এখানে ধর্ম বলিতে কি বুঝায়? যদি বল ধর্মের অর্থ কর্তব্যজ্ঞান, মানুষের পক্ষে যাহা ভাল তাহাই তাহার কর্তব্য, ধর্ম এই কথা বলে, তবে, জিজ্ঞাসা করি সে-কথা কোন্ দেশে অবিদিত! শরীর সুস্থ রাখা যে মানুষের কর্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় একথা কে না বলে! যদি বল, এস্থলে ধর্মের অর্থ পরলোকে দণ্ড পুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্য ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোন এক মহা জ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে "ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ"; মানিয়া লওয়া যাক্ উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরের স্বাস্থ্য-সাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্‌টুকু? ঐ পুরস্কারের প্রলোভনটুকু? কেবল ঐ মিথ্যা প্রলোভন সূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নহিলে, স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালন করা ভাল, এবং যাহা ভাল তাহাই কর্তব্য এ-কথা কোন্ দেশের লোক জানে না? আহারের সময় পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধি সাধন করে অতএব পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত একথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুল সমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে একথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব

নহে তাহাকে কি বলিয়া ধর্মনিয়মভুক্ত করা যায়? স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য অতএব তাহা ধর্ম এ মূলনীতির কোন কালে পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্তু কোন একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম, না করা অধর্ম এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

মানবনীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ * আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন. এক অংশকে ধর্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপবদিকে চঞ্চল শক্তির স্বাতন্ত্র্যই সমাজজীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত। তেমনি অটল ধর্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ-আকার ত্যাগ করে। এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোওয়া কোন বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই, সমস্তই এক অটল ধর্মনিয়মে বদ্ধ একথা যদি সত্য হয় তবে ইহা আমাদের গৌরবের, আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথবাবুও অন্যত্র একথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন "হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানীও নষ্ট হইবে না তোমার হিন্দুনামেও কলঙ্ক পড়িবে না।" অর্থাৎ এসকল বিষয় ধ্রুব ধর্মনিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথবাবু বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না; আমি যদি প্রমাণস্বরূপে দেখাই গোমাংসভুক্ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভুক স্মার্তবাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন? যদি কোন ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে

* এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যার তর্কে নামিতে চাহি না। বলা আবশ্যক. স্বতঃসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না।

না? যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম হয়, হিন্দুধর্মে যদি মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।

কাশ্মীর। এরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া বাঙ্গলা কাগজে প্রায়ই লেখা হয় না। তাহার কারণ, উপযুক্ত লেখক পাওয়া কঠিন। কেবল অন্ধভাবে ইংরাজি কাগজের অনুবাদ বা প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সত্য পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রবাবু কাশ্মীরের বর্তমান বিপ্লব সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন ইহা কোন কাগজের প্রতিধ্বনি নহে; ইহা তিনি যেন রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরণীয়।

সাধনা ১২৯৯ বৈশাখ পৃ ৫৫১-৫৫৫

নব্য ভারত। চৈত্র। পঞ্জিকা বিভ্রাট। প্রবন্ধটি ভাল এবং আবশ্যক কিন্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য নহে।

জীবন ও কাব্য। লেখক বলিতেছেন, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁহার কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। গাছের সঙ্গে ফলের যোগ আছে বলাও যেমন বাহুল্য, কবির প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের প্রকৃতির যোগ আছে একথা বলাও তেমনি বাহুল্য। কিন্তু লেখক একটি নূতন সমাচার দিয়াছেন—তিনি বলেন বর্তমান বাঙ্গলা কবিদের জীবনের সহিত কাব্যের সামঞ্জস্য নাই। বঙ্গ কবিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখক কোথা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন বলা শক্ত। সামান্যতম মানবজীবনেও কত প্রহেলিকা কত রহস্য আছে, তাহা উদ্ভেদ করিতে কত যত্ন, কত নিপুণতা, কত সহৃদয়তার আবশ্যক। লেখক ঘরে বসিয়া অবজ্ঞা-ভরে বঙ্গ কবিদের জীবনের উপর দিয়া যে, তাঁহার মহৎ লেখনীর একটা কালির আঁচড় চালাইয়া গিয়াছেন কাজটা তাঁহার মত লোকের উচিত হয় নাই। কারণ, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি খুব উচ্চদরের নীতি-উপদেশ দিয়াছেন, অতএব লেখার সহিত লেখকের জীবনের যদি অবশ্যম্ভাবী যোগ থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতেও ন্যায়াচরণ সম্বন্ধে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক, একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত—আজকালকার কবি যদি কাব্যে কাপট্য করেন সত্য হয়, যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন তাঁহারা যে অকৃত্রিম সারল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। আসল কথা কাব্যই লিখুন আর সমালোচনাই লিখুন, সকল বিষয়েই অধিকার অনধিকার আছে,

তাহাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক লেখক মিথ্যা কাব্য লেখেন এবং অনেক সমালোচক কাব্য হইতে যথার্থ সত্য এবং সৌন্দর্য উদ্ধার করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সুখাবতী। বিখ্যাত ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় সুখাবতী অর্থাৎ বৌদ্ধ স্বর্গ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানদের স্বর্গে যেরূপ ভোগের প্রলোভন আছে বৌদ্ধদের স্বর্গে সেরূপ নাই। বৌদ্ধ স্বর্গে প্রাণীগণ হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের উপকার ও সুখবর্ধনে নিযুক্ত। "তাঁহাদের এই মূলমন্ত্র যে জগতে যাহা কিছু সুখ আছে, সমস্তই পরের উপকার করিতে বাসনা করিলেই লাভ করা যায়। স্বার্থচিন্তাতে কেবল অনবচ্ছিন্ন দুঃখরাশিই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কল্পবৃক্ষগণেরও ফলপ্রদান সময়ে স্বভাবতই শরীর কম্পিত হইয়া থাকে, অপরিসীম ক্ষীর সমুদ্রও অমৃতভিলাষী দেবগণ কর্তৃক মথিত হইয়া কম্পিত হন, কিন্তু এই সুখাবতীবাসী বোধিসত্ত্বগণ পরার্থে শত শতবার শরীর দানে নিষ্কম্প ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ আনন্দে পুলকোৎকর বহন করে।" আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

সা হি ত্য। চৈত্র। চৈত্রমাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত-গুপ্ত মহাশয় "প্রাচীন ভারত" প্রবন্ধে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালীন "সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব" ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শিলাদিত্যের রাজত্বকালে পাঁচবার এই উৎসব কার্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল।

গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল পরম পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্র। এই স্থানের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসব কার্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি "সন্তোষক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফিট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। এই সমস্ত গৃহের এক একটিতে একেবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক

পূর্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী বা মাতাপিতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান-গ্রহণের জন্য, আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপত্তু ও আসাম-রাজকুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই করদ রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য, সন্তোষক্ষেত্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপত্তুর সৈন্যের বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্মের অবমাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেবমূর্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথমদিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত, এবং সর্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয়দিনে শিবের মূর্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দানকার্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা দশ দিন হিন্দুদেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্যন্ত দরিদ্র নিরাশ্রয়, মাতৃপিতৃহীন ও আত্মীয়-স্বজনশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্যন্ত উৎসবের কার্য চলিত। শেষদিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলংকার পরিত্যাগ পূর্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণ-রাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য যোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদায় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদায় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পবিত্র প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

সাধনা ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১০১-১০৪

ন ব্য ভা র ত। বৈশাখ। পুরাতন ও নূতন। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়—কিন্তু হায়, বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সেকথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছু মাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে কথা কীটের মত অতিক্রুতবেগে আপনার বংশ-বৃদ্ধি করিয়া চলে, ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমেব মুখে বাহির হইল—"নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না" অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল "বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্‌গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নবীন সূর্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।" তস্য পুত্রঃ "নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্ধান হয়।" তস্য পুত্রঃ "নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত কবিয়া চলিয়া যায়।" (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতি লজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্রঃ "নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?" অবশেষে "৯৯ উদয়ে ঐ দেখ ৯৮ সাল কালের গর্তে ডুবিয়া গিয়াছে।" এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল—নববর্ষ আসিয়াছে, অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই, "হ্রাসবৃদ্ধি" কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্ত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু সাজিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। "হ্রাস বৃদ্ধির কথাটা বলিয়াছি ত আর একটু ভাল করিয়া বলি। ছোট ছেলেটি ক্রমাগতই বড় হইতেছে! কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি, কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরো পুরাতন, আরো পুরাতন হইতে

লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।" – ছোট ছেলেটি যে ক্রমে বড় হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন – কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড় হইয়া থাকে সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রমে সেটা আর তেমন আশ্চর্য বোধ হয় না, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। একথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।

মামলায় মরণ। মামলা মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কিরূপ সর্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে – সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙ্গালীর ঘরে মামলা মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মোকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মত এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মামলা ত একপ্রকার আইনসঙ্গত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয়পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্বস্ব পর্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশ বাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে মোকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।

মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্তি প্রবন্ধে জেনেরাল বুথ যে কিরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর কিছু না হউক আমাদের – বাঙ্গালীদের – অত্যুগ্র আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় ত সেও পরম লাভ বলিতে হইবে।

সা হি ত্য। বৈশাখ। প্রভাবতী সম্ভাষণ। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্বিশেষে ভাল বাসিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই। লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"আমি বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভাল বাসবেন না।' তুমি অমনি শিরশ্চালন পূর্বক, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি' এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সে দিন, সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও প্রতিবারেই, 'না ভাল বস্‌বি' এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্তিহীন বদনে, 'তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভাল বস্‌বো' এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরস-সহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।"

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য।

নূতন বাড়ি গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না—প্রভু মহেন্দ্রনাথবাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজ্‌গবী ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাধনা ১২৯৯ শ্রাবণ পৃ ২৮৬-২৮৮

সা হি ত্য। জ্যৈষ্ঠ। লয়। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি।

প্রাইভেট্ টিউটার। পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোট গল্প। গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয়, একটা ছুটা আত্মহত্যা, নয়, সমাজ-বিদ্রোহ, নয়,

কোন রকমের একটা উৎকট কবিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক, লেখক এমতভাবে শেষ করিয়াছেন যে নায়ক নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁদা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণতঃ নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক—একদিকে হৃদয়ের টান, আর একদিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর—একটুখানি উপন্যাসের ধরণে প্রেমচর্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রায় একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা সখ মাত্র, কিন্তু শাম্‌লা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত সখের নহে, ওইটেই জীবনের সর্বপ্রথম ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপর একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোন রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরাণী নহে, সে উপন্যাসের নায়ক—কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস।

বৈদিক সোম। তৃতীয় প্রস্তাব। বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সা হি ত্য আষাঢ়। কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যুক্তি এবং শূন্য হাহুতাসে পরিপূর্ণ থাকে—তাহার প্রধান কারণ, খাঁটি খবর আমরা পাই না, খাঁটি খবর আমরা চাইও না—মনে করি, খুব অলংকার দিয়া কেবল কতকগুলা ফাঁকা আবেগ প্রকাশ করিলে খুব উচ্চ অঙ্গের লেখা হয়। কোন একটা আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কার সহজভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আমরা অক্ষম, সময়ে অসময়ে নিজের হৃদয়টাকে যেখানে সেখানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে খুব খানিকটা আস্ফালন বা অশ্রুপাত না করাইলে আমাদের কিছুতেই মনঃপূত হয় না। আমরা যে ভারি সহৃদয় কেবল এইটে প্রমাণ করিবার জন্যই যেন আমরা নানা ছুতো অন্বেষণ করিতেছি, সেই জন্য আসল কথাটা ভাল করিয়া বলিবার সুযোগ হয় না, মনে হয় ততক্ষণ নিজের হৃদয়টা প্রকাশ করিলে কাজে লাগিত। সহৃদয়তা করিতে, কাঁদুনী গাহিতে, বিস্মিত চকিত স্তম্ভিত হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, অনুসন্ধান অথবা চিন্তার আবশ্যক করে না এবং লেখাটাও বিস্তার লাভ করে।

নগেন্দ্রবাবুর লেখায় কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা এবং তদপেক্ষা ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া দেয়।

'সমুদ্র যাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা' প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল, সরল ও নির্ভীক।

•

সাধনা ১২৯৯ ভাদ্র ও আশ্বিন পৃ ৪৪২ ৪৪৬

ন ব্য ভা র ত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। মেঘনাদবধচিত্র। বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।

রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রীবৃদ্ধি নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে, ভারতবর্ষের অনার্য জাতীয়েরা কি করিয়া ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডীর মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিলাম না।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। ইহাতে যে সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এসকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরো দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙিবার এবং স্থলবিশেষে কেবল মাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।

অনাহারে মরণ। বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না বলিয়া যে বাঙালী জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে একথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই এক স্থলে আমাদের খট্‌কা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে "তাঁহারা বাক্যসার বক্তাদিগের অপেক্ষা ভাল স্বদেশপ্রেমিক 'better patriots'।" ইংরাজি কথাটি জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন। সেই জন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সা হি ত্য। শ্রাবণ। মধুছন্দার সোমযাগ। বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে "মধুবিদ্যা" নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, "ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুছন্দার সোমযাগ কিরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।" এবারকার সংখ্যায়, মধুছন্দা ঋষি কে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল।

উপাধি-উৎপাত প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমনকি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মত মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণতঃ যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান্ যোগ্য লোক নাই? উপাধী যদি স্থলবিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ—কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষলাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদর কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্যপাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবু গবর্মেন্টের হস্ত হইতে রায়বাহাদুর উপাধি

গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিমবাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সংগীতমিশ্রিত সৌন্দর্য নিক্ষেপ করিয়াছে।

আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদেব নাই। অতএব 'আদর্শ সমালোচনা'-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেজন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য বা দুঃখিত হই নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্যকোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ত হয়ত কৃতকার্য হইতেও পারেন।

কালিদাস ও সেক্সপিয়র লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

আমার 'স্বরচিত' লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি। এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কি করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে

পারি না। চন্দ্রনাথবাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোট অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড় অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড় অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা কবি নাই। দেখিতেছি আমাদেব আলোচনা ক্রমশ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয়প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

গ্র ন্থ স মা লো চ না

সাধনা ১৩০১ ফাল্গুন পৃ ৪০১-৪০৩

দে ও য়া ন গো বি ন্দ রা ম বা দু র্গো ৎ স ব। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি একটি রীতিমত উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকাব রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু, পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বীস্ত্রী, কপটাচারী পাষণ্ড এবং সর্ব বিপৎলঙ্ঘনকাবী ভাগ্যবান্ সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবাব বিচিত্র উপকরণ আছে। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যও সাধু, ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থেব পবিণামে পাপেব পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একথা একবারও ভুলিতে পারি নাই যে, গ্রন্থকার পাঠককে ভুলাইবাব চেষ্টা করিতেছেন। দেওয়ানজি হইতে উজ্জ্বলা পর্যন্ত কেহই সত্যকার সজীব মানুষের মত হয় নাই, তাহারা যে সকল কথা কয় তাহাব মধ্যে সর্বদাই লেখকের প্রম্পটিং শুনা যায় এবং ঘটনাগুলিব মধ্যে যদিও সম্ভবতা আছে কিন্তু অবশ্যসম্ভাব্যতা নাই। এইখানে স্পষ্ট কবিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উপন্যাসেব সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার বাঁধা মত নাই। লেখক আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই হইল, তা ঘটনা যতই অসম্ভব হউক্। অনেক রচনায় সুসম্ভব জিনিষও নিজেকে সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারে না, আবার, অনেক রচনায় অসম্ভব ব্যাপারও চিরসত্যরূপে স্থায়ী হইয়া যায়। "মন্টেক্রিষ্টো" উপন্যাস বর্ণিত ঘটনা প্রাকৃত জগতে সম্ভবপর নহে কিন্তু "ড্যুমা"র প্রতিভা তাহাকে সাহিত্যজগতে সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমের কল্পনা সত্য করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু হয়ত নিকৃষ্ট লেখকের হাতে এই গ্রন্থ নিতান্ত অবিশ্বাস্য হাস্যকর হইয়া উঠিতে পারিত।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বোধ হইল যে যদিচ ঘটনা সংস্থান এবং চরিত্র রচনায় গ্রন্থকার কৃতকার্য হইতে পারেন নাই তথাপি গ্রন্থবর্ণিত কালের একটা সাময়িক অবস্থা কতক পরিমাণে মনের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। তখনকার সেই খাল বিল মাঠের ভিতরকার ডাকাতি, এবং দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে; মনে হয় লেখক এসকল বিষয়ে অনেক বিবরণ ভাল করিয়া জানেন, কোমর বাঁধিয়া আগাগোড়া বানাইতে বসেন নাই।

ম নো র মা। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

গ্রন্থখানি দুই ফর্মায় সমাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। আরম্ভ হইয়াছে, "রাত্রি দ্বিপ্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রকৃতি দেবী অন্ধকার সাজে সজ্জিত হইয়া গম্ভীরভাবে অধিষ্ঠিতা।" শেষ হইয়াছে, "হায়! সামান্য ভুলের জন্য কিনা সংঘটিত হইতে পারে!" ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, ভুলটিও সামান্য কিন্তু ব্যাপারটি খুব গুরুতর।

কৌতুকপ্রিয় সমালোচক হইলে বলিতেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে শেক্‌সপিয়ার হইতে উদ্ধৃত কোটেশন্‌গুলি অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে" এবং অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনায় সকল সময়ে কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এই কঠিন পৃথিবীতে যখন আর কিছু দিবার সাধ্য থাকে না তখন দুটো মিষ্ট কথা দিবার ক্ষমতা এবং অধিকাব সকলেরই আছে, নাই কেবল সমালোচকের। একে ত যে গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসে তাহার মূল্যও তাহাকে দিতে হয় না, তাহার উপরে সুলভ প্রিয়-বাক্য দান করিবার অধিকার তাহাও বিধাতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেন নাই। এই জন্য, যখন কোন গ্রন্থের প্রতি প্রশংসাবাদ প্রয়োগ করিতে পারি না তখন আমরা আন্তরিক ব্যথা অনুভব করি। নিজের রচনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে করা লেখক মাত্রেরই পক্ষে এত সাধারণ ও স্বাভাবিক যে, সেই ভ্রমের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিতে কোন লেখকের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন—হায়! সামান্য ভ্রমের জন্য কি না সংঘটিত হয়! অর্থব্যয়ও হয়, মনস্তাপও ঘটে।

মণিপুরের বর্ণনা

সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃ ৪৪-৪৬

সার জেম্‌স্‌ জনষ্টন্‌ জুন মাসের নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় মণিপুরের যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সহসা মনের মধ্যে একটি বিষাদের ভাব উদয় হয়।

স্থানটি রমণীয়। চারিদিকে পর্বত, মাঝখানে একটি উপত্যকা; বাহিরের পৃথিবীর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, মানুষগুলি সরল এবং উদ্যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয়, রাজাকে কেবল বরাদ্দমত পরিশ্রম দিতে হয়। যে শস্য উৎপন্ন হয় আপনারাই সম্বৎসর খায় এবং সঞ্চয় করে, বাহিরে পাঠায় না, বাহির হইতেও আমদানী করে না। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এখানকার দৃশ্যটি বড় মনোরম হইয়া উঠে। দিন উজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শীতল; পাকাধানে শস্যক্ষেত্র সোনার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মেয়েরা শোভন বস্ত্র পরিয়া দলে. দলে ধান কাটিতেছে, বলিষ্ঠ পুরুষেরা শস্যেব আঁটি বহন করিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। নিকটে গোরুগুলি ধীর গতিতে প্রদক্ষিণ কবিয়া ধান মাড়াই করিতেছে, শস্যবিচ্ছিন্ন তৃণ এক পার্শ্বে রাশীকৃত হইতেছে, ধান যখন ঘরে আসিবে তখন সেই তৃণে আনন্দোৎসবের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

রাজধানীতে সন্ধ্যাবেলায় হাট বসে, সেইটেই দিবসের মধ্যে প্রধান ঘটনা। যতই বেলা পড়িয়া আসিতে থাকে পথ হাট লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পুরুষদের নির্মল শুভ্র বসন এবং মেয়েদের নানাবিধ উজ্জ্বলবর্ণের বিচিত্র সজ্জা। মেয়েরাই বিক্রেতা। দেখিতে পাওয়া যায় মাথায় পণ্য দ্রব্য এবং কোলে অথবা পিঠে কচি ছেলে লইয়া তাহারা "সেনা কাইথেল" অর্থাৎ সোনাবাজারে হাট করিতে আইসে, পথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাজারের কাছে পোলো খেলিবার মাঠ। সহরের ভাল ভাল খেলোয়াড় এমনকি রাজপুত্রগণ সেইখানে প্রায় প্রত্যহ খেলা করে; সেখানে কুস্তিও চলে এবং রাজসৈন্যদের কুচও হইয়া থাকে।

রাজবাড়ির চারিদিকে খাল কাটা আছে সেইখানে আশ্বিন মাসে একবার করিয়া নৌকা বাচ হয়। সেই উপলক্ষে মহাসমাগম হয়। রাজা, রাজকুটুম্ব,

ততই সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে। সমাজের নিম্নস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।

যাঁহারা একদিকে আত্মমাহাত্ম্য এবং অন্যদিকে রমণীর সুমিষ্ট সুকোমল হৃদয়বত্তার মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছেন তাঁহাদিগকে একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। একসঙ্গে দুইদিক রক্ষা হয় না। হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় পারিবারিক শান্তি, হয় বক্তৃতামঞ্চ নয় গৃহ, হয় স্বাতন্ত্র্য নয় প্রেম, হয় ধর্মপ্রবৃত্তির শুষ্কতা ও নিষ্ফলতা নয় উর্বরা পরিপূর্ণা বিচিত্র ফলশালিনী স্ত্রীপ্রকৃতি, এই দুয়েব মধ্যে একটাকে বরণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের হস্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিবার বিরুদ্ধে এমন একটি যুক্তি আছে যাহার আর উত্তর সম্ভবে না। রাজকাযে যখন আবশ্যক হইবে তখন পুরুষেরা রণক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে বাধ্য কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যুদ্ধ বাধাইবার বেলা স্ত্রীলোক থাকিবেন আর রক্তপাতের বেলায় পুরুষ এটা ঠিক সঙ্গত হয় না। আর স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই শান্তির পক্ষপাতী হইবে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়ুরোপের কতকগুলি দারুণতর যুদ্ধ স্ত্রীলোকের দ্বাবাই ঘটিয়াছে। মাডাম্ ডে ম্যাণ্টনঁ কি শান্তিপ্রয়াসিনী ছিলেন? ফ্রাঙ্কোপ্রুসীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে "বার্লিনে চল" বলিয়া ফ্রান্সে যে একটা রব উঠিয়াছিল, যে উন্মত্ততার ফলে এত রক্ত এবং এত অর্থব্যয় হইয়া গেল, সাম্রাজ্ঞী য়ুজেনীর কি তাহাতে কোন হাত ছিল না? রুশিয়ার সুন্দরী যুবতীদের মধ্যে কি এমন কোন নাইহিলিষ্ট্ নাই যাঁহারা হত্যা ও সর্বনাশ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন? বাতাসে উইলোপত্র যেরূপ কাঁপিয়া ওঠে, উত্তেজনাবাক্যে রমণীহৃদয় সেইরূপ বিচলিত হয়। তাহার পর একবার রমণী ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে তাহার বাধাবিপদের চেতনা থাকে না, হিতাহিতের জ্ঞান দূর হইয়া যায়।

ফ্রান্সে সর্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের শাসন যেরূপ বলবৎ এমন আর কোথাও নয়, কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোক যখনি রাজ্যতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনি বিপদ ঘটাইয়াছে।

সর্বময় প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং আপনার মতকেই পাঁচ কাহন করা স্ত্রীস্বভাবের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। আমেরিকায় রমণী যখনি প্রবল হয় একেবারে জবরদস্তি করিয়া মদের দোকান ভাঙ্গিয়া দেয় এবং জোর হুকুমে মদ্যবিক্রয় বন্ধ করিয়া বসে। এদিকে ইঁহারা নিজে হয় ত চা, ইথরক্লোরালে অভিষিক্ত হইয়া নিজের স্বাস্থ্য ও স্নায়ু জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন, অপ্রিয় কর্মফল হইতে মুক্তিলাভের

উদ্দেশে বিবিধ বিপজ্জনক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাহার সাধ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করে।

মাতৃত্বের মধ্যে একটি অপ্রতিহত কর্তৃত্ব আছে। শিশুসন্তানের উপর মায়ের অখণ্ড অধিকার। এ সম্বন্ধে কাহারো কাছে তাহার কোন জবাবদিহি নাই। যুগযুগান্তর এই মাতৃকর্তৃত্ব চালনা করিয়া রমণীহৃদয়ে একটা অন্ধ আত্মপ্রভুত্বের ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। বংশরক্ষাব পক্ষে এই নিজহৃদয়ানুসারী কর্তৃত্বপ্রিয়তা বিশেষ আবশ্যক কিন্তু রাজ্যবক্ষাব পক্ষে, ব্যাপক ন্যায়াচরণের পক্ষে সাধারণ হিতোদ্দেশে অল্পসংখ্যকের দমনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য

সাধনা ১২৯৮ পৌষ পৃ ১২২-১২৩

ইংবাজ যে কি কৌশলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যরক্ষা কবিতেছেন, আগষ্ট মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় সার্ অ্যাল্‌ফ্রেড্ লায়াল্ "সীমান্তপ্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য" নামক প্রবন্ধে তাহা অনেকটা প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখক বলেন, নিজ অধিকারের সন্নিকটে যখন প্রবল প্রতিবেশী থাকে তখন ইংরাজ মাঝখানে একটি করিয়া আশ্রিত রাজ্যের ব্যবধান রাখিয়া দেন। আশ্রিতরাজ্য স্থাপনের অর্থ এই যে, পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাজাকে বল বা কৌশলের দ্বারা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করানো। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ করার থাকে যে ইংবাজ তাহাকে শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে এবং সে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোন প্রবল রাজাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন তখন মহারাষ্ট্রাদের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে মাঝখানে অযোধ্যাকে আশ্রিতরাজ্যস্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই কারণেই মধ্য ভারতের রাজপুত রাজ্য-সকলকে আশ্রয় দান করা হইয়াছিল। পঞ্জাব অধিকারের পূর্বে শিখদিগের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য শতদ্রুতীরে গুটিকতক ছোট ছোট পোষ্য রাজা রাখিতে হইয়াছিল। এইরূপে বাঙ্গলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে এক একটা বাঁধ বাঁধিয়া ইংরাজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া লইল।

ভারতের নীচের দিকে সমুদ্র ও উপরের দিকে হিমালয়ের দুই মস্ত বেড়া আছে। অতএব মনে হইতে পারে একবার ভারতের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলে আর আশ্রিত রাজ্যপাতের আবশ্যক নাই। কিন্তু ওদিকে মধ্য এসিয়া হইতে

রুশিয়া ঠিক ইংরাজের কৌশল অবলম্বন করিয়া এক এক পা অগ্রসর হইতেছে। সেও খানিকটা করিয়া দখল এবং খানিকটা করিয়া সন্ধিরাজ্য স্থাপন করে। এমনি করিয়া ইংরাজ ও রুশিয়া দুই সাম্রাজ্যের সন্ধিরাজ্য অক্সস্ নদীর দুই তীরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। রুশিয়ার পক্ষে বোখারা এবং ইংরাজের পক্ষে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান। অতএব পর্বতের আড়ালে আসিয়াও রক্ষা নাই, তাহার পরপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সহিত যে কোনরূপ পাকাপাকি লেখাপড়া আছে তাহা নহে—কিন্তু ইংরাজ এই পর্যন্ত একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং পারস্য ও রুশিয়ার সহিত কথা আছে তাঁহারা সে সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

এইরূপে স্বরাজ্য ও সন্ধিরাজ্যে মিলিয়া ইংরাজের আধিপত্য ক্রমশই বিপুল হইয়া উঠিতেছে। এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাঁহারা নিজেই অনেক সময় শঙ্কা পান, কিন্তু সহসা আর অধিক বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এতদিন পরে ইংরাজের প্রতাপ পূর্ব ও পশ্চিমে দুই শক্ত জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। উভয় পার্শ্বেই সুনিয়ন্ত্রিত দুই বৃহৎ রাজ্যের কঠিন বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে রুশিয়া এবং একদিকে চীন।

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্যন্ত কোন সন্ধিরাজ্য স্থাপনার আবশ্যক হয় নাই। কারণ সেখানে তিনটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক প্রহরী আছে। হিমালয়, তৎপশ্চাতে মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালক্ষেত্র এবং তাহার উত্তর মঙ্গোলীয় মরুভূমি। কিন্তু উত্তর রাষ্ট্র হইতে নেপালের সহিত কোনপ্রকার গোলযোগ ইংরাজ সহ্য করিবেন না; এবং এক সময় তিব্বত ইংরাজাশ্রিত সিকিমের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বছর দুয়েক হইল তাহার সহিত ইংরাজেব একটি ছোটখাট খিটিমিটি বাধিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পূর্বাঞ্চলে বর্মার অভিমুখে চীনের সংস্রব সম্বন্ধে ইংরাজকে অনেকটা সাবধান থাকিতে হয়। যখন বর্মা ইংরাজের হস্তে আসে নাই তখন উহা একটি ব্যবধানস্বরূপ ছিল—এখন বর্মা অধিকার করিয়া ইংরাজ চীনের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াছেন; এইজন্য সম্প্রতি ইংরাজ বর্মা ও চীনের মধ্যবর্তী কম্বোডিয়ার অর্ধস্বাধীন অধিনায়কগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

এইরূপে হিমালয়কে তাকিয়া করিয়া দুই দিকে দুই পাশবালিস লইয়া ইংরাজ এক মস্ত রাজ-শয্যা পাতিয়াছেন কিন্তু গদি যে আর বেশি অগ্রসর হইবে এমন সম্ভাবনা সম্প্রতি নাই।

কেবল ভারতবর্ষের আশপাশ নহে ওদিকে ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টর, সাইপ্রেস্ দ্বীপ, লোহিত সমুদ্রের প্রান্তে এডেন ইংরাজ-সতর্কতার পরিচয়স্থল। এডেন ভারতসমুদ্রপথে প্রবেশ করিবার প্রথম পদনিক্ষেপস্থান। এইখানে ইংরাজ একটি দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। এডেনের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ড ইংরাজের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে। এডেনের অনতিদূরবর্তী সাকোট্রা দ্বীপ ইংরাজের আশ্রিত এবং এডেনের পূর্বদিকে ওমান হইতে মস্কট্ ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত আরবের সমস্ত উপকূল ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজের জাহাজ সেখানকার সামুদ্রিক পুলিসের কাজ করে এবং আরব নায়কগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ইংরাজের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহার উপর আবার ঈজিপ্টের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি। সেটা পাইলে ইংরাজের রাজপথ আরো পাকা হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার প্রতি সমস্ত য়ুরোপের সমান টান থাকাতে ইংরাজের তেমন সুবিধা দেখিতেছি না।

যাহা হউক, ভারতের রাজলক্ষ্মীকে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজের দূরদর্শিতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এমন আটেঘাটে বন্ধন, এমন অন্তরে বাহিরে পাহারা, এমন ছোটবড় সমস্ত ছিদ্রাবরোধ কোন আসিয়িক চক্রবর্তীর কল্পনাতেও উদয় হইতে পারিত না।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

সাধনা ১২৯৮ পৌষ পৃ ১২৬-১২৭

বিখ্যাত রণসংবাদদাতা আর্চিবল্ড ফর্বস্ কয়েক সংখ্যক নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরিতে অনেকগুলি রণক্ষেত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ফ্রাঙ্কোপ্রুসীয় যুদ্ধের সময় জর্মান সৈন্য যখন প্যারিস্ নগরী অবরোধ করিয়াছিল তখন অবরুদ্ধ পুরীর মধ্যে মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। বিস্মার্ক উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন প্যারিস্ আপন রসে আপনি সিদ্ধ হইতেছে। ঘোড়া কুকুর খাইয়া অবশেষে ক্ষুধার জ্বালা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন প্যারিস্ আপনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। রাজপথে আলো নাই, গ্যাস নির্মাণ করিবার কয়লার অভাব, হোটেলে হাসপাতাল, আহারের দোকান বন্ধ, বাণিজ্যের চলাচল রহিত, পথে কেবল সারি সারি মৃতদেহ-বাহক চলিয়াছে, অধিবাসীগণ ক্ষুধায় শীর্ণ এবং অনেকেই খঞ্জ ও অঙ্গহীন। যুদ্ধাবসানে দানব্রত ইংরাজ প্যারিসে অন্নছত্র স্থাপন করিল। কিন্তু মানী লোকেরা বরঞ্চ মরিতে পারে কিন্তু দানগ্রহণ করিতে পারে

না। লেখক বলিতেছেন, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের এ সম্বন্ধে অভিমান অত্যন্ত প্রবল। হয়ত খবর পাওয়া গেল দুই জন স্ত্রীলোক অমুক বাসায় উপবাসে দিনযাপন করিতেছে। বার্তা লইতে গেলেই তাহারা মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া বসে, বলে, 'ইংরাজ অতিশয় দয়ালু জাতি এবং ঈশ্বর তাহাদের কল্যাণ করুন। উপরের তলায় কতকগুলি দরিদ্র বেচারা আছে বটে, তাহারা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। আমাদিগকে সাহায্য করিতে চাও, সেজন্য ধন্যবাদ দিই, কিন্তু না, আমরা দানগ্রহণ করিতে পারিব না।' এই বলিয়া সেই জ্যোতির্হীন নেত্র কোটরাবিষ্ট কপোল শীর্ণ রমণী ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়।

স্ত্রী-মজুর

সাধনা ১২৯৮ মাঘ পৃ ২৪৪-২৪৭

কারখানার মজুরদের লইয়া য়ুরোপে আজকাল ক্রমিক আন্দোলন চলিতেছে। কলকারখানা য়ুরোপের একটা প্রকাণ্ড অংশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহার অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইতেছে। পৃথিবীর ভার বাড়িয়া উঠিলে ভূভার-হরণের জন্য অবতারের আবশ্যক হয়। কলকারখানা য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে একদিকে প্রকাণ্ড চাপ দিয়া তাহার ভার সামঞ্জস্যের যদি ব্যাঘাত করে তবে স্বাভাবিক নিয়মে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে আমাদের পক্ষে বলা বড়ই শক্ত, কিন্তু এই কথাটা লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া চলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কলের প্রাদুর্ভাব হইয়া অবধি মজুরী সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে বিশেষ কারুকার্যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক ছিল; এবং গৃহকার্যের ভার স্বভাবতই স্ত্রীলোকদের উপর থাকাতে পুরুষদেরই বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অবসর ছিল। তাহা ছাড়া পূর্বে অধিকাংশ কাজ কতক পরিমাণে বাহুবলের উপর নির্ভর করিত, সেজন্য পুরুষ কারিগরেরই প্রাধান্য ছিল। কেবল চরকা কাটা প্রভৃতি অল্পায়াসসাধ্য কাজ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিল। এখন কলের প্রসাদে অনেক কাজেই নৈপুণ্য এবং বলের আবশ্যক কমিয়া গিয়াছে, অথচ কাজের আবশ্যক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য স্ত্রীলোক এবং বালকেও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহিত দলে দলে মজুরী কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু কেবল কলের কাজ দেখিলেই চলিবে না, সমাজের উপরেও ইহার ফলাফল আছে।

সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে য়ুরোপে দুটা একটা করিয়া আইনের সৃষ্টি হইতেছে। কলের আকর্ষণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

সেপ্টেম্বর মাসের "নিউ রিভিউ" পত্রিকায় খ্যাতনামা ফরাসী লেখক জুল্ সিমঁ ফ্রান্সের স্ত্রী-মজুরদেব সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, ফ্রান্সে প্রথম যখন বালক মজুবদিগের বয়সের সীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য আইন হয় তখন একটা কথা উঠে যে, ইহাতে করিয়া সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্বাভাবিক অধিকাবে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। তাছাড়া কারখানাওয়ালারা ভয় দেখায় যে, শিশুসহায় হইতে বঞ্চিত হইলে কারখানার ব্যয়ভার এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আইন পাস হইল এবং কারখানা এখনো সমান তেজে চলিতেছে। কলিকালের সকল ভবিষ্যৎবাণীবই প্রায় এক দশা দেখা যায়। বালক মজুরদের পক্ষে প্রথমে আট বৎসর, পরে নয় বৎসর, পরে বারো বৎসর এবং অবশেষে তেরো বৎসরের অন্যূন বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রী-মজুরদেব খাটুনি সম্বন্ধে যখন কতকগুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ কবিবার চেষ্টা হয় তখন চারিদিক হইতে তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হয়। সকলেই বলিতে লাগিল ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। যদি কোন বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক বারো ঘণ্টা খাটিতে স্বীকার করে আইনের জোরে তাহাকে দশ ঘণ্টা খাটিতে বাধ্য করা অন্যায়। অনেকে বলেন, স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন পাশ করিয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি কতকটা অসম্মান প্রকাশ হয়। তাহাতে বলা হয় যেন তাহারা পুরুষের সমকক্ষ নহে।

লেখক বলিতেছেন, যখন গর্ভধারণ করিতে হয় তখন বাস্তবিকই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বৈষম্য আছে। কারখানার ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, স্ত্রী-মজুরদিগকে প্রায়ই দুরারোগ্য বোগ বহন করিতে হয়। গর্ভাবস্থায় কাজ কবা এবং প্রসবের দুই তিনদিন পরেই বারো ঘণ্টা দাঁড়াইয়া খাটুনি এই সকল রোগের প্রধানতম কারণ।

কেবল আজীবন রোগ বহন ও রুগ্ন সন্তান প্রসব করাই যে স্ত্রীলোকের অনিয়ন্ত্রিত খাটুনির একমাত্র কুফল, তাহা নহে। গৃহকার্যে অনবসর সমাজের পক্ষে বড় সামান্য অকল্যাণের কারণ নহে। পূর্ণ মাতৃস্নেহ হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা হইতে যে কত অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে!

লেখক বলিতেছেন, বাষ্পীয় কল স্ত্রীপুরুষ উভয়কে নিজের কাজে টানিয়া লইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। স্ত্রী-মজুর এখন স্ত্রী নহে মাতা নহে কেবলমাত্র মজুর।

ইহা হইতে যতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায়, তাহা এখন সম্পূর্ণ পরিণত হইবার সময় পায় নাই। কেবল দেখা যাইতেছে পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান এবং পাশবতা ক্রমশঃ দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হইয়া মানসিক অসুখ এবং সন্তান পালনে অবহেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে য়ুরোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই—জিনিসপত্র, না মনুষ্যত্ব, কাহার দাম বেশি?

প্রাচীন পুঁথি-উদ্ধার

সাধনা ১২৯৮ মাঘ পৃ ২৪৭-২৪৮

য়ুরোপের মধ্যযুগে যখন এক সময় বিদ্যার আদর সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান গ্রন্থের অন্বেষণ পড়িয়া যায়। বহু চেষ্টায় ধর্মমন্দিরস্থিত পুস্তকালয় হইতে অনেক প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার হয়। সেই অন্বেষণ কার্য এখনো চলিতেছে। কাজটা কিরূপ অসামান্য যত্নসাধ্য তাহা নভেম্বর মাসীয় "লেজার আওয়ার" পত্রের প্রবন্ধবিশেষ হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বাহির হইতে পারে তাহা বোধ করি একপ্রকার সমাধা হইয়াছে। কাজটা নিতান্ত সহজ নহে। কেবল বসিয়া বসিয়া পুঁথি বাছা বিস্তর ধৈর্যসাধ্য, তাহা ছাড়া আর একটি বড় কঠিন কাজ আছে। পুরাকালে লিপিকরগণ অনেক সময়ে একটা পুঁথির অক্ষর মুছিয়া ফেলিয়া তাহার উপর আর একটা গ্রন্থ লিখিতেন। বহুকষ্টে সেই মোছা অক্ষর পড়িয়া পড়িয়া অনেক দুর্লভ গ্রন্থ উদ্ধার করা হইয়াছে। এইরূপ এক একখানি পুঁথি লইয়া এক এক পণ্ডিত বিস্তর চেষ্টায় গুটিকতক লুপ্তপ্রায় দাঁড়ি কমি বিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিলেন, আবার আর এক পণ্ডিত দ্বিগুণতর ধৈর্য সহকারে তাহাতে আরো গুটিকতক যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে পতিনিষ্ঠ সাবিত্রীর ন্যায় তাঁহারা অনেক সত্যবান্ গ্রন্থকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

নেপল্‌সের নিকটবর্তী ক্ষেত্র খনন করিয়া হর্ক্যুলেনিয়ম্‌ নামক একটি প্রাচীন নগর ভূগর্ভ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে সেকালের এক পুস্তকালয় বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে সহস্র সহস্র পুঁথি একেবারে কয়লা হইয়া গিয়াছে। ইহার কতকগুলি পুঁথি অসামান্য যত্নে অতি ধীরে ধীরে খোলা হইয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ ভাল বহি এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

উত্তর ঈজিপ্টের মরুমৃত্তিকা এত শুষ্ক যে তাহার মধ্যে কোন জিনিস সহজে নষ্ট হয় না। কাগজ সূতা বস্ত্র পাতা প্রভৃতি দ্রব্যও তিন সহস্র বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে—যেন তাহা সপ্তাহখানেক পূর্বে পুতিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইলিয়াড্‌ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ মৃতদেহের সহিত একত্রে পাওয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন প্রাচীন ঈজিপ্টিয়গণ বিশেষ উপায়ে মৃতদেহ রক্ষা করতেন। অনেক সময় তাঁহারা কাগজ দিয়া এই মৃতদেহের আবরণ প্রস্তুত করিতেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশ ছেঁড়া কাগজ। মাঝে মাঝে আস্ত কাগজও পাওয়া যায়। অনেক সাহিত্যখণ্ড, দানপত্র, হিসাব, খৎ, চিঠি এই উপায়ে হস্তগত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, কত সহস্র বৎসর পূর্বেকার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা ভরসা, কত বৈষয়িক বিবাদ বিসম্বাদ, দরদাম, মামলা মকদ্দমা আজ বিস্মৃত মৃতদেহ আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের দেশেও কি অনেক প্রাচীন পুঁথি নানা গোপন স্থানে পুনরাবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া নাই? কিন্তু কাহার সে দিকে দৃষ্টি আছে? যে বিদেশীরা আমাদের খনি খুঁড়িয়া সোনা তুলিতেছে, মাটি চষিয়া নব নব পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারাই পুঁথিরাশির মধ্য হইতে আমাদের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিতেছে। এবং সেইগুলিই অলসভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাদেরই কৃত তর্জমা পড়িয়া আমরা এক একজন আর্য দিগ্‌গজ হইয়া উঠিতেছি এবং মনে করিতেছি পৃথিবীতে আমাদের তুলনা কেবল আমরাই।

ক্যাথলিক্‌ সোশ্যালিজ্‌ম্‌

সাধনা ১২৯৮ মাঘ পৃ ২৪৯-২৫০

য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিষ্ট্‌ নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেঁনা বলিতেছেন, বর্তমান কালে এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত

হইয়াছে ; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে অন্যদিকে সভ্যতার সমস্ত সুখসম্পদ সাধারণের মধ্যে সমান ভাগে বাঁটিয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয় ; এক পক্ষের উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।

প্রাচীন সমাজে যখন হীনাবস্থার লোক সর্ব বিষয়েই হীনাবস্থায় ছিল তখন এ সম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই। কিন্তু আজকাল য়ুরোপে সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে আমরা সকলেই সমান রাজা কিন্তু আমাদের সমান রাজত্ব কই? তাহারা যে সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে একথা তাহারা প্রতিদিন বুঝিতেছে ; এই জন্য সমস্যা প্রতিদিন গুরুতর এবং তাহার মীমাংসাকাল উত্তরোত্তর নিকটবর্তী হইতেছে।

এতকাল এই সোশ্যালিজ্‌ম্ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিষ্ট্ পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে।

ইহাতে সোশ্যালিজ্‌মের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। রোমান্-ক্যাথলিক মণ্ডলীর অধিপতি স্বয়ং পোপ্ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসী মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা একটা লক্ষণস্বরূপে ধরা যাইতে পারে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহন্তটি য়ুরোপের নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজ্‌মের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না, তাঁহারা এমন বালুকার পরে কখনই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুইদণ্ডে বসিয়া যাইবে।

আমেরিকানের রক্তপিপাসা

সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন পৃ ৩৪৮-৩৫২

বিখ্যাত আমেরিকান্ কবি লোয়েল তাঁহার কোন কবিতায় লিখিয়াছেন,—আমেরিকার দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্যন্ত এই সমগ্র বৃহৎ জাতি রক্তের গন্ধ

ভালবাসে। একজন ইংরাজ লেখক নবেম্বর মাসের "কণ্টেম্পোরারি বিভিয়্" পত্রিকায় এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা কখন আমেরিকায় পদার্পণ করে নাই, বহি পড়িয়া আমেরিকান্ সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহারা কল্পনা করিতে পারে না আমেরিকায় জীবনের মূল্য কত যৎসামান্য, এবং সেখানকার লোকেরা খুন অপরাধকে কত তুচ্ছ মনে করে। প্রথমতঃ, সকল দেশেই যেসকল কারণে কম বেশি খুন হইয়া থাকে আমেরিকাতেও তাহা আছে। দ্বিতীয়তঃ সেখানে অধিকাংশ লোকেই অস্ত্র বহন করিয়া বেড়ায় এবং সামান্য কারণে তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কালিফর্ণিয়া বিভাগের সুপ্রীমকোর্টের এক জজ্ রেলোয়ে ষ্টেশনের ভোজনশালায় খাইতে বসিয়াছেন, আদালতের আর একটি উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গী ছিল। ইতিমধ্যে এক বারিষ্টার পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া জজের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দেন, এমন কি, তাঁহার গায়েও হাত তোলেন। অন্য কর্ম্মচারীটি তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুঁড়িয়া বারিষ্টারকে বধ করিলেন, এমন কি ; সে মরিয়া পড়িয়া গেলেও তাহাকে আর একগুলি মারিলেন। বারিষ্টারের স্ত্রী চীৎকার করিয়া গাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। ইঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মাল অনুসন্ধান করিয়া একটি পিস্তল বাহির করিলেন। জুরিরা তাহাই দেখিয়া অপরাধীকে খালাস দিল ; কারণ এই পিস্তল দিয়া জজকে খুন করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। সকলেই এই আইনের, এই বিচারের, এই কর্ম্মচারীর সতর্কতার বিস্তর প্রশংসা করিল। পুলিশের হাতেও সর্ব্বদা অস্ত্র থাকে, এবং তাহাদের দ্বারা শত শত অন্যায় খুন ঘটিয়া থাকে। নিউইয়র্ক সহরে একজন পুলিসম্যান্ খবর পাইল একজন চোর অমুক রাস্তা দিয়া পলাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল একজন লোক কোন বাড়ির সিঁড়ির উপর ঘুমাইতেছিল, গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। পুলিস্‌ম্যান্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি দৈবাৎ তাহাকে না লাগিয়া পথের অপর প্রান্তে আর একজন পথিককে সাংঘাতিক রূপে আহত করিল। অবশেষে পলাতক ধরা পড়িলে জানা গেল তাহার কোন অপরাধ ছিল না ; কেবল ভয়ে দৌড় দিয়াছিল। বিচারে স্থির হইল পুলিস্‌ম্যান তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। যে দেশের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা, পুলিসের এইরূপ ব্যবহার, সেদেশে সাধারণ লোকেরাও যে অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ সংযম অভ্যাস করে না, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। দেশের

সর্বত্রই পরিবারগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত বিবাদ, এমন কি অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্ত বচসাতেই খুনাখুনি ঘটিয়া থাকে। প্রায় মাঝে মাঝে এমন ঘটিয়া থাকে, কর্মস্থানে অথবা সভাস্থলে দুই বিপক্ষে সাক্ষাৎ হইল, কেহ কোন কথা না বলিয়া পরস্পরের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিল, একজন অথবা দুই জনেই মরিয়া পড়িয়া গেল। কেবল ছোটলোকের মধ্যে নহে, শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক ভদ্র খুনী সমাজের মধ্যে সম্মানের সহিত বাস করিতেছে; তাহারাও নিজের অপরাধের জন্ম লজ্জিত নহে, তাহাদের বন্ধু এবং সমাজও তাহাদের জন্ম লজ্জা অনুভব করে না।

আমেরিকায় বালকে, এমনকি, স্ত্রীলোকেও অনেক খুন করিয়া থাকে। লেখক রাস্তা দিয়া চলিতেছিলেন, দেখিলেন, একজন ভদ্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকের সম্মুখে আর একজন ফিট্‌ফাট্ কাপড় পরা ভদ্রলোক যেমন দাঁড়াইল, অমনি দুই এক কথার পরেই স্ত্রীলোকটি এক পিস্তল বাহির করিয়া সম্মুখবর্তী লোকটির প্রতি পরে পরে তিন চারটি গুলি চালাইয়া দিল, লোকটা রাস্তায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। লেখক খবরের কাগজ পড়িয়া জানিলেন, মৃত ব্যক্তিটি বিখ্যাত দালাল; তাহার নিকটে কোন সূত্রে স্ত্রীলোকটির টাকা পাওনা ছিল কিন্তু আইনের দ্বারা বাধ্য করিবার কোন উপায় না পাইয়া খুন করিয়া সে মনের ক্ষোভ মিটায়। মেয়েটির সাহস এবং তাহার চমৎকার লক্ষ্য সম্বন্ধে সকলেই ধন্ম ধন্ম করিতেছে। আমেরিকায় এরূপ স্ত্রীলোকের বিশেষ সমাদর আছে। পুরুষেরা প্রায়ই বলিয়া থাকে, যে রমণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সয়তানের অংশ নাই, তাহার এক কড়াও মূল্য নাই।

ইহা ছাড়া বিনা দোষে কালা আদ্‌মি খুনের যে দুটা চারটা দৃষ্টান্ত লেখক প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের পাঠকদের জন্ম তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

লেখক আমেরিকান্ জাতীয় চরিত্রগত এই বর্বরতার যে একটি প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ অবধানযোগ্য। তিনি বলেন, বহুকাল পর্যন্ত আমেরিকায় যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়াছে। দাসদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচারে অভ্যস্ত হইলে স্তায়াস্তায় বোধ হ্রাস হইয়া মনুষ্যত্বের সংযম দূর হয়। অবশেষে চরিত্রের সেই উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের নিজেরই সর্বনাশ সাধন করিতে থাকে।

আমাদের বিবেচনায় লেখক একটি কারণের উল্লেখ করেন নাই। এককালে আমেরিকায় আদিম অধিবাসীদের প্রতি নির্দয় উপদ্রবও যে এই চরিত্রগত পশুত্বের

একটি মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে অপ্রতিহত পশুবলচালনার স্থান সেইখানেই মানুষের ভয়ানক বিপদ। স্বার্থ অথবা আত্মগৌরবের অনুরোধে নিরুপায়ের প্রতি আপনার কর্তৃত্ব প্রচার করিতে গিয়া নিজেরই অমূল্যধন স্বাধীনতাপ্রিয়তা ম্লান হইয়া আসে। ভারতশাসন ভারত-বাসীদের পক্ষে যেমনই হউক ইংরাজের পক্ষে সুশিক্ষার কারণ নহে। আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে একটি অনুরাগহীন অবহেলার ভাব সহজেই উদয় হইতেছে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের উচ্চ আদর্শ অল্পে অল্পে অবনত হইতেছে সন্দেহ নাই। ফিট্‌জেম্‌স্‌ স্টীফ্‌ন্‌, সার লেপেল্‌ গ্রিফিন্‌ প্রভৃতি অনেক অ্যাঙ্গলোইণ্ডিয়ান্‌ লেখকের রচনায় একপ্রকার কঠিন নিষ্ঠুরতা, একটা নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ দেখা যায়, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভাবতবর্ষে অসীম ক্ষমতামদিরার স্বাদ পাইয়া তাঁহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা বিষ আছে; যখন এক জাতি আর এক জাতিকে আহার করিতে বসে তখন ভক্ষ্য জাতি মরে এবং ভক্ষক জাতির শরীরেও বিষ প্রবেশ করে। আমেরিকানদেরও রক্তের মধ্যে বিষ গেছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌

সাধনা ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৮৭-৯১

বিলাতী খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের দ্বারা সেখানে আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব সোশ্যালিজ্‌ম্‌ মতটা কি তাহা আলোচনা কবিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।

সোশ্যালিষ্টদিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাহা নহে, এই কারণে, তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত সমালোচনা সহজসাধ্য নহে। আমরা এস্থলে কেবল বেল্‌ফর্ট ব্যাক্‌স সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত সংকলন করিয়া দিতেছি।

কিছুকাল পূর্বে ইংলণ্ডে যাঁহারা কোন কোন প্রচলিত নিয়ম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের বর্তমান মতাবলম্বীদিগকে "লিবারাল্‌" কহিয়া থাকে। এই লিবারাল্‌দিগের সহিত সোশ্যালিষ্টদিগের কোথায় প্রভেদ ব্যাক্‌স সাহেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল, তাহারই

বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই "লিবারালিজ্‌ম্‌" বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাধীন অর্থসঞ্চয় এবং সম্পত্তি উপার্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারালদের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে।

কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজ্‌ম্‌ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক্‌ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজম্‌ ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কলের দ্বারা দুটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। এক কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক, কর্মচ্যুত প্রাচীন কারিকরের দল।

একসময় ছিল, যখন কারিকরের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপরে পণ্য নির্ভর করিত। তখন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে কারিকর অনেকটা নিজের গুমরে থাকিতে পারিত।

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন এবং বিতরিত হওয়ায় কারিকরের নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধনীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সোশ্যালিষ্টরা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোন বিশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্‌, নয় মর' সেও তদ্রূপ। যে নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমি সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে, তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভাল হইবে। দৃষ্টান্ত। মনে কর,

সোশ্যালিষ্ট বিধানমতে কোন এক লোকের উপর সরকারী রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমশলা যোগ করিয়া তাহার কোন লাভ নাই—কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না,—সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহাব কোন লাভ নাই এবং ভাল রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কাবণ হইবে তখন ভাল রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত সস্তায় কাজ করিতে পারে—অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিষটা ভাল কবিবার দিকে তাহাব কোন দৃষ্টি থাকে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতাব অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব নির্ধনকে স্বাধীনতা দিবাব জন্য সোশ্যালিষ্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণেব মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক—কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্বসাধাবণের স্বাধীনতাই সোশ্যালিজমের উদ্দেশ্য। এখন, কথা উঠিতে পারে যে, উদ্দেশ্য যাহাই হউক ফলে বিপরীত হইবে। কারণ, এখন স্বার্থের তাড়নায় লোকে খাটিতেছে এবং সমাজেব কাজ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু ধনের প্রলোভন চলিয়া গেলে সমাজেব তাডনায় লোককে কাজ করিতেই হইবে, সে পীডন কম নহে। সকলেই ইচ্ছামত আলস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখন সমাজ টিঁকিতে পারে না, অতএব একটা কোনরূপ পীড়নেব প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে কোনরূপ পীড়ন ব্যতীত সংসার চলে না, এখনকার বিধানমতে সমাজে অন্ধ পীড়নের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সোশ্যালিজমের নিয়মে সমাজে যুক্তি ও বিবেচনা-সঙ্গত যথাবশ্যক সুসংযত পীড়ন প্রচলিত হইবে। এবং স্বার্থের সংস্রব না থাকাতে সে পীড়ন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্যাক্স সাহেব বলেন, আদিম কালে সাধারণের মধ্যে ধনের বিভাগ ছিল, সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে তাহার ব্যত্যয় হয়, ক্রমে সকলের স্ব স্ব প্রধান

হইবার বাসনা জন্মে, প্রধান হইতে চেষ্টা করিলেই স্বভাবত দুই বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হইয়া পার্থক্যের জন্ম হইতে থাকে। পূর্বে কেবলমাত্র বহির্জাতির সহিত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এখন প্রত্যেকে বড় হইতে চেষ্টা করিয়া ঘরের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

সোশ্যালিজ্‌ম্ সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব সমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন শূন্যবাদ

সাধনা ১২৯৯ অগ্রহায়ণ পৃ ৭৭-৭৯

মায়ার হস্ত এড়াইবার উদ্দেশে কিরূপ তর্কের মায়াপাশ বিস্তার করিতে হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের কৌতূহলজনক বোধ হইতে পারে।

গ্রন্থখানির নাম মধ্যমকবৃত্তি। ইহা "বিনয় সূত্র" নামক কোন এক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্য। ভাষ্যকারের নাম চন্দ্রকীর্তি আচার্য।

ইনি একজন শূন্যবাদী। কিছু যে নাই ইহা প্রমাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কি করিয়া প্রমাণ করিতেছেন দেখা যাউক।

প্রথমে প্রতিপক্ষ বলিলেন—দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ রসন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয় আমাদের গোচর হইয়া থাকে।

টীকাকার বলিতেছেন, দর্শন যে একটা স্বাভাবিক শক্তি উপরিউক্ত বচনে এই কথা মানিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। দর্শনশক্তি যে আছে একথা কে বলিল? কারণ,

স্বমাত্মানং দর্শনং হিতত্ত্বমেব ন পশ্যতি।
ন পশ্যতি যদাত্মানং কথং দ্রক্ষ্যতি তৎ পরান্।

অর্থাৎ চক্ষু আপনার তত্ত্ব আপনি দেখিতে পায় না, অতএব যে আপনাকে দেখিতে পায় না সে অন্যকে কি করিয়া দেখিবে?

প্রমাণ হইয়া গেল চক্ষু দেখিতে পায় না। "তস্মান্নাস্তি দর্শনং।"

কিন্তু প্রতিবাদী বলিতে পারেন—

"যদ্যপি স্বাত্মানং দর্শনং ন পশ্যতি, তথাপি অগ্নিবৎ পরান্ দ্রক্ষ্যতি। তথাহি অগ্নিঃ পরাত্মানমেব দহতি ন স্বাত্মানং এবং দর্শনং পরানেব দ্রক্ষ্যতি ন স্বাত্মানং ইতি।

অর্থাৎ অগ্নি যেমন পরকে দহন করে কিন্তু আপনি দগ্ধ হয় না, তেমনি চক্ষু অন্যকে দেখে নিজেকে দেখিতে পায় না—ইহা অসম্ভব নহে।

উত্তরদাতা বলেন—এতদপ্যযুক্তং। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ,

ন পর্য্যাপ্তোহগ্নিদৃষ্টান্তো দর্শনস্য প্রসিদ্ধয়ে।
সদর্শনঃ স প্রত্যুক্তো গম্যমানগতাগতৈঃ।

অর্থাৎ অগ্নিদৃষ্টান্ত দর্শনপ্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। কারণ, গম্যমানগতাগতের দ্বারা দহনশক্তি এবং দর্শনশক্তি উভয়ই অপ্রমাণ হইতেছে।

"গম্যমানগতাগত" বলিতে কি বুঝায় সেটা একটু মনোযোগ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

"গতং ন গম্যতে নাগতং ন গম্যমানং এবং অগ্নিনাপি দগ্ধং ন দহ্যতে নাদগ্ধং দহ্যতে ইত্যাদিনা সমং বাচ্যং। যথা চ ন গতং নাগতং ন গম্যমানং গম্যতে এবং ন দৃষ্টং দৃশ্যতে তাবদদৃষ্টং নৈব দৃশ্যতে। দৃষ্টাদৃষ্টবিনির্মুক্তং দৃশ্যমানং ন দৃশ্যতে।"

অর্থাৎ যাহা গত তাহা যাইতে পারে না, যাহা অগত তাহাও যাইতে পারে না এবং যাহা গতও নহে অগতও নহে কেবলমাত্র গম্যমান, তাহারই বা যাওয়া হইল কৈ? তেমনি, যাহা দগ্ধ তাহার দহন হয় না, যাহা অদগ্ধ তাহারও দহন হয় না, যাহা দহ্যমান তাহারই বা দাহ হইল কৈ? পুনশ্চ যাহা দৃষ্ট তাহা আর দেখা হয় না, যাহা অদৃষ্ট তাহাও দেখা হয় না, যাহা দৃষ্টও নহে অদৃষ্টও নহে কেবল দৃশ্যমান তাহাও দেখা হইতে পারে না। ভাবটা এই যাহা হইয়া গেছে তাহা ত চুকিয়াই গেছে, যাহা হয় নাই তাহার কথা ছাড়িয়াই দাও, যাহা হইতেছে মাত্র তাহাকে হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

"এবং দর্শনং পশ্যতে তাবদিত্যাদিনা অগ্নিদৃষ্টান্তেন সহ গম্যমানগতাগতৈর্যস্মাৎ সমং দূষণং অতোহগ্নিবদ্দর্শনসিদ্ধিরিতি ন যুজ্যতে।"

তবেই ত এক "গম্যমানগতাগতে"র দ্বারা চক্ষুই বল অগ্নিই বল সমস্ত অসিদ্ধ হইয়া গেল।

সিদ্ধ হইল কি ?

"ততশ্চ সিদ্ধমেতৎ স্বাত্মবদ্দর্শনং পরানপি ন পশ্যতীতি।" অর্থাৎ চক্ষু যেমন আপনাকে দেখিতে পায় না তেমনি পরকেও দেখিতে পায়না।

পরিবারাশ্রম

সাধনা ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৫৮-৬১

ফ্রান্সে ওয়াজ্ নদীর ধারে গীজ্ নামক একটি ক্ষুদ্র সহর আছে। সেখানে আজ চৌদ্দ বৎসর হইল গোর্ড্যাঁ সাহেব নূতন ধরণের এক বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন, পরিবারাশ্রম সভা।

লোকটি তালাচাবি-নির্মাতা একটি কর্মকারের পুত্র। নিজের যত্নে ধন উপার্জন করিয়া, তিনি সমাজ হইতে কিসে দৈন্য দুঃখ দূর হয় এবং কি উপায়ে শ্রমজীবী লোকেরা রোগ, বার্ধক্য প্রভৃতি অনিবার্য কারণজনিত অর্থক্লেশ হইতে রক্ষিত হইতে পারে সেই চিন্তা ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার সেই আমরণ চেষ্টায় ফল এই পারিবারিক সমাজ। ইহা একটি কারখানা। এখানে প্রধানতঃ লোহার উনান, অগ্নিকুণ্ড, ইমারৎ প্রস্তুতের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

এখানকার কর্মপ্রণালী অন্যান্য কারখানা হইতে অনেক স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে এখানকার নিয়ম এই, কারবারের সুদ খরচা বাদে মোট যে লাভ হয়, তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ অংশ বুদ্ধি অনুসারে এবং পঁচাত্তর অংশ পরিশ্রম অনুসারে কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত তাহাদের যথানিয়মিত বেতন আছে। ত্রিশ বৎসর কাজের পর পেন্‌সন্ নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ কারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে পনেরো বৎসরের পরেই একটা মাসহারার অধিকারী হওয়া যায়। দুঃখদুর্দিনের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এবং এই সভাভুক্ত যে কেহ ইচ্ছা করিলে সন্তানদিগকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সরকারী ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গোর্ড্যাঁ সাহেবের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উপার্জিত ধনের অর্ধেক অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পৌণ্ড এই কারখানায় দান করিয়া যান। শর্ত এই থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সামান্য অভাবসকল অনুভব না করিয়া কালযাপন করিতে পারে, এমন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা, এমনকি, সর্বপ্রকার অশক্ত লোকদিগের জন্য ইন্সিউরেন্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আশ্রমবাসীদের আহার্য যোগাইতে হইবে।

তাহাদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল আমোদ আহ্লাদের আবশ্যক তাহার উপায় করিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে পর্যন্ত না কার্যে নিযুক্ত হয় সে পর্যন্ত তাহাদিগকে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে।

এক কথায়, এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে কারখানার শ্রমজীবীরা সুখে একত্র বাস করিতে পারে, যাহাতে কারখানা ও ব্যবসায়ের লাভ কর্মকারদের মধ্যে ন্যায়নিয়মে ভাগ হইতে পাবে; এবং যাহাতে ক্রমে ক্রমে এই সমাজের সমুদয় সম্পত্তি অল্পে অল্পে তাহাদেরই হস্তগত হয়।

ছয় কারণে সভ্যগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন। (১) পানদোষ; (২) বাসস্থানের বায়ু দূষিত করা, (৩) গর্হিত আচরণ; (৪) শ্রমবিমুখতা; (৫) নিয়মে অবাধ্যতা অথবা উপদ্রব করা; (৬) সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে শৈথিল্যাচরণ।

কেহ না মনে করেন, এই সমাজে পদে পদে নিয়মের কড়াক্কর। প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ফর্টনাইটলি রিভিয়ু পত্রে যে লেখক এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, সকলেই বেশ প্রফুল্লমুখে সন্তুষ্টভাবে কাজকর্মে প্রবৃত্ত আছে। স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব পরিবারের জন্য কাপড় কাচিতেছে, কাজ করিতে করিতে গুন্‌গুন্‌স্বরে গান ও গল্প করিতেছে, কেহ বা বাগানে মধ্যাহ্নে রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছে। ছেলেদের থাকিবার ঘর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। সাধারারণের জন্য রুটি তৈয়ারির ঘর, কসাইখানা, সন্তরণ-শিক্ষার উপযোগী স্নানগৃহ, খেলা ও আমোদের জায়গা, নাট্যশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে। ঘরদ্বার সমস্তই বহুযত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এ সমাজের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, ধর্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকিবে।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার সহিত এই পরিবারাশ্রমের ঐক্য নিঃসন্দেহ পাঠকদের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পরিবারতন্ত্রের যে সকল কুপ্রথা হইতে সমাজে বিস্তর অমঙ্গলের উদ্ভব হয় সেগুলি উক্ত বাণিজ্য-সমাজে নাই।

প্রথমতঃ সকলকেই কাজ করিতে হয় ; এবং প্রত্যেকে আপন কার্য ও যোগ্যতা অনুসারেই অংশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম ও কর্তব্যপালন সম্বন্ধে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়তঃ একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে একজনের চরিত্র দূষিত হইলে তাহার দৃষ্টান্ত ও ব্যবহারে সমস্ত পরিবারের গুরুতর অহিত ও অসুখের কাবণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পরিবারাশ্রমেব সভ্যগণ চরিত্রদোষ ও গর্হিতাচরণের জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য। এমনকি আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশতঃ বাসস্থানেব স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। এক কথায়, ইহাতে একত্রবাসের সমুদয় সুবিধা রক্ষা করিয়া অসুবিধাগুলি দূর করা হইয়াছে।

উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য

সাধনা ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৬১-৬৩

উদয়াস্তের সময় দিক্‌সীমান্তে চন্দ্র সূর্যকে কেন বড দেখিতে হয় ইহাই লইয়া প্রথম বৎসরের সাধনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা চলে। সাধনার কোন পাঠক লিখিয়া পাঠান, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্ বশতই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে প্রকৃটব ও র‍্যানিয়ার্ড সাহেবের রচিত 'ওল্‌ড্ অ্যাণ্ড নিয়ু অ্যাসট্রনমি" নামক গ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে আমরা তাহার সাব সংকলন করিয়া দিলাম।

প্রক্‌টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্ বশতঃ সূর্যের দৃশ্যমান পরিধি লম্বভাগে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাগে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।

কি কি কারণবশতঃ এরূপ ঘটে তাহাব বিস্তারিত বিবরণ অনেক পাঠকের নিকট জটিল ও বিরক্তিজনক হইবে জানিয়া আমরা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ আমাদের বর্তমান অবলম্বনীয় গ্রন্থের ২৪৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

যাহা হউক, বায়ুর রিফ্রাক্‌শনে চন্দ্রসূর্যমণ্ডল ছোট দেখিতে হয়—তবে তাহাদিগকে বড় বলিয়া ভ্রম হয় কেন ?

প্রক্‌টর সাহেব বলেন, আকাশ আমাদের চক্ষে একটি গোলাকার মণ্ডপরূপে দেখা দেয়। আমাদের মাথার উপরে এই মণ্ডপ যতটা দূর মনে হয়, নিম্নে দিগন্তের দিকে ইহার সীমা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি দূরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, সাধারণতঃ আকাশের উচ্চতা পরিমাপের সামগ্রী বড়

বেশি নাই. কিন্তু যখন দেখি, বাড়ি ঘর, লোকালয়, শস্যক্ষেত নদী অরণ্য পর্বত অতিক্রম করিয়াও আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে তখন সেই দিকে তাহার দূরত্ব নির্দেশ কবিবার অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এইরূপে চিরাভ্যাসক্রমে অজ্ঞানতঃ দিগন্তবর্তী আকাশকে উর্ধ্বাকাশের অপেক্ষা আমরা অনেক দূরস্থ বলিয়া মনে করি।

অতএব চন্দ্র সূর্যকে যখন উদয়াস্তকালে দিগন্তসংলগ্ন দেখি তখন উক্ত সংস্কাব-বশতঃ তাহাকে অপেক্ষাকৃত বহুদূরবর্তী বলিয়া জ্ঞান হয়, এই চক্ষে তাহার পরিধি যতটা দেখা যায় মনে মনে তদপেক্ষা তাহাকে বড করিয়া লই।

ইহাব অনুকূলে একটি পবীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে। সাদা কাগজে খুব বড় একটি কালো অক্ষর আঁকিয়া তাহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাক। অবশেষে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু যখন পরিশ্রান্ত হইয়া যাইবে, তখন অক্ষর হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া যদি সেই কাগজের সাদা অংশে দৃষ্টিপাত কর, তবে সেখানেও সেই অক্ষবেব অনুরূপ একটা সাদা অক্ষর দেখিতে পাইবে কারণ, বহুক্ষণ চাহিয়া থাকায় চক্ষুতারকায় উক্ত অক্ষর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অক্ষরের দিকে দীর্ঘকাল চাহিয়া যদি সহসা দূরেব দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, তবে অতিশয় বৃহদাকারের একটি অক্ষর দেখিতে পাইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কাগজে লিখিত অক্ষরের অপেক্ষা তাহা কখনই বৃহৎ নহে, কারণ, ঠিক সেই অক্ষঃটিই চক্ষুতারকায় অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু দেয়ালের দূরত্বের সহিত গুণ করিয়া লইয়া, আমরা চিরসংস্কার অনুসারে তাহাকে মনে মনে বাড়াইয়া লই।

অনেক সময় কুয়াসার ভিতব দিয়া চন্দ্র সূর্যকে ঐ একই কারণে, তাহার যথার্থ দৃশ্যমান আয়তনের অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়। কারণ, দূরের জিনিষ ঝাপ্‌সা হয়, এইজন্য, ঝাপসা জিনিসকে বেশি দূরেব বলিয়া ভ্রম হয়। যত বেশি দূর মনে হইবে, আয়তনেও তদনুসারে বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। লেখক বলেন, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুয়াশার ভিতর দিয়া একটা জাহাজ বিসদৃশ বৃহৎ দেখায়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা তুলনা করিয়া পরিমাপ করিলে দেখা যায়, কুয়াশামুক্ত অবস্থার সহিত তাহার আয়তনের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

যথারীতি পরিমাপের দ্বারা দিগন্তবিলম্বী চন্দ্র মধ্যাকাশগত চন্দ্রের অপেক্ষা কিছুমাত্র বড প্রমাণ হয় নাই।

অভ্যাসজনিত পরিবর্তন

সাধনা ১৩০০ আষাঢ় পৃ ১৬৯-১৭২

অভ্যাসের দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। হলধারী চাষা এবং লেখনীধারী ভদ্রলোকের হাতের অনেক প্রভেদ। কৃত্রিম উপায়ে চীনরমণীর পা কিরূপ ক্ষুদ্র ও বিকৃত হইয়া যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু এইরূপ অভ্যাস ও কৃত্রিমকারণজনিত পরিবর্তন সকল পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কিনা ইহা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

হার্বার্ট্ স্পেন্সর বলেন যে, একথা না মানিলে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু জর্মান পণ্ডিত বাইস্‌মান্ বহুল যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভ্যাসজনিত নূতনসাধিত অঙ্গবৈচিত্র্য সন্ততি পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস্ সাহেবও বাইস্‌মানের পক্ষ সমর্থন করেন।

তিনি বলেন, ভাল জাতের যুবক ঘোড়া অথবা কুকুর যদি কোন কারণে পঙ্গু অথবা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, তবে পশুব্যবসায়ীরা তাহাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেয়। এবং তাহার সন্ততিবর্গ তাহার পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন হয় না।

সাধারণের মধ্যেও একটা সংস্কার আছে যে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীশ্রেণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষদিগের অভ্যাসপ্রসূত বিশেষ কার্যনৈপুণ্য উত্তরবংশীয়েরা বিনা শিক্ষাতেও প্রাপ্ত হয়। ওয়ালেস্ বলেন ইহা ভ্রম। কারণ যদি ইহা সত্য হইত তবে পিতার অধিক বয়সের সন্তান অধিকতর স্বাভাবিক নিপুণতা লাভ করিত। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ হইত। কিন্তু তৎপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানেরা প্রতিভাসম্পন্ন হয় না, বরং তাহার বিপরীত হয় এরূপ দৃষ্টান্তই অধিক পাওয়া যায়। তাহা যদি না হইত তবে জগতে শিল্পনৈপুণ্য ও প্রতিভা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াই চলিত।

কিন্তু কোন কোন লেখক বলেন যে, বিশেষ শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে যে বিশেষ নূতন প্রত্যঙ্গের উদ্ভব দেখা যায় তাহা বহুকালের ক্রমশঃ অভ্যাসজাত না মনে করিলে অন্য কারণ পাওয়া যায় না। যেমন শৃঙ্গ। যে সমস্ত জন্তু মাথা দিয়া

ঢুঁ মারিত তাহাদেরই কপালের চামড়া পুরু হইয়াছিল; সেই পরিবর্তন সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যাসে বৃদ্ধি পাইয়া বিচিত্রাকার শৃঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

ওয়ালেস্ বলেন একথার কোন প্রমাণ নাই। ডারুয়িনের গ্রন্থে দেখা যায় কোন কোন দেশে ঘোড়ার কপালে ক্ষুদ্র শৃঙ্গের মত উচ্চতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার প্রাচীন বংশের মধ্যে কোন জাতেরই শিং দেখা যায় নাই। যদি শিং থাকিত তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুসারে এমন একটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বিলুপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। অতএব এই ঘোড়ার ছোট শিং নূতন উদ্ভব।

শজারুর কাঁটা, পাখীর পালক এ সমস্ত যে, বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এমন বলা যায় না।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে আমাদের শরীরের সর্বাংশে স্পর্শশক্তি সমান নহে। আমাদের পিঠের মাঝখানে যে জিনিস অনুভব করিতে পারি না, আমাদের আঙুলের ডগায় তাহা অনায়াসে অনুভব হয়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন ইহার কারণ, প্রধানতঃ অঙ্গুলি দ্বারা আমরা সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেখি বলিয়া অভ্যাসে তাহার স্পর্শশক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই শক্তি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পৃষ্ঠে তাহার বিপরীত।

ওয়ালেস্ বলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ইহার কারণ। স্পর্শশক্তির উপরে আমাদের জীবন-রক্ষার অনেকটা নির্ভর করিতেছে। শরীরের যে যে স্থানে আঘাত লাগিলে জীবনের অধিক ক্ষতি করে সেই সেই স্থানে স্পর্শশক্তি সেই পরিমাণে অধিক। চক্ষুর স্পর্শশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, অথচ একথা কেহ বলিতে পারে না যে, চক্ষু দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করা আমাদের সর্বাপেক্ষা অভ্যস্থ। কিন্তু চক্ষু গেলে জীবন ধারণ করা দুরূহ; অতএব যে সকল প্রাণীর চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শক্ষম, চক্ষে তিলমাত্র আঘাত লাগিলেই জানিতে পারে ও চক্ষুরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হইতে পারে তাহারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকিয়া যায়। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে।

অতএব ওয়ালেসের মতে অভিব্যক্তির মধ্যে অভ্যাসের কোন কার্যকারিতা নাই। প্রাকৃতিক নির্বাচনই তাহার প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ যে সন্তানগণ কোন কারণে অন্যদের অপেক্ষা একটু অতিরিক্ত সুবিধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া টিকিয়া যায়, অন্যেরা তাহাদের সহিত পারিয়া উঠে না, সুতরাং মারা পড়ে। এইরূপে এই নূতন সুবিধা ও তৎসম্পন্ন জীব স্থায়ী হয়।

শৃঙ্গহীন হরিণদের মধ্যে যদি নিগূঢ় কারণে একটা শৃঙ্গী হরিণ জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার শিংয়ের জোরে সেই বেশি আহার এবং মনোনীত হরিণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে। এবং তাহার বংশে যতই শৃঙ্গী হরিণের জন্ম হইবে ততই শৃঙ্গহীন হরিণের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

অতএব বর্তমান অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সমজাত সুবিধাগুলি জীব-রাজ্যে স্থায়ী হয়, অভ্যাসজাত সুবিধাগুলি নহে।

মানুষসৃষ্টি

সাধনা ১৩০০ ভাদ্র পৃ ৩৫৩-৩৫৭

জুনমাসের ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রিকায় বিখ্যাত পর্যটক স্ট্যান্‌লি সাহেব মধ্য-আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি গল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মানুষসৃষ্টির গল্প পাঠকদের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে।

প্রাচীনকালে এক সময় পৃথিবীতে কোন জীবজন্তু ছিল না, কেবল একটি পুষ্করিণীতে একটি বড়গোছের ব্যাং ছিল। আর আকাশে ছিল চাঁদ। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিত।

একদিন চাঁদ বলিল, দেখ ব্যাং, মনে করিতেছি পৃথিবীর ফলশস্য ভোগ করিবার জন্য আমি একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী নির্মাণ করিব।

ব্যাং কহিল, আমি পৃথিবীতে থাকি, পৃথিবীর প্রাণী আমিই ভালরূপ গড়িতে পারিব, অতএব সে ভার আমি লইলাম।

চাঁদ কহিল, আমি যাহাদের সৃজন করিব তাহারা অমর হইবে, তোমার সে শক্তি নাই।

ব্যাং কহিল, ভাই তোমার আকাশ লইয়া তুমি থাক না, এ পৃথিবীর জীবসৃষ্টি আমারই কর্তব্য কার্য।

অতঃপর ব্যাং ভাবাবেশে ক্রমশ স্ফীত হইয়া একজোড়া পূর্ণতা-প্রাপ্ত নর-নারীকে জন্মদান করিল।

চাঁদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এ কি কাণ্ড করিয়াছ? এই যে দুটো জীবকে জন্ম দিয়াছ ইহাদের না আছে বুদ্ধি না আছে আত্মরক্ষার ক্ষমতা না আছে দীর্ঘ জীবন। বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া আমি যতটা পারি সংশোধন করিয়া লইব। উহাদিগকে কিছু বুদ্ধি দিব এবং আয়ুও বাড়াইয়া দিব কিন্তু তোমাকে আর রাখিতেছি না।

এই বলিয়া অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া ব্যাংটাকে চাঁদ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অতঃপর ভীত লুক্কায়িত মানুষ দুটোকে ধরিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া ইতস্ততঃ টিপিয়া-টুপিয়া তাহাদের শরীরের গড়ন কতকটা দুরস্ত করিয়া লইল। এবং পুরুষের নাম দিল বাটেটা এবং মেয়ের নাম দিল হানা। অবশেষে তাহাদিগেকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখ এই তৃণলতা তরুগুল্ম সবই তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য। তোমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছি অতএব ইহার মধ্য হইতে তোমরা নিজেরা ভালমন্দ বাছিয়া লইবে। এই লও একটি কুঠার। এবং তোমাদের জন্য আমি এই আগুন করিয়া দিলাম ইহাকে রক্ষা করিবে এবং কেমন করিয়া আহারের পাত্র গড়িতে হয় দেখাইয়া দিতেছি, শিখিয়া লও।

এই শিক্ষা দিয়া এবং রাঁধিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া চাঁদ আকাশে চড়িলেন এবং প্রসন্ন হাস্যের সহিত ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন এই নরনারী চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুকোটর দেখিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল। মাসখানেকের মধ্যেই হানা একটি যমজ পুত্রকন্যাকে জন্ম দিল। বাটেটা বড় খুসী হইয়া তাহার স্ত্রীর সেবা করিতে লাগিল এবং তাহার জন্য উত্তম সুখাদ্য সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল কিন্তু কিছুই প্রসূতির রুচিকর বোধহয় না। তখন চাঁদের দিকে হাত তুলিয়া কহিল —হে চাঁদ, আমি ত আমার স্ত্রীর পছন্দমত কোন খাদ্যই খুঁজিয়া পাই না একটা উপায় বলিয়া দাও।

চাঁদ নামিয়া আসিয়া বাটেটার হাতে একছড়া কলা দিয়া কহিল, দেখ দেখি, ইহার গন্ধটা কেমন লাগে?

বাটেটা কহিল, বাঃ অতি চমৎকার!

তখন চাঁদ একটির খোসা ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, খাইয়া দেখ দেখি কেমন বোধ হয়?

সে খাইয়া মহা খুসী হইয়া স্ত্রীর জন্য লইয়া গেল। স্ত্রীও বড় পরিতোষ লাভ করিল। কহিল, জিনিসটি উত্তম কিন্তু ইহাতে শরীরে বল পাইতেছি না।

বাটেটা চাঁদকে সে কথা জানাইলে চাঁদ কহিল, দেখ দেখি ঐ কি যায়।

বাটেটা কহিল, ও ত মহিষ।

চাঁদ বলিল—ঠিক বলিয়াছ। উহার পশ্চাতে কি যায়?

বাটেটা কহিল—ছাগল।

চাঁদ কহিল - অতি উত্তম। তাহার পরে?

বাটেটা—ভেড়া।

চাঁদ—ভেড়াই বটে। এখন আকাশে কি উড়িতেছে দেখ দেখি।

বাটেটা—মুরগী এবং পায়রা।

চাঁদ কহিল—বেশ বলিয়াছ। তা, এই সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া গেল। ইহারই মাংস স্ত্রীকে রাঁধিয়া খাওয়াও।

এইভাবে সময় যায়। আদি দম্পতি হঠাৎ একদিন সকালে উঠিয়া দেখে মস্ত একটা আগুনের চাকার মত আকাশে উঠিয়া আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে। হানা কহিল, বাটেটা এ কি হইল?

বাটেটা কহিল, চাঁদকে না জিজ্ঞাসা করিয়া ত বলিতে পারি না। এই বলিয়া চাঁদকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। একটা বজ্রতুল্য স্বর আকাশ হইতে কহিল - রোস, আগে এই নূতন আলোকটা নিবিয়া যাক্ তারপরে কথাবার্তা হইবে।

অন্ধকার হইলে চাঁদ উঠিয়া কহিল, এখন হইতে সময় দিন এবং রাত্রে ভাগ হইবে। সকালে সূর্য এবং রাত্রে আমি এবং আমার সন্তান নক্ষত্রগণ আলো দিবে। এ নিয়মের কোন কালে লঙ্ঘন হইবে না। এবং যেহেতু তোমরা সর্বপ্রথম প্রাণী তোমাদের সন্তানেরা জীবরাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমাদিগকে আমি পরিপূর্ণতা এবং অনন্ত জীবন দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ব্যাংটার জন্মদোষ তোমাদের শরীরে রহিয়া গেছে, অতএব মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। সবশেষে কহিল, যে পর্যন্ত তুমি এবং হানা পৃথিবীতে থাকিবে আমি আবশ্যকমত তোমাদের সাহায্য ও পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিব না—কিন্তু তোমাদের অবর্তমানে মানুষের সহিত আলাপ পরিচয় আর চলিবে না। অতএব তোমরা যাহা কিছু শিখিবে ছেলেদের শিখাইয়া দিয়ো।

মানুষের উৎপত্তির এই ইতিহাস। ডারুয়িনের এভোল্যুশন্ থিওরি যে বহুপূর্বে আফ্রিকা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই ভেক হইতে মনুষ্যোৎপত্তির গল্প তাহার প্রমাণ, কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যে এখনো তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যে এই অকাট্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের দর্পচূর্ণ করে।

ওলাউঠার বিস্তার

সাধনা ১৩০০ ভাদ্র পৃ ৩৫৭-৩৬০

ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্বিজয় করিতে

বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্গা, অবশেষে আমেরিকার সেণ্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই রোগ জল, খাদ্য অথবা বায়ু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করে এখনও তাহা নিঃসংশয়রূপে স্থির হয় নাই। তবে জলটাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহন তাহার অনেকগুলা প্রমাণ পাওয়া যায়। মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেখানে সাধারণতঃ টেম্‌স্ নদীর জল ব্যবহার হইত। সহরের নর্দমা এই নদীতে গিয়া মিলিত। সেই সময় দেখা গিয়াছে, নদীর জল সহরের যত নীচে হইতে লওয়া হইয়াছে মৃত্যুসংখ্যা ততই বাড়িয়াছে এবং সহরের সংস্রবে অপেক্ষাকৃত অল্পদূষিত অংশের জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যাও তত অল্প হইয়াছে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে ওলাউঠার মড়ক হয় তখনও এসম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লণ্ডনে যে দুই জলের কলওয়ালা জল যোগাইয়া থাকে তন্মধ্যে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ ওয়াটার কম্পানি ব্যাটার্সি নামক স্থানের পয়ঃপ্রণালীর নিকটবর্তী টেমস্ হইতে জল লইত। এবং ল্যাম্বেথ্‌ওয়াটার কম্পানি নদীর অনেক উপর হইতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল আহরণ করিত। লণ্ডনের স্থানে স্থানে এই দুই কম্পানির পাইপ সংলগ্নভাবে দুই পাশাপাশি বাড়িতে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সাউথ্‌ওয়ার্ক কম্পানির জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার করা এগারো জনের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সোহোপল্লীর গোল্ডন্ স্কোয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র অংশে ওলাউঠা দেখা দেয়। তাহার নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসে তাঁহারা দেখিলেন সেখানে পল্লীর লোক একটি বিশেষ কূপের জল পান করিয়া থাকে। এবং সন্ধানের দ্বারা জানিলেন, মড়কের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্কালে স্থানীয় একটি মল-কূপ কিরূপে জীর্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জনাপ্রবাহ এই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে এই জলাশয় অবস্থিত সেই রাস্তার উপরেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল, সেখানকার কর্মচারীরা উক্ত জল পান করিত না এবং তাহাদের মধ্যে একজনেরও ওলাউঠা হয় নাই।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডোরাণ্ডা নামক একটি কুলিজাহাজ ইংলণ্ড ছাড়িয়া মাস-খানেক পরে যাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল। সেখানে কোন মাল বোঝাই হয় নাই, কেবল ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য ফল এবং শাকসবজি লওয়া হয়। সমস্ত পথ ডিষ্টিল্-করা জল ব্যবহার হইয়াছে এবং কোন বন্দর হইতে জল লওয়া হয় নাই। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজে ওলাউঠা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের কেহ রোগগ্রস্ত হয় নাই। তাহারাই ফল ও উদ্ভিজ্জ খাইয়াছিল এবং বন্দরে নামিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিল। জাহাজের ডেক্ সাফ করিবার জন্য তীর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বালুকা আনা হইয়াছিল। সেই বালুকা জাহাজের কোন কোন বিভাগে দুই দিন ব্যবহার করিয়া দুর্গন্ধবোধে ফেলিয়া দেওয়া হইয়া হইয়াছিল; জাহাজের লোকের বিশ্বাস সেই বালুকার মধ্যেই ওলাউঠার বীজ ছিল। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এস্থলে জলের দোষ দেওয়া যায় না। বালুকা হইতে বিষ নিশ্বাসযোগে শরীরে গৃহীত হইয়াছে এরূপ অনুমান করিতে হয়।

"ইংলণ্ড" নামক স্টীমার ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুল হইতে যাত্রা করিয়া হ্যালিফ্যাক্‌সে পৌঁছায়। পথের মধ্যে ওলাউঠায় তিনশো লোক মরে। বন্দরে আসিলে পাইলট উক্ত জাহাজের সহিত নৌকা বাঁধিয়া তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। ঐ পাইলট এবং তাহার দুইজন সঙ্গী জাহাজে পদার্পণমাত্র করে নাই। দুই দিন পরেই ঐ পাইলট ওলাউঠায় আক্রান্ত হয় এবং তৃতীয় দিনে তাহার একটি সঙ্গীকেও ওলাউঠায় ধরে। তখন সে অঞ্চলে আর কোথাও ওলাউঠা ছিল না। এখানেও বায়ু ব্যতীত আর কিছুই দায়ী করা যায় না।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কক্ সাহেব, ওলাউঠাকে শরীরের উপরে জীবাণুবিশেষের ক্রিয়া বলিয়া সাব্যস্ত করেন। যদিও এ মত এখনো সম্পূর্ণ সর্ববাদিসম্মত হয় নাই তথাপি অধিকাংশের এই বিশ্বাস।

অনেক জীবাণুবীজ বহুকাল শুষ্ক অবস্থায় থাকিয়া অনুকূল আধার পাইলে পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু কক্ সাহেবের ওলাউঠা-জীবাণুগণকে এ পর্যন্ত বীজ সৃজন করিতে দেখা যায় নাই এবং একবার শুষ্ক হইয়া গেলে তাহারা মরিয়া যায়। একথা যদি সত্য হয় তবে ধূলা প্রভৃতি শুষ্ক আধার অবলম্বন করিয়া সজীব ওলাউঠা-জীবাণু বায়ুযোগে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। জলপথই তাহার প্রশস্ত পথ এবং ওলাউঠা-জীবাণু জলজ।

জীব্রল্টার বর্জন

সাধনা ১৩০০ ভাদ্র পৃ ৩৬০-৩৬২

গ্যাম্বিয়র সাহেব বলিতেছেন, ইংরাজ জীব্রল্টারের উপব দুর্গ ফাঁদিয়া ভারতবর্ষের পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সে তাহার পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, যুদ্ধের সময় যদি সুয়েজখালের পথ ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে জিব্রল্টার দুর্গের উপযোগিতা থাকে ; কিন্তু লেখকের মতে তাহা সম্ভব নহে। কেননা, রুষিয়া প্রভৃতি কোন য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংবাজের যদি যুদ্ধ বাধে, তবে ইজিপ্ট কোন পক্ষ অবলম্বন কবিতে না পাবিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজকে খালের পথে প্রবেশ করিতে দিবে না। ফ্রান্স এবং রুষিয়া যদি কখনো একত্র মিলিত হইয়া তুরস্ক আক্রমণ করে তবে তুবস্কের অধীনস্থ ইজিপ্ট আক্রমণে বাধা দিবার অধিকাব ইংবাজের নাই, কারণ, ইংবাজ সেখানে অতিথি মাত্র। অতএব বিপদের সময় সুয়েজপথের কোন মূল্য দেখা যায় না। কেবল তাহাই নহে। লেখক বলেন, জিব্রল্টাব-প্রণালী দিয়া অন্য য়ুরোপীয় সৈন্যপ্রবেশ প্রতিহত করা সহজ নহে, কারণ, প্রণালীটি যথেষ্ট প্রশস্ত। এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগবের যোগসাধন করিয়া ফ্রান্স যে খাল খনন কবিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাধা হইলে জিব্রল্টারের কোন মূল্যই থাকে না।

আরো একটা কথা আছে। সুয়েজখাল বালিব মধ্য দিয়া একটা সামান্য নালা মাত্র। সের দেড়েক ডাইনামাইট লাগাইলেই তাহাকে ধ্বংস করা যায় এবং একটা জাহাজ যদি ইট ও লোহার বেলে বোঝাই পূর্বক আড় করিয়া মাঝখানে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই পথ বন্ধ।

লেখক বলেন, ভূমধ্যসাগরের পথ ছাড়িয়া ইংলণ্ড যদি উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া পথ ঘুরাইয়া লন তাহা হইলে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। তাহা হইলে য়ুরোপের সহিত আব কোন সংস্রবই থাকে না, সমস্ত পথ খোলসা পাওয়া যায়।

লেখক প্রস্তাব করেন, স্পেনকে জিব্রল্টার ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্তে তাহার নিকট হইতে ক্যানারি দ্বীপ লওয়া হউক। সেখানে পথের মধ্যে দিব্য একটি দুর্গ ফাঁদিয়া বেশ শক্ত হইয়া বসা যায় এবং জাহাজ মেরামত, কয়লাতোলা এবং সৈন্যনিবাসের পক্ষে একটি সুবিধামত আড্ডা হয়।

পর্টুগালের নিকট হইতে ম্যাডেরা দ্বীপটাও পাঁচ রকম প্রলোভন দ্বারা জোগাড় করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইজিপ্টের দখল ছাড়িয়া দিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে তৎপরিবর্তে ম্যাডাগাস্কর চাহিয়া লইলে ফ্রান্স নারাজ হইবে না।

তাহার পর ইংলণ্ড হইতে বুক ফুলাইয়া ধূমোদগার করিয়া রণতরী ছাড়িবে এবং অবাধে সমস্ত আট্‌লান্টিক কর্ষণ করিয়া ভারতসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ভারতবর্ষের ঘাটে আসিয়া লাগিবে; য়ুরোপের চোখরাঙানীকে আর কিছুমাত্র কেয়ার করিতে হইবে না। ভারতবর্ষের কণ্ঠলগ্ন লৌহশৃঙ্খলটি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া একটানে চলিয়া গিয়া ইংলণ্ডের দ্বারদেশে দৃঢ়পাকে বদ্ধ থাকিবে।

সাধনা ১৩০০ ভাদ্র পৃ ৩৬২-৩৬৪

ঈথর স্পর্শের অতীত, এবং পদার্থের গতিকে কিছুমাত্র বাধা দেয় না, এ সম্বন্ধে বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য বোধহয়, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ঈথরের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অনুমান মনে করেন। কিন্তু ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগম্য নহে, আলোকবোধ ও উত্তাপবোধই তাহার প্রমাণ।

কথাটা সংক্ষেপে এই—পৃথিবীতে প্রধানতঃ সূর্য হইতে আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানকার আকাশে যদি কোন জানত বস্তু থাকে, সে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস; কোথাও বা পরমাণু আকারে, কোথাও বা খানিকটা সমষ্টিবদ্ধ ভাবে; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। এই বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলি আলোকবহন কার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ আলোক যে গতি অবলম্বন করিয়া আসে, কোন কঠিন, তরল অথবা বাষ্পীয় পদার্থ সে গতি চালনা করিতে পারে না। অতএব তাহার একটা স্বতন্ত্র বাহন আছে সন্দেহ নাই। বাহন আছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই, কারণ, কিরণ-মাত্রই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং তাহার গতির সময় সুনির্দিষ্ট ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে।

ক্রিয়া শূন্য আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না ইহাও বিজ্ঞানের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। বস্তু আপন সংলগ্ন পদার্থের উপরেই কাজ করে। শক্তি অবিচ্ছিন্ন-মধ্যস্থ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই একস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে কেবল কিরণের সম্বন্ধ তাহা নহে, একটা আকর্ষণের যোগ আছে। আকর্ষণটি বড় কম নহে; যে টান পড়ে তাহা সতের ফুট চওড়া

১০০০০০০০০০০০০০টা ইস্পাতের রজ্জুও সহিতে পারে না। এত বড় একটা প্রবল শক্তিকে কে চালনা করিতেছে? একটা ইস্পাতের পাতকে বিস্তর বলপ্রয়োগ করিয়াও বিচ্ছিন্ন করা কঠিন; অথচ একথা সকলেরই জানা আছে যে, বস্তুমাত্রেরই পরমাণু গায়ে গায়ে সংলগ্ন নহে; পরস্পরের মধ্যে ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী যোজক পদার্থ অবস্থিতি করিয়া অসংলগ্ন পরমাণু পুঞ্জকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মধ্যস্থ জিনিসটি স্পর্শাতীত বটে, কিন্তু তাহার এমন গুণ আছে যে, প্রবলতম আকর্ষণ সঞ্চার করিতে পারে।

এই ঈথরের কম্পন কেবল যে আমরা আলোক ও উত্তাপবোধের দ্বারা অনুভব করি তাহা নহে। যে সকল বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, সেগুলাও যেন সেই বিশ্বব্যাপী ঈথরের নাড়ির বেগ অনুমান করিবার যন্ত্র। এখনো এই আলোক এই তড়িতের গতি ও শক্তিতত্ত্ব নির্ণয় হয় নাই; এখনো ইহার ক্রিয়াকলাপ যন্ত্রতন্ত্রের ধারণার বাহিরে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জানা গিয়াছে। অনেক পণ্ডিত আশা করিয়া আছেন ভাবী শতাব্দীতে ইহার একটা তত্ত্ব নির্ণয় হইবে এবং সেই তত্ত্বের উপর সমস্ত পদার্থবিদ্যার একটা নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইবে। জীবনীশক্তি ও মানসশক্তি এখনো বিজ্ঞানের হস্তে ধরা দেয় নাই, কিন্তু বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক অলিভার লজ সাহেব অনুমান করিতেছেন ঈথরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো ধরা পড়িবে, পরস্পরের মধ্যে বোধ করি বা কোন একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়

সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃ ৭৪-৭৫

আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মত আছে, তাহার বিশেষ কার্য কি এ পর্যন্ত ভালরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক্ নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই একজন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কি করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্যন্ত তাহার কোন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোন রূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরল পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ি যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু গাড়ি যদি ডাহিনে কিম্বা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতিপরিবর্তন অনুভব করিবার উপায়। একপ্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাৎ হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চ নীচতা মাপিবার জন্য কাঁচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেইপ্রকার তরলদ্রব্য আছে সম্ভবতঃ তাহা আমাদের গতিপরিবর্তন অনুসারে স্থান পরিবর্তন করিয়া আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।

ইচ্ছামৃত্যু

সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃ ৭৫-৭৭

শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের উপরেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য নাই। পরিপাক রক্তচলাচল প্রভৃতি কার্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

আমরা ইচ্ছা করিলে চোখের পাতা বুজিতে পারি কিন্তু কান বুজিতে পারি না। শীল মৎস্য জলে ডুবিবার সময় স্বেচ্ছামত নাক কান বুজিতে পারে। আমাদের নাসা ও কর্ণ রুদ্ধ করিবার মাংস পেশী আছে কিন্তু তাহারা প্রায় অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে—দুর্গন্ধ অনুভব করিলে আমরা নাসা কুঞ্চিত করিতে পারি বন্ধ করিতে পারি না। কিন্তু দৈবাৎ এক এক জন লোক পাওয়া যায় যাহারা জন্তুর ন্যায় অবলীলাক্রমে কান ফুলাইতে পারে, মাথার উপরকার চর্ম নাড়াইতে পারে। গরু জাবর কাটিতে পারে, মানুষের পক্ষে তাহা অসাধ্য; কিন্তু অনেক লোক ইচ্ছামাত্র অনায়াসে বমন করিতে পারে, দৈবক্রমে পাকস্থলীর মাংসপেশীর উপর তাহাদের কর্তৃত্ব জন্মিয়াছে। সকলেই জানেন আমাদের কতকগুলি স্নায়ু আছে যাহারা আমাদের ইচ্ছার হুকুম তালিম করে। ইচ্ছা হইল হাত তুলিব অমনি স্নায়ুযোগে সেই হুকুম হাতের মাংস পেশীর উপর জারি হইল, হাত উঠিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি শরীরের সর্বত্র এই ইচ্ছাদূতের গতিবিধি নাই; দৈবাৎ শরীরসংস্থানের কোনরূপ বিপর্যয়বশতঃ এই ইচ্ছা-প্রচারী স্নায়ুর অস্থানে সঞ্চার হইয়া মানুষের অসাধারণ ইন্দ্রিয়ক্ষমতা জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ ইচ্ছামাত্র শরীরক্রিয়া নিরোধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্রে তাহার এক আশ্চর্য উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। কর্ণেল টাউনশেণ্ড্ নামক এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিতেন। প্রথমে ডাক্তাররা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তাহারা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণেল সাহেব চীৎ হইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাড়ি কমিয়া হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইয়া আসিল; অবশেষে জীবনের কোন লক্ষণ রহিল না। ডাক্তাররা ভয় পাইলেন। কিন্তু আবার আধঘণ্টা পরে ক্রমে তাঁহার নাড়ি ফিরিয়া আসিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ করিল, তিনি কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে কোন এক অস্বাভাবিক কারণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মাংসপেশীর উপর তাঁহার স্বেচ্ছাস্নায়ুর অধিকার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আধঘণ্টা কাল শরীরক্রিয়া রোধ করিয়া কিরূপে প্রাণরক্ষা হয় তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশে যোগীদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়; কিন্তু যোগী ও রোগীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, যোগী সাধনার দ্বারা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন রোগী দেহযন্ত্রের অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিক্রমে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাকড়শা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব

সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃ ৭৭

পৌরুষ সম্বন্ধে স্ত্রী-মাকড়শার সহিত পুরুষ-মাকড়শার তুলনাই হয় না। প্রথমতঃ আয়তনে মাকড়শার অপেক্ষা মাকড়শিকা ঢের বড, তার পর তাহার ক্ষমতাও ঢের বেশি। স্বামীর উপর উপদ্রবের সীমা নাই, তাহাকে মারিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া দেয়। এমন কি, অনেক সময় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া খাইয়া ফেলে, এরূপ সম্পূর্ণ দাম্পত্য একীকরণের দৃষ্টান্ত উচ্চশ্রেণীর জীবসমাজে আছে কি না সন্দেহ।

উটপক্ষীর লাথি

সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃ ৭৭-৭৮

নীড় রচনার সময় এই মরুবিহারী বিরাটপক্ষী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। নিকটে মানুষ দেখিলে ছুটিয়া গিয়া আক্রমণ করে, পা দুলাইয়া দুলাইয়া এক প্রচণ্ড লাথি কসাইয়া দেয়। এই এক লাথির চোটে অশ্বের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে শুনা যায়। দ্রুতবেগে ইহাকে কেহ হারাইতে পারে না। এরূপ স্থলে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া সহিষ্ণুভাবে ইহার লাথি সহ্য করাই একমাত্র গতি। একজন এইরূপ পাখীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সবলে তাহার দীর্ঘ গ্রীবা ভূমিতে নত করিয়া ধরিয়াছিল। দৈবক্রমে পাখীর লাথি নিজেরই নত মস্তকের উপর পড়িয়া আপনার মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল এবং সেই লোকটি বিনা আঘাতে পরিত্রাণ পাইল।

জীবনের শক্তি

সাধনা ১২৯৮ পৌষ পৃ ১৬৫-১৬৬

আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি আমাদের শরীরের ক্রিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে ; তাহাতে যে কি বিপুল শক্তি ব্যয় হইতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।

আমাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোটরে বিভক্ত। তাহার মধ্যে দুইটি কোটরে শরীরের রক্ত আসিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দুইটি অংশ স্যাক্‌রার হাপরের মত সংকুচিত হইয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। দিন-রাত্রি এ কাজের আর বিশ্রাম নাই। এইটুকু চর্মযন্ত্রের পক্ষে কাজও নিতান্ত

সামান্য নয়। রক্তসঞ্চারী কোটরদ্বয়ের বাম কোটরটি প্রত্যেক সংকোচনে চার আউন্স রক্ত নয় ফুট দূরে উৎসারিত করে। দক্ষিণ কোটরটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু তাহাকেও খাটিতে হয়। সুস্থশরীর বয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৫-৭৬ বার সংকুচিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘণ্টায় যে শক্তি ব্যয় করে সেই শক্তি দ্বারা তিন হাজার মনের অধিক (১২০ টন্) ভার এক ফুট ঊর্ধ্বে তুলা যাইত।

যেমন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ অবিশ্রাম চলিতেছে তেমনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও বিরাম নাই। তাহাতে করিয়া বক্ষস্থল ক্রমাগত উঠিতেছে পড়িতেছে এবং বুকের পাঁজরা মাংসপেশী এবং ফুসফুস সেই উত্থান পতনের কার্যে লাগিয়া রহিয়াছে। বিশ্রামকালে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং পরিশ্রম-কালের সেই বায়ুর পরিমাণ পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজাব তিনশ নব্বই বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িতে পারে। এতটা বায়ু আকর্ষণ ও নিঃসারণ সামান্য কাজ নহে। তাহা ছাড়া ফুসফুস এবং বক্ষপ্রাচীর এই বাতাস বাধা দেয় এবং মাংসপেশীর বলে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের শ্বাস সাধক মাংসপেশী যে শক্তি প্রয়োগ করে তাহার দ্বাবা ২০০ মনের অধিক ভার (২১ টন্) এক ফুট ঊর্ধ্বে তোলা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া মস্তিষ্কের কাজ, পাকযন্ত্রের কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ শারীরিক ক্রিয়া বাকি আছে সে সমস্ত হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় নিরবিচ্ছিন্ন আলস্যেও কি প্রচুর শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা ত কেবল চব্বিশ ঘণ্টার হিসাবের কিঞ্চিদংশ দেখিলাম, একজন মানুষের সমস্ত জীবিতকাল আলোচনা করিলে জীবনের শক্তি যে কি অপরিমেয় তাহা বুঝা যায়।

ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা

সাধনা ১২৯৮ পৌষ পৃ ১৬৬-১৬৯

সার এড্‌মণ্ড হর্ণ্‌বি চীন এবং জাপানের সর্বোচ্চ কন্সুলার কোর্টের প্রধান জজ্‌ ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি মকদ্দমায় যে রায় লিখিতেন সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজের সংবাদদাতারা আসিয়া সেই রায় চাহিয়া লইয়া যাইত এবং পরদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিত। একদিন এইরূপ রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া

দিয়াছিলেন ; কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে। জজসাহেব রাত্রে নিদ্রিত আছেন এমন সময় শয়নগৃহের দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন কেহ গৃহ প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি প্রবেশ করিবার আদেশ করিলে সেই খবরের কাগজের সংবাদদাতা গম্ভীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রায় প্রার্থনা করিল। শয়নগৃহে তাহার এরূপ অনধিকার প্রবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হর্ণ্‌বি তাহাকে খানসামার নিকট হইতে রায় চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি সে পুনঃ পুনঃ পূর্বমত প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতকবা তাহার অনুনয়ে বিচলিত হইয়া কতক বা নিজপত্নী লেডি হর্ণ্‌বির জাগরণ আশঙ্কায় তিনি আর কিছু না করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার লিখিত রায়ের মর্ম মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, সে তাহা লিখিয়া লইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। তখন রাত্রি দেড়টা। অনতিবিলম্বে লেডি হর্ণ্‌বি জাগ্রত হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। পরদিন জজসাহেব আদালতে গেলে সংবাদ পাইলেন যে, সেই সংবাদদাতা পূর্বরাত্রে একটা হইতে দেড়টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং সে রাত্রে সে গৃহত্যাগ করে নাই। ইন্‌কোয়েষ্ট পরীক্ষায় হৃদরোগই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই গল্পটি যখন নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তখন সাধারণের মনে অত্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করিল। বিশেষতঃ হর্ণ্‌বি সাহেব একটি বড় আদালতের বড় জজ্‌—প্রমাণের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মভাবে অবধারণ করাই তাঁহার কাজ। এবং তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি পুরুষানুক্রমে আইন-ব্যবসায়ী, কল্পনাশক্তিপরিশূন্য, এবং অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসহীন।

এই ঘটনা কাগজে প্রকাশ হইবার পরে "নর্থ চাইনা হেরাল্ডে"র সম্পাদক ব্যাল্‌ফোর সাহেব নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরিতে নিম্নলিখিতমত প্রতিবাদ করেন।

১। হর্ণ্‌বি সাহেব বলেন বর্ণিত ঘটনাকালে লেডি হর্ণ্‌বি তাঁহার সহিত এ কত্রে ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে লেডি হর্ণ্‌বি নামক কোন ব্যক্তিই ছিলেন না। কারণ হর্ণ্‌বি সাহেবের প্রথম স্ত্রী উক্ত ঘটনার দুইবৎসর পূর্বে গত হন এবং ঘটনার চারিমাস পরে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

২। হর্ণ্‌বি সাহেব ইন্‌কোয়েষ্টের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষার উল্লেখ করেন, কিন্তু স্বয়ং পরীক্ষক "করোনার" সাহেবের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলাম, উক্ত মৃতদেহ সম্বন্ধে ইন্‌কোয়েষ্ট বসে নাই।

৩। হর্ণ্‌বি সাহেব ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুআরি তাঁহার রায় প্রকাশের দিন বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আদালতের গেজেটে সে দিনের কোন রায় প্রকাশিত হয় নাই।

৪। হর্ণ্‌বি বলেন, সংবাদদাতা রাত্রি একটার সময় মরে। এ কথা অসত্য। প্রাতঃকালে ৮-৯ ঘটিকার সময় তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

ব্যাল্‌ফোর সাহেবের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সার্ হর্ণবি কিছু বলিতে পারিলেন না, সব কথা এক প্রকার মানিয়া লইতে হইল।

ইহার পর অলৌকিক ঘটনার প্রামাণ্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

মানব শরীর

সাধনা ১২৯৮ পৌষ পৃ ১৬৯-১৭১

যাঁহারা সাধনায় প্রকাশিত "প্রাণ ও প্রাণী" প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্বেই আভাস পাইয়াছেন যে, প্রাণীশরীর অনুপরিমাণ জীবকোষের সমষ্টি। এ কথা ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন আমাদের শরীরের যে যে অংশে জীবনের প্রবাহ আছে সমস্তই প্রটোপ্লাসম্‌ নামক পঙ্কবৎ পদার্থে নির্মিত। কেবল মানব-শরীর নহে উদ্ভিদ প্রভৃতি যে কোন জীবিত পদার্থ আছে প্রটোপ্লাসম্‌ ব্যতীত আর কোন পদার্থেই জীবনীশক্তি নাই।

মানবশরীর অনুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রটোপ্ল্যাসম্‌ অতি ক্ষুদ্র কোষ আকারে বদ্ধ হইয়া সর্বদা কার্য করিতেছে। কোথাও কোথাও তন্তু আকার ধারণ করিয়া আমাদের মাংসপেশী ও স্নায়ু রচনা করিয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোষগুলিই আমাদের শরীরের জীবনপূর্ণ কর্মশীল উপাদান।

কণামাত্র প্রটোপ্ল্যাসম্‌ নামক প্রাণপদার্থ সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ হইয়া এক একটি কোষ নির্মাণ করে। প্রত্যেক প্রাণকোষের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া ঘণীভূত বিন্দু আছে। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে তাহার ধারণা করা অসম্ভব।

এই কোষগুলিই আমাদের শরীরের কর্মকর্তা, আমাদের প্রাণরাজ্যের প্রজা। ইহারাই আমাদের অস্থি নির্মাণ করিতেছে শরীরের আবর্জনা বাহির করিয়া দিতেছে, মাংসপেশীরূপে পরিণত হইতেছে। স্নায়ুকোষগুলি শরীরের

রাজস্থানীয়। তাহারাই শরীরের রাজ্যরক্ষা আইনজারি প্রভৃতি বড় বড় কাজে নিযুক্ত।

ইহাদের মধ্যে কার্যের ভাগ আছে। পাকযন্ত্রের পাচক রস নিঃসারণ হইতে অস্থি নির্মাণ সমস্ত কাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের উপর বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল অন্যদলের কার্যে তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। তাহাদের অধিকাংশ কার্যই প্রায় স্বাধীনভাবে নির্বাহিত হয়। যদিও তাহারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে কর্তৃপক্ষীয় বলিয়া স্বীকার করে।

আমাদের শরীরের কাজ যে কত অসংখ্য এবং কোষের দল সেই সমস্ত কাজ শৃঙ্খলাপূর্বক নির্বাহ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কেহ বা জিহ্বাতলে লালা জোগাইতেছে, কেহ বা বাষ্প সৃজন করিয়া চক্ষুতারকাকে সরস করিয়া রাখিতেছে, কেহ বা পাকস্থলীতে রস নির্মাণ করিতেছে—আরো কত সহস্র কাজ আছে। যকৃৎ যে সকল জীব-কোষে নির্মিত তাহারা কেবল যকৃতেরই সহস্র কাজ করিয়া থাকে, আর কিছুই করে না, প্রত্যেক প্রত্যক্ষবর্তী কোষের এইরূপ কার্যনিয়ম। মস্তিষ্ক যে সকল কোষে নির্মিত তাহারা শরীরের সর্বোচ্চ মণ্ডপে বসিয়া অবিশ্রাম রাজকার্যে নিযুক্ত।

অতএব মানবশরীরটা একটা সমাজের মত। অসংখ্য প্রজার ঐক্যসমষ্টি। একটা সৈন্যের দল যেমন অশ্বারোহী পদাতিক প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক অংশ নানা লোকের সমষ্টি অথচ সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ প্রাণীর মত অতিশয় সংহত ঐক্য রক্ষা করিয়া চলে; কতকগুলি মরিতেছে আবার নূতন লোক আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে—মানবের জীবিত শরীর অবিকল সেইভাবে কাজ করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই একা এক সহস্র, এমন কি তাহার চেয়ে ঢের বেশি।

নবম অধ্যায়

সাধনা পত্রিকার প্রতি মাসের সূচী

"সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদেব রচনাতেও আমার হাত ভূবি পবিমাণে ছিল।"

প্রথম বর্ষ ১২৯৮ অগ্রহায়ণ—১২৯৯ কার্তিক

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

সাধনার সূর্যালোক (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শকুন্তলা (কবিতা: ধীর তপোবনে সাড়া শব্দ নাই)—ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (গল্প) —রবীন্দ্রনাথ, ঋতুসংহার (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাণ ও প্রাণী (প্রবন্ধ) —সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার্গম স্বরলিপির 'আকার মাত্রিক' নূতন পদ্ধতি (প্রবন্ধ) —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. মণিপুরের বর্ণনা—রবীন্দ্রনাথ, খ. আমেরিকার সমাজচিত্র—রবীন্দ্রনাথ, গ. পৌরাণিক মহাপ্লাবন—রবীন্দ্রনাথ, ঘ. মুসলমান মহিলা—রবীন্দ্রনাথ, ঙ. প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব—রবীন্দ্রনাথ; সোরাব ও রোস্তম (গল্প)—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ত্রী-পুরুষেব ভেদাভেদ (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানালার ধারে (প্রবন্ধ) —বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈজ্ঞানিক সংবাদ (বিভাগীয় রচনা) ক. গতিনির্ণয়ের ইন্দ্রিয়—রবীন্দ্রনাথ, খ. ইচ্ছামৃত্যু—রবীন্দ্রনাথ, গ. মাকড়শা-সমাজে স্ত্রী-জাতির গৌরব—রবীন্দ্রনাথ, ঘ. উটপক্ষীর লাথি—রবীন্দ্রনাথ; বাগান (প্রবন্ধ) —রবীন্দ্রনাথ, যাত্রা আরম্ভ / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা: ক. ভারতী—আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯৮, খ. নব্যভারত—আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯৮, গ. সাহিত্য—আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯৮)—রবীন্দ্রনাথ।

পৌষ ১২৯৮

সপ্তস্বর (কবিতা: সপ্তস্বরে নিনাদিত ভারতীর বীণ)—ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পত্তি সমর্পণ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়—রবীন্দ্রনাথ, খ. সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য—রবীন্দ্রনাথ, গ. ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ—রবীন্দ্রনাথ; রত্নাবলী

(প্রবন্ধ) — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার্গম স্বরলিপির আকারমাত্রিক নূতন পদ্ধতি *[১], স্বরলিপি / মায়ার খেলা : মোরা জলে স্থলে কত ছলে — ইন্দিরা দেবী, আমার সহযাত্রী / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, প্রাচ্য সমাজ (প্রবন্ধ) — রবীন্দ্রনাথ, দেয়ালের ছবি (প্রবন্ধ) — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈজ্ঞানিক সংবাদ (বিভাগীয় রচনা) ক. জীবনের শক্তি — রবীন্দ্রনাথ, খ. ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা — রবীন্দ্রনাথ, গ. মানবশরীর — রবীন্দ্রনাথ, আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত (প্রবন্ধ) — রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা : ক. নব্যভারত — অগ্রহায়ণ ১২৯৮, খ. সাহিত্য — অগ্রহায়ণ ১২৯৮) — রবীন্দ্রনাথ, প্রশ্ন — জিজ্ঞাসু।

মাঘ ১২৯৮

রাজা রামমোহন রায় (কবিতা : হিমালয় স্তূপাকার এক অভ্রভেদী — ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ (প্রবন্ধ) — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দালিয়া (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ, কর্মের উমেদার (প্রবন্ধ) — রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি / মায়ার খেলা — ইন্দিরা দেবী, মালবিকাগ্নিমিত্র (প্রবন্ধ) — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তরী পরিবর্তন / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. স্ত্রী-মজুর — রবীন্দ্রনাথ, খ. প্রাচীন পুঁথি-উদ্ধার — রবীন্দ্রনাথ, গ. ক্যাথলিক্ সোশ্যালিজ্‌ম্ — রবীন্দ্রনাথ ; আদরের না অনাদরের ? (গল্প) — শরৎকুমারী চৌধুরাণী, জ্যোতির্বিজ্ঞান-স্পেকট্রস্কোপ ও ফটোগ্রাফি (প্রবন্ধ) — সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারা মার্টিন (প্রবন্ধ) — সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা : ক. নব্যভারত — পৌষ ১২৯৮, খ. সাহিত্য — পৌষ ১২৯৮, গ. সাহিত্য ও বিজ্ঞান — কার্তিক ১২৯৮) — রবীন্দ্রনাথ, প্রশ্ন — শরৎকুমারী চৌধুরাণী, শব্দতত্ত্বান্বেষী, উত্তর — সম্পাদক, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঠক।

ফাল্গুন ১২৯৮

কঙ্কাল (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ, দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশ (প্রবন্ধ) — সখারাম গণেশ দেউস্কর, মীমাংসা (রচনা) — রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি / মায়ার খেলা ও ব্রহ্মসংগীত : দরশন দাও হে প্রভু — ইন্দিরা দেবী, আলোচনা (পত্র) — রবীন্দ্রনাথ, নীরব বিদায় (কবিতা : নীরব বিদায় ও যে) — দেবেন্দ্রনাথ সেন,

১. তারকাচিহ্নের অর্থ ধারাবাহিক রচনা — পূর্বানুবৃত্তি।

স্ত্রী-পুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুরাতন চিঠি (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীতিগ্রন্থ (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোহিত সমুদ্রে / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী*, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. আমেরিকানের রক্তপিপাসা—রবীন্দ্রনাথ, খ. খৃষ্টীয় নরক—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. কৃত্রিম দাম্পত্যনির্বাচন—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা: ক. সাহিত্য—মাঘ ১২৯৮)—রবীন্দ্রনাথ, প্রাপ্ত গ্রন্থ (সমালোচনা) ক. লালা গোলোকচাঁদ / সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত, খ. দেহাত্মিক তত্ত্ব / ডাক্তার সাহা প্রণীত; প্রশ্ন—ক. শরৎকুমারী দেবী, খ. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, গ. দীনেন্দ্রকুমার রায়, ঘ. সখারাম গণেশ দেউস্কর, উত্তর—ক. সম্পাদক, খ. সম্পাদক, গ. জগদানন্দ রায়, ঘ. দীনেন্দ্রকুমার রায়।

চৈত্র ১২৯৮

সন্ধ্যার পথিক (কবিতা: চারিদিকে চেয়ে দেখি)—ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাব্য (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, মুক্তির উপায় (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাপতির রাধিকা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক উন্নতি—রবীন্দ্রনাথ, খ. সুখ-দুঃখ—রবীন্দ্রনাথ, গ. ক্রিমিনাল্ মানবতত্ত্ব—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘ. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল্-তত্ত্বের প্রয়োগ—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর; স্বরলিপি / মায়ার খেলা ও ব্রহ্মসংগীত: দোঁহে হৃদয়ে সদা শান্তিরস—ইন্দিরা দেবী, ইংলণ্ডে অপরাধীর সংশোধন পদ্ধতি (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, তখনকার কথা (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশ (প্রবন্ধ)—সখারাম গণেশ দেউস্কর, ভূমধ্য সাগরে / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী*, সাহিত্যের সত্য (প্রবন্ধ)—লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সংগ্রহ—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা: ক. নব্যভারত—মাঘ ১২৯৮, খ. সাহিত্য—ফাল্গুন ১২৯৮)—রবীন্দ্রনাথ, সামাজিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন (আলোচনা)—শ্রী, নিছনি / উত্তর (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, প্রশ্ন—ক. জগদানন্দ রায়, খ. দীপেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গ. গৌরহরি সেন; উত্তর—ক. জিজ্ঞাসু, খ. পাঠক, গ. শ্রীঃ।

বৈশাখ ১২৯৯

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, ত্যাগ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, সামাজিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

রেলপথের দুই পার্শ্বে / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, সাহিত্য / পত্রোত্তর (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. প্রেমে পড়া – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. ইনফ্লুয়েঞ্জা – স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশ *, বিম্ববতী (কবিতা : যতনে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী) – রবীন্দ্রনাথ, পরনিন্দার জন্মবিবরণ (প্রবন্ধ) – কৃষ্ণবিহারী সেন, স্বরলিপি / কি গাবো আমি – ইন্দিরা দেবী, হাইনের কবিতা / জর্মান্ হইতে অনুবাদিত (ক. স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নি জ্বালার, খ. আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি, গ. প্রথমে আশাহত হয়েছিনু, ঘ. নীল বায়লেট নয়ন দুটি, ঙ. গানগুলি মোর বিষে ঢালা, চ. তুমি একটি ফুলের মত মণি, ছ. রাণি তোর ঠোঁট দুটি মিঠি, জ. বারেক ভালবেসে যে জন মজে, ঝ. বিশ্বামিত্র বিচিত্র এ লীলা) – রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা : ক. নব্যভারত – চৈত্র ১২৯৮, খ. সাহিত্য – চৈত্র ১২৯৮) – রবীন্দ্রনাথ, অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর (প্রবন্ধ) – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিছনি (প্রবন্ধ) – দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রশ্ন – ক. পাঠক ; উত্তর – ক. সখারাম গণেশ দেউস্কর, খ. স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

আদিম আর্য-নিবাস (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, একরাত্রি (গল্প) – রবীন্দ্রনাথ, পাখীছাড়া (কবিতা ; তুমি কি গো হর, সখি, আমি কি অনঙ্গ) – দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্যারিস হইতে লণ্ডনে / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, সাধনা : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (প্রবন্ধ) – দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈশব সন্ধ্যা (কবিতা : দুই ধারে চষা মাটি ; মাঝে আঁকাবাঁকা) – রবীন্দ্রনাথ, আকাশ-তরঙ্গ (প্রবন্ধ) – রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সাহিত্যের উপাদান (প্রবন্ধ) – লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সাময়িক সার-সংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. সোশ্যালিজ্‌ম – রবীন্দ্রনাথ, খ. ইংলণ্ডে আত্মানু-সন্ধানী সভা – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পহুঁ (প্রবন্ধ) – দীনেন্দ্রকুমার রায়, পহুঁ (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা : ক. নব্যভারত – বৈশাখ ১২৯৯, খ. সাহিত্য – বৈশাখ ১২৯৯) – রবীন্দ্রনাথ।

আষাঢ় ১২৯৯

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে (কবিতা : রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়) – রবীন্দ্রনাথ, একটা আষাঢ়ে গল্প (গল্প) – রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি / রাজা ও রাণী :

সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে—ইন্দিরা দেবী, চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব (প্রবন্ধ) —রবীন্দ্রনাথ, লণ্ডনে / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, পুরুৎ ঠাকুরুণ (কাহিনী)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্যের প্রাণ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, ধর্মজঙ্গল (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র (কবিতা: হিন্দুর এ হীন গৃহ চির স্বর্গময়)—সতীশচন্দ্র মিত্র, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. সচেতন ও অচেতন আত্মা—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. জাপানী সভ্যতা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আদিম সম্বল (প্রবন্ধ) —রবীন্দ্রনাথ, দীপশিখা (প্রবন্ধ)—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, স্বরবর্ণ 'অ' (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, প্রশ্নোত্তর।

শ্রাবণ ১২৯৯

হিং টিং ছট্ / স্বপ্নমঙ্গল (কবিতা: স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ)—রবীন্দ্রনাথ, উমেদার (গল্প)—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ (প্রবন্ধ) —রবীন্দ্রনাথ, ভাসমান / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, স্বরলিপি / বর্ষার দিনে: এমন দিনে তারে বলা যায়—ইন্দিরা দেবী, জীবিত ও মৃত (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, লোকচেনা (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ (প্রবন্ধ) —লোকেন্দ্রনাথ পালিত, ঠাকুরঘর (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, পঙ্ছ (পত্র-প্রবন্ধ) —ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, প্রত্যুত্তর (পত্র-প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. সার লেপেন্ গ্রিফিন্—রবীন্দ্রনাথ।

ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৯

স্বর্ণমৃগ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, পরশপাথর (কবিতা: ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর)—রবীন্দ্রনাথ, লোকচেনা *, জাহাজের কাহিনী / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, মইনু (কবিতা: তন্ময় হয়ে খেলিছে নীরবে)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বুড়া ও বুড়ির কথা / জাপানের গল্প (গল্প)—ইন্দিরা দেবী, মানবপ্রকাশ (পত্র-প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি / মায়ার খেলা: দেলো সখি দে—ইন্দিরা দেবী, কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (স্বরলিপি)—ইন্দিরা দেবী, গোবিন্দদাস (প্রবন্ধ)—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তারবাবু (গল্প)—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, বীণা (কবিতা: অন্ধকার শব্দহীন জড় কারাগারে)—লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. সম্মোহন-তত্ত্ব—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. ভাষা শিখিবার হদিশ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. দন্ত রক্ষা—

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘ. বাল্যবিবাহ—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধচরিত (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণবিহারী সেন, অশ্রুজল (কবিতা: তুষার উপরে বুকটি চাপিয়া)—ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রীতিমত নভেল (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (বিভাগীয় সমালোচনা: ক. নব্যভারত—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯৯, খ. সাহিত্য—শ্রাবণ ১২৯৯)—রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি / তুমি কি লো তোমারি তরে—যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার্তিক ১২৯৯

জয় পরাজয় (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গলার আদিকাব্য (প্রবন্ধ)—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাত্রা সমাপন / য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী *, স্বরবর্ণ 'এ' (প্রবন্ধ) —রবীন্দ্রনাথ, তুমি (কবিতা: সংসার তোমায় দিল অন্তিম বিদায়)—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোম্বাই সমাজসংস্কার (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকচেনা *, স্বরলিপি / হিন্দুস্থানী গান—যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়ার খেলা: সখি বহে গেল বেলা—ইন্দিরা দেবী, আমাদের পুতুলের বিয়ে (রচনা)—শরৎকুমারী চৌধুরাণী, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. মধ্য আসিয়ায় রুষ—নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খ. কি রূপে গল্প তৈরি হয়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; বুদ্ধচরিত *, শিশুর আদর (কবিতা: কে চায় নলিন্ সূর্যমুখী)—দেবেন্দ্রনাথ সেন, পূজার ছুটি (কাহিনী)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নিছনি (আলোচনা)—জনৈক পাঠক, প্রশ্নোত্তর।

দ্বিতীয় বর্ষ ১২৯৯ অগ্রহায়ণ—১৩০০ কার্তিক

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

কাবুলিওয়ালা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, জাহাঙ্গীরের মদিরাসক্তি (প্রবন্ধ)—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, লোকচেনা *, যেতে নাহি দিব (কবিতা: দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি)—রবীন্দ্রনাথ, টা টো টে (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, অভিব্যক্তির ধারাত্রয় (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরলিপি / বল্ আমায় কি হয়েছে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরলিপি / আগে চল্ আগে চল্ ভাই—ইন্দিরা দেবী, সিংহল-ভ্রমণ (প্রবন্ধ)—রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্তী, কমলকুমারিকাশ্রম / ফরাসী হইতে অনুবাদিত (উপাখ্যান)—ইন্দিরা দেবী, সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক নূতন 'ফেডারেশন'—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. প্রাচীন শূন্যবাদ—রবীন্দ্রনাথ; বুদ্ধচরিত *, সমালোচনা (গ্রন্থসমালোচনা ক. সংগ্রহ / নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, খ. লীলা

/ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গ. রায় মহাশয় / হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘ. প্রবাসের পত্র / নবীনচন্দ্র সেন, ঙ. অপরিচিতের পত্র, চ. প্রকৃতির শিক্ষা, ছ. দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী / কালীপ্রসন্ন দত্ত।)

পৌষ ১২৯৯

শিক্ষার হেরফের (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, লোকচেনা *, ছুটি (গল্প) – রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধচরিত *, তোমরা এবং আমরা (কবিতা : তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও) – রবীন্দ্রনাথ, গুরুঠাকুর (কাহিনী) – শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, স্বরলিপি / সুন্দরি রাধে আওএ বনি – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরলিপি / আহা কি রূপ হেরিনু – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল (প্রবন্ধ) – দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কড়ায়-কড়া কাহন-কানা (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিন (কবিতা : উমারাণি – সেই সে পুরানো সুরে) – অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. উপন্যাসলেখা – সুকুমার হালদার, খ. দারিদ্র্য ও অপরাধ – – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রসঙ্গ কথা (বিভাগীয় বচনা) – লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সমালোচনা (গ্রন্থসমালোচনা) ক. অশোকচরিত / কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত, খ. পঞ্চামৃত / তারাকুমার কবিরত্ন।

মাঘ ১২৯৯

বাঙলা লেখক (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষাপ্রণালী (প্রবন্ধ) – লোকেন্দ্রনাথ পালিত, ডায়ারি / ভূমিকা (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, সুখ না দুঃখ (প্রবন্ধ) – রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য (আলোচনা) – রবীন্দ্রনাথ, সুভা (গল্প) – রবীন্দ্রনাথ, বৃত্তিত্রয়ের অভিব্যক্তি (প্রবন্ধ) – দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি ভবভূতি (প্রবন্ধ) – রমেশচন্দ্র দত্ত, মুসলমান সমাজ (প্রবন্ধ) – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসঙ্গ কথা (বিভাগীয় রচনা), স্বরলিপি / আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে – ইন্দিরা দেবী, ভুলে (কবিতা : একেলা তটিনী কুলে) – চুণীলাল গুপ্ত।

ফাল্গুন ১২৯৯

মহামায়া (গল্প) – রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব কবিতা (কবিতা : শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান) – রবীন্দ্রনাথ, সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. একাত্মবাদ-প্রবর্তক ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ – মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, খ. জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; ভবিষ্যৎ ধর্ম (প্রবন্ধ) – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরলিপি / সব সখি মিলে গাওরে – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকচেনা *, পঞ্চভূতের ডায়ারি *, দার্শনিক মতামত (প্রবন্ধ) – দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

বুদ্ধচরিত *, অনার্য ব্রাহ্মণ (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসঙ্গ কথা (বিভাগীয় রচনা) ক. সমুদ্র যাত্রা—রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনা (গ্রন্থসমালোচনা) ক. কঙ্কাবতী / ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

চৈত্র ১২৯৯

দান প্রতিদান (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডায়ারি *, সভাভঙ্গ (কবিতা : গাহিছে কাশিনাথ নবীন যুবা) —রবীন্দ্রনাথ, কৃষি-কথা (প্রবন্ধ)—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, স্বরলিপি / আহা কি চাঁদনী রাত—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উন্নতির যুগ (প্রবন্ধ)—রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রকৃতির অভিব্যক্তি (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পহুঁ (প্রবন্ধ)—ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রত্যুত্তর (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে' (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসঙ্গ কথা (বিভাগীয় রচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর পত্র উদ্ধৃত)—রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি (আলোচনা)—রবীন্দ্রনাথ।

বৈশাখ ১৩০০

উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, ধান্য / কৃষিকথা (প্রবন্ধ)—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, স্বরলিপি / কি সুধা ওই মদির নয়নে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরলিপি / কোয়েলিয়া মাতোয়ারা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমুদ্রের প্রতি / পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া (কবিতা : হে আদিজননি সিন্ধু)—রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে' *, স্বার্থ ও পরার্থ (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন (অনুবাদ)—প্রমথনাথ চৌধুরী, সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. আকবরের স্বপ্ন—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. ঝুটা শিক্ষা—মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ; ডায়ারি *, মেলা দর্শন (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সমালোচনা / বৌদ্ধধর্ম প্রশ্নোত্তর।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

খণ্ডগিরি (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাশের চাঁদ (কবিতা : হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ)—রবীন্দ্রনাথ, পয়সার লাঞ্ছনা (রচনা)—রবীন্দ্রনাথ, ত্রিগুণের পরম্পরাপেক্ষিকতা (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার কৃষাণী (রচনা)—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, 'ভারতবর্ষে' *, মধ্যবর্তিনী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. পরিবারাশ্রম—রবীন্দ্রনাথ, খ. উদয়াস্তের

চন্দ্র সূর্য — রবীন্দ্রনাথ, গ. সশস্ত্র য়ুরোপ — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ডায়ারি *, স্বরলিপি / মিলে সবে ভারতসন্তান — ইন্দিরা দেবী, ইক্ষু (প্রবন্ধ) — যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, বুদ্ধচরিত * ।

আষাঢ় ১৩০০

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ (রচনা) — রবীন্দ্রনাথ, অসম্ভব গল্প (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ, কন্যাদায় (গল্প) — শরৎকুমারী চৌধুরাণী, সোনার তরী (কবিতা : গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা) — রবীন্দ্রনাথ, মহত্তের অভিব্যক্তি (প্রবন্ধ) — দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা (প্রবন্ধ) — উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উত্তরচরিত (প্রবন্ধ) — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগতের অস্তিত্ব (প্রবন্ধ) — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, স্বরলিপি / আমায় বোলো না গাহিতে — ইন্দিরা দেবী, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. অভ্যাসজনিত পরিবর্তন — রবীন্দ্রনাথ, খ. বিক্রমাদিত্য — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. টেনিসনের ধর্মবিষয়ক মত — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘ. ইংরাজের উপর সূর্যতাপের প্রভাব — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সাংখ্যদর্শন (প্রবন্ধ) — উমেশচন্দ্র বটব্যাল, আলু (প্রবন্ধ) — যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রসঙ্গ কথা (বিভাগীয় রচনা) ক. শিক্ষাসংকট — রবীন্দ্রনাথ ।

শ্রাবণ ১৩০০

শাস্তি (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে' *, উকিলের কাহিনী (কাহিনী) — শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, গ্রহমণ্ডলী (প্রবন্ধ) — সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল (প্রবন্ধ) — ইন্দিরা দেবী, রোপণীর গান (প্রবন্ধ) — শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগীতচিন্তামণি (প্রবন্ধ) — অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও আহার্যসংস্থান — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. বর্মার ডাকাত — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; হৃদয় যমুনা (কবিতা : যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ) — রবীন্দ্রনাথ, পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি *, সাংখ্যদর্শন * ।

ভাদ্র ১৩০০

সুষমা (গল্প) — শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, কণারক (প্রবন্ধ) — বলেন্দ্রনাথ, পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি *, সাংখ্যদর্শন *, স্বরলিপি / আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি — ইন্দিরা দেবী, রবিখন্দ পাট শণ ও তরকারী (প্রবন্ধ) — যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. মানুষ সৃষ্টি — রবীন্দ্রনাথ, খ. ওলাউঠার বিস্তার — রবীন্দ্রনাথ, গ. জিব্রল্টার বর্জন —

রবীন্দ্রনাথ, ঘ. ঈশ্বর—রবীন্দ্রনাথ, ঙ. পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমতী বেস্তান্টের মত, চ. ভারতবাসী সম্বন্ধে বিদেশীর মত—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ব্যায়াম বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)-সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌন্দর্যতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভরা ভাদরে (কবিতা: নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরা ধান)—রবীন্দ্রনাথ, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ।

আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০০

প্রাচীন উড়িষ্যা (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমাপ্তি (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, ব্যায়াম বিজ্ঞান *, শৈশবে ধর্মশিক্ষা (প্রবন্ধ)—শরৎকুমারী চৌধুরাণী, রবিবর্মা (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডায়ারি *, স্বরলিপি / আজি শরত তপনে - ইন্দিরা দেবী, কালিদাস ও অশ্বঘোষ (প্রবন্ধ)—ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, ইংরাজ ও ভারতবাসী (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সাংখ্যদর্শন *, পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল *, সুখ (কবিতা: আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ)—রবীন্দ্রনাথ, সিকাগো মহামেলা (প্রবন্ধ)—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, হস্তসার (সমালোচনা)।

তৃতীয় বর্ষ ১৩০০ অগ্রহায়ণ—১৩০১ কার্তিক

অগ্রহায়ণ ১৩০০

সাংখ্যদর্শন *, বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি ঘটনা (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণবিহারী সেন, বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণবিহারী সেন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ (প্রবন্ধ) —সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমস্যা-পূরণ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, সৃষ্টি (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কোহিনূর (প্রবন্ধ)—দীনেন্দ্রকুমার রায়, তুলনায় সমালোচনা (কবিতা: একদা পুলকে প্রভাত আলোকে)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. বালবিধবা—কৃষ্ণবিহারী সেন, খ. রুষ ও ইংরাজ —কৃষ্ণবিহারী সেন, গ. গর্জন ও বর্ষণ—জগদানন্দ রায়; স্বরলিপি / যদি আসে তবে কেন যেতে চায়—ইন্দিরা দেবী, বুড়া বয়সের কথা (প্রবন্ধ)—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল *।

পৌষ ১৩০০

কর্তব্যনীতি / অধ্যাপক হক্‌স্‌লির মত (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বিনিপয়সায় ভোজ (ব্যঙ্গকৌতুক)—রবীন্দ্রনাথ, মহাভিনিষ্ক্রমণ বৃত্তান্ত (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণবিহারী সেন, ইংরাজের আতঙ্ক (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, নিরুদ্দেশ যাত্রা (কবিতা: আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে)—রবীন্দ্রনাথ, সাংখ্যদর্শন *,

বারাণসী (প্রবন্ধ) – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এক বাটি দুধের জন্য / ফরাসী লেখক 'পল য়্যুদেল্' হইতে (অনুবাদ) – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. মোগল রাজপত্নী – কৃষ্ণবিহারী সেন, খ. অহিফেণ – কৃষ্ণবিহারী সেন ; স্বরলিপি / এখনো তারে চোখে দেখিনি – ইন্দিরা দেবী।

মাঘ ১৩০০

বুদ্ধদেবের পর্যটন এবং শিক্ষারম্ভ / বুদ্ধচরিত *, মৃচ্ছকটিক (প্রবন্ধ) – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিহিলিষ্ট-তত্ত্ব (প্রবন্ধ) – দীনেন্দ্রকুমার রায়, সাংখ্যদর্শন *, মাটির উৎপত্তি ও প্রকৃতি (প্রবন্ধ) – নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদায় অভিশাপ (কবিতা : দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস) – রবীন্দ্রনাথ, কৃতজ্ঞতা (ধারাবাহিক উপন্যাস) – শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, পৌষ-পার্বণ (রচনা) – শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, মোগল রাজপত্নী (প্রতিবাদ) – রজনীকান্ত গুপ্ত, স্বরলিপি / বেদ গান – ইন্দিরা দেবী, হিন্দু দেবদেবীর চিত্র (প্রবন্ধ) – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফাল্গুন ১৩০০

অতিপ্রাকৃত (প্রবন্ধ) – রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'ভারতবর্ষে' *, সাংখ্য-দর্শন *, জয়দেব (প্রবন্ধ) – বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরলিপি / সখি আমরি দুয়ারে কেন আসিল – ইন্দিরা দেবী, কৃতজ্ঞতা *, রৌপ্যমুদ্রা (প্রবন্ধ) – কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রেমের অভিষেক (কবিতা : কি হবে শুনিয়া, সখি, বাহিরের কথা) – রবীন্দ্রনাথ, গরিলা ও শিম্পাঞ্জী সম্বন্ধে গার্ণার সাহেবের অভিজ্ঞতা (প্রবন্ধ) – দীনেন্দ্রকুমার রায়, ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎ বাণিজ্য (প্রবন্ধ) – জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর, শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী (প্রবন্ধ) – অঘোরনাথ চট্টো-পাধ্যায়।

চৈত্র ১৩০০

'ভারতবর্ষে' *, স্বরলিপি / কৈ এলো কৈ এলো – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাংখ্যদর্শন *, রাজসিংহ / নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ (প্রবন্ধ) – রবীন্দ্রনাথ, কৃতজ্ঞতা *, এবার ফিরাও মোরে (কবিতা : সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত) – রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. খ্রীষ্টধর্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. হিন্দু-বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল ? – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যার শিক্ষা – জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ঘ. য়ুরোপের যুদ্ধসজ্জার ব্যয় – জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঙ. অধ্যাপক

টিণ্ড্যাল সম্বন্ধে হর্বর্ট স্পেন্সারের উক্তি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; রাজনীতির দ্বিধা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, পশুপ্রীতি (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৃত্তিনির্বাচন (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈশাখ ১৩০১

নববর্ষে (কবিতা : নিশি অবসান প্রায়, ওই পুরাতন)—রবীন্দ্রনাথ, 'ভারত-বর্ষে' *, স্বরলিপি / হেলা ফেলা সারা বেলা—ইন্দিরা দেবী, নূতন তাম্রশাসন (প্রবন্ধ)—উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বৃত্তিনির্বাচন *, প্রলয় (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃতজ্ঞতা *, বুদ্ধদেবের মনের ইতিহাস / [বুদ্ধচরিত] *, কাব্যে প্রকৃতি (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

মৃত্যুর পরে (কবিতা : আজিকে হয়েছে শান্তি)—রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে' *, স্বরলিপি / সবে কর আজি তাঁর গুণগান—ইন্দিরা দেবী, শোকসভা (প্রবন্ধ) —রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. জাপানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. বিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত কাণ্ড—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. স্ত্রীলোকের কাজ করা কেন উচিত নহে? —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘ. ব্যক্তিগত শিক্ষাপ্রণালী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঙ. শিশুদিগের নীতিশিক্ষা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; নূতন তাম্রশাসন *, যোগসিদ্ধ জ্ঞান ও যোগানন্দ (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃতজ্ঞতা *, সমালোচনা / ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ।

আষাঢ় ১৩০১

'ভারতবর্ষে' *, প্রতীচ্য গণিত (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, নূতন তাম্রশাসন *, মিশ্রমিল অলঙ্কারযুক্ত সুরের স্বরলিপি / পথহারা তুমি পথিক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র (ঐকতানিক স্বরসংগ্রহের সমালোচনা প্রসঙ্গে)—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিহারীলাল (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক সারসংগ্রহ (বিভাগীয় রচনা) ক. ভৌতিক বিজ্ঞানের দুরাকাঙ্ক্ষা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, খ. যুদ্ধের অভিনব অস্ত্র—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ. ধর্ম সম্বন্ধে ফ্রেডরিক হ্যারিসনের মত—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘ. সার্বজনিক ব্যাঙ্ক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঙ. চিনি-খোরের সৌন্দর্যবোধ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, চ. ডুবুরির জীবন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছ. ভবিষ্যৎ যুগের ইংরাজ মহিলা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; কৃতজ্ঞতা *।

শ্রাবণ ১৩০১

ডেপুটী-তত্ত্ব (রচনা)—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, মহাকবি কৃত্তিবাস (প্রবন্ধ) —অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন / বুদ্ধচরিত *, রাজা ও প্রজা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, কৃতজ্ঞতা *, সাহিত্যের গৌরব (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, অনধিকার প্রবেশ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, প্রলয় (ভ্রম সংশোধন)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ভাদ্র ১৩০১

'ভারতবর্ষে' *, স্বরলিপি / তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপমানের প্রতিকার (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, স্তব-গান (কবিতা : নমঃ প্রকৃতি নমঃ)—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, ঘাত প্রতিঘাত (গল্প)—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি (ব্যঙ্গকৌতুক)—রবীন্দ্রনাথ, কৃতজ্ঞতা *, প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০১

মেঘ ও রৌদ্র (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, ফরাসী ও ইংরাজ (French and English—A Comparison.-by Philip Gilbert Hamerton গ্রন্থের সমালোচনা)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্তর্যামী (কবিতা : এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন)—রবীন্দ্রনাথ, মেয়েলি ছড়া (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে' *, স্বরলিপি / আমারে কর তোমার বীণা—ইন্দিরা দেবী, স্বর্গীয় প্রহসন / ইন্দ্রসভা (ব্যঙ্গ কৌতুক)—রবীন্দ্রনাথ, নিজাম অল্লীর দর্প চূর্ণ (প্রবন্ধ)—সখারাম গণেশ দেউস্কর, ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ।

চতুর্থ বর্ষ ১৩০১ অগ্রহায়ণ—১৩০২ কার্তিক

অগ্রহায়ণ ১৩০১

সাধনা (কবিতা : দেবি ! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে) —রবীন্দ্রনাথ, প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, পঞ্জিকার ভ্রম (প্রবন্ধ), সুবিচারের অধিকার (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি / তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ, বোম্বায়ের রাজপথ (প্রবন্ধ)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাব্যের তাৎপর্য [পঞ্চভূত] (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, কেরাণী (কবিতা : খেটে খেটে খেটে),

ফুলজানি (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ফুলজানি গ্রন্থের সমালোচনা)—রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধের সিদ্ধিলাভ (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণবিহারী সেন, আর্য-গাথা (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত আর্য-গাথা দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থের সমালোচনা)—রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থসমালোচনা (সমালোচনা) ক. ভক্তচরিতামৃত / অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, খ. রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত / অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, গ. চরিত রত্নাবলী প্রথম ভাগ / কালীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, ঘ. অর্থই অনর্থ / প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ঙ. ঠগী কাহিনী / প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

পৌষ ১৩০১

বিচারক (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, আগ্রা (D ans L' Inde নামক ফরাসী ভ্রমণপুস্তকের অনুবাদ), নূতন অবতার (ব্যঙ্গ কৌতুক)—রবীন্দ্রনাথ, কৌতুক-হাস্য / পাঞ্চভৌতিক সভা *, সঙ্গীতের গঠনরীতি এবং আনুষঙ্গিক আলোচনা (প্রবন্ধ), মহারাষ্ট্রীয় ভাষা (প্রবন্ধ), সঞ্জীবচন্দ্র / পালামৌ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি : প্রাচীন হিন্দুমতে (প্রবন্ধ), দেবোত্তর বিষয় (প্রবন্ধ), সমালোচনা (গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র সমালোচনা) ক. উপনিষদঃ / 'শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত শঙ্কর-কৃপা নাম্নী টীকা প্রবোধক নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক সংশোধিত', খ. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা ; গার্গী (কবিতা : হবির্গন্ধে আমোদিত স্নিগ্ধ তপোবন)।

মাঘ ১৩০১

নিশীথে (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, সন্ধ্যা (কবিতা : ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা ! ওরে মন)—রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্ধারণ : প্রাচীন মতে (প্রবন্ধ), সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, আবদারের আইন (প্রবন্ধ), পৌষ-সংক্রান্তি (রচনা)—দীনেন্দ্রকুমার রায়, কৃষ্ণচরিত্র (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, নীতির ধর্ম / বুদ্ধচরিত *, ক্ষাত্রধর্ম (প্রবন্ধ), গান / অনুবাদ : ঐ শুন সখি স্বর্গতোরণে চাতক তুলেছে মধুতান, সমালোচনা (গ্রন্থসমালোচনা) ক. হাসি ও খেলা / যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত, খ. সাধন সপ্তকম্ / গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নেই, গ. নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদ সহ চাণক্য শ্লোক / অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ; রাণী (কবিতা : মধুর অধরে তার)।

ফাল্গুন ১৩০১

য়ুরোপীয় সঙ্গীত (প্রবন্ধ), স্বরলিপি / বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও, স্বরলিপি / ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে, ধর্মচক্র প্রবর্তন / বুদ্ধচরিত *,

আপদ (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রপূজা (প্রবন্ধ), কৃষ্ণচরিত্র *, দেবোত্তর বিষয়ে পূর্বের আলোচনা (প্রবন্ধ), কৌতুকহাস্যের মাত্রা [পঞ্চভূত]*, ব্রাহ্মণ (কবিতা : অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে) — রবীন্দ্রনাথ, আলোচনা (বিভাগীয় রচনা) ক. পলিটিক্স, খ. কংগ্রেসে বিদ্রোহ, গ. ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা, ঘ. পুলিশ রেগুলেশন বিল, ঙ. ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি, চ. ধর্মপ্রচার ; গ্রন্থ-সমালোচনা — ক. দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব / যোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক প্রকাশিত — রবীন্দ্রনাথ, খ. মনোরমা / কুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত — রবীন্দ্রনাথ।

চৈত্র ১৩০১

মুক্তির পথ (প্রবন্ধ), দিদি (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ, পুরাতন ভৃত্য (কবিতা : ভূতের মতন চেহারা যেমন) — রবীন্দ্রনাথ, নৃত্যকলা (প্রবন্ধ), সরলতা (প্রবন্ধ) — রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি / চল রে চল সবে ভারত-সন্তান, মেয়েলি ব্রত (প্রবন্ধ) — অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, যুগান্তর (শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত যুগান্তর উপন্যাসের সমালোচনা) — রবীন্দ্রনাথ, আলোচনা (বিভাগীয় রচনা) ক. ইণ্ডিয়ান্ রিলিফ্ সোসাইটি, খ. উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার, গ. হিন্দু ও মুসলমান, ঘ. কংগ্রেসে বিদ্রোহ, ঙ. রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ; ভালবাসা (কবিতা : কি আর বুঝাবে বল), গ্রন্থসমালোচনা — ক. নূরজাহান / বিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত, খ. শুভ-পরিনয়ে / গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নেই।

বৈশাখ ১৩০২

মানভঞ্জন (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ, লোরিকের গান (প্রবন্ধ) — শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, মারাঠী ও বাঙ্গলা (প্রবন্ধ) — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফয়জাবাদের সমাধিমন্দির (প্রবন্ধ), চড়ক সংক্রান্তি (প্রবন্ধ) — দীনেন্দ্রকুমার রায়, বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য (প্রবন্ধ) — রবীন্দ্রনাথ, আলোচনা (বিভাগীয় রচনা) ক. ফেরোজশা মেটা, খ. বেয়াদব, গ. কথামালার একটি গল্প ; প্রেম-পঞ্জিকা (Charles Kent-রচিত Love's Calendar কবিতার অনুকরণে : চারিদিকে যবে ফুটিবে কুসুম) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থসমালোচনা / ক. রঘুবংশ দ্বিতীয় ভাগ / নবীনচন্দ্র দাস প্রণীত, খ. ফুলের তোড়া / অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, গ. নীহারবিন্দু / নিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

ঝাঁশির মহারাণী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই (প্রবন্ধ) — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাম কৌতুক (প্রবন্ধ), গুজরাটের গরবা (প্রবন্ধ) — বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেয়েলি

নির্দেশিকা

নির্দেশিকায় পৃষ্ঠাসংখ্যার পাশে 'ক' এবং 'খ' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক' অর্থে পৃষ্ঠার প্রথম অর্ধাংশ ও 'খ' অর্থে পৃষ্ঠার শেষ অর্ধাংশ নির্দেশিত। কোনো নাম যদি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ উভয়ার্ধেই থাকে, সেস্থলে শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যা বসানো হয়েছে।